অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥

শিব সঙ্গীত।

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বোম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল ॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্কভাল।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত।

মুঝে বারি বনয়ারী সেঁইয়া
যানেকো দে।
যানেকো দেরে সেঁইয়া
জানেকো দে
(আজু ভালা)
মেরা বনয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরারী সেঁইয়া
জানেকো দে (আজু ভালা)
(মোরে সেঁইয়া)
যমুনাকি নীরে ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে কহত সেঁইয়া
জানেকো দে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল সম্প্রতি সারদামণ্ডল নামে এক নিজ শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংস্কৃত বিদ্যার বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহাতে তিনটী বিভাগ থাকিবে। (১ম) শিক্ষা ও পরীক্ষা বিভাগ (২য়) অনুসন্ধান বিভাগ (৩য়) বিবিধ বিভাগ। কাশীতেই মণ্ডলের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইবে, এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপ, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি বিদ্যার চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ অন্যান্য স্থানেও যাহাতে পুনরায় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা হয়, মণ্ডলী তাহার চেষ্টা করিবেন। এতদুদ্দেশে ঐ সকল স্থানে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণকে উৎসাহ দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত মণ্ডলী ভারতের নানাস্থানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন। অনুসন্ধান বিভাগে সাহিত্য, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করা হইবে। বিবিধ বিভাগ হইতে বক্তৃতা, সংবাদপত্র প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হইবে। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মণ্ডলের পৃষ্ঠপোষক। উদ্দেশ্যও খুব ভাল। আমরা যদি সকলে একমত হইয়া এইরূপ একটী মহৎ কার্য্যসাধন করিতে পারি, তবে আমাদের কল্যাণ অতি নিকটবর্ত্তী।

বর্ত্তমান ভারত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রথমে উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে সকল বিভিন্ন শক্তি ভারতকে পরিচালিত করিয়াছে, সেই সকল শক্তির কার্য্য বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে যাহাতে ভারতের বর্ত্তমান কল্যাণ হইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা হইয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের ভারতেতিহাস পাঠ করি বটে, কিন্তু উহা পাঠের যথার্থ ক্রম জানি না। চিন্তাশীল পাঠক এই পুস্তক পাঠে ভারতেতিহাস পাঠের অনেক ইঙ্গিত পাইবেন। আমরা এই প্রবন্ধটী সুন্দররূপে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছি এবং সর্ব্বসাধারণের সুবিধাজন্য অতি সামান্য মূল্য মাত্র (।০ আনা) লইয়া ইহা বিক্রয় করিতেছি। বিশেষতঃ অনেকের অনুরোধে স্বামীজির একখানি সুন্দর হাফটোন্ ছবি এবং তাঁহার হস্তাক্ষরে মটো ও স্বাক্ষর ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্বীকার। "বেদান্ত"—স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক কালিফোর্ণিয়ায় প্রদত্ত একটী বক্তৃতা ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

"ক্রমাধিকারতত্ত্ব।" ধর্ম্মের ক্রমাধিকার বিষয়িণী ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

স্বামী বিবেকানন্দ

(শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত।)

আমি তখন হাবড়াতে এক খুল্লতাত গৃহে থাকিয়া এণ্ট্রেন্স দ্বিতীয় কি প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম। খুড়া মহাশয়ের নিকট ইংরেজী বাঙ্গালা কাগজ আসিত। আমি বাল্যকাল হইতেই সংবাদপত্রভক্ত ছিলাম। পড়িলাম, "'আমাদের নরেন্দ্রনাথ' ফিরিয়া আসিয়াছেন। দিগ্বিজয় করিয়া, সনাতন ধর্ম্মকে পাশ্চাত্য জগতে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশের ধন মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন।" ঐদিন হইতে আমি প্রতিদিন প্রতি সুযোগে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কাহিনী জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম। তখন বালক ছিলাম, তাই তিনি কি করিয়াছেন না করিয়াছেন, কি জয় করিয়াছেন, কি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই সব জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কেবল তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। আমি বাল্যের ঐ শুভ মুহূর্ত্তকে, ঐ ব্যাকুলতাপূর্ণ শুভ আগ্রহকে এখনও প্রতিদিন ভক্তিপূরিত নয়ন-জলে স্মরণপথে আনিয়া থাকি।

সেই দিন হইতে স্বামীজিকে আমি জানি, কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়া স্বামীজির সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে লাগিলাম। এখন যতই দিন যাইতেছে—তাঁহার সেই তেজোময় চক্ষু ততই যেন আমার চক্ষের উপরে প্রতি মুহূর্ত্তে বিভাসিত হইয়া উঠিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে যেন দেখিতেছি, অনতিদূরে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রেমের রবে জগদ্বাসিগণকে ডাকিতেছেন—সেই ঋষি-কণ্ঠ-মুখরিত চিরপুরাতন বাণী তাঁহার মুখে যেন আবার নবীনতর হইয়া উঠিয়াছে—"ভাই সব, উঠ, জাগ, আর ঘুমাইও না! মৃত্যু ত দিন দিন নিকটে আসিতেছে।"

কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। বেলুড় মঠের দিকে ছুটিতাম। আমার বলিবার চাহিবার বিশেষ কিছু ছিল না। নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া সুধু শুনিবার জন্য নম্রহৃদয়ে বসিতাম। মঠের অন্যান্য সাধুগণ—যাঁহাদের পবিত্র জীবন, জলন্ত স্বার্থত্যাগ এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্মনিষ্ঠা আজও শত শত জনকে ঐ মঠের দিকে দ্বিগুণতর বেগে আকর্ষণ করিতেছে—সকলেই বসিতেন। কত লোক আসিতেন, কত কথা হইত, ঐ সব দিনের কথা মনে

হইলে যেন এক স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া যাই। সকলে মুগ্ধ হইয়া, যেন এক নূতন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রেমপূর্ণ মুখে উঠিয়া যাইতেন। আর বাক্য নাই! আর ক্ষুদ্রকথা নাই! সকলেই নীরব, চিন্তাশীল। আমি ত অতশত কিছু বুঝিতাম না। শুধু শুনিতাম—আর মাঝে মাঝে তীব্র বৈরাগ্যের বাণী হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া—যেমন আবালবৃদ্ধ সকলেরই কোন কোন শুভ মুহূর্ত্তে হইয়া থাকে—আমার হৃদয় জাগিয়া উঠিত, নয়নে জল আসিত।

এই রূপ প্রাতে সন্ধ্যায় অনেকদিন আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে, মঙ্গল ইচ্ছা সমূহ প্রাণে লইয়া জাহ্নবীপার হইয়া কলিকাতায় ফিরিতাম। এ ভাবে আমি স্বামীজিকে জানি। অথবা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিনা বলাই ভাল।

একদিন বিভিন্ন কলেজের কতিপয় যুবক বন্ধুদিগের সহিত বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। সকলেই ঘেরিয়া বসিয়াছি। কত কথা হইতেছে। প্রশ্ন হওয়ামাত্র আর কথা নাই, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে most conclusive জবাব দিতেছেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তোরা ত কত European Philosophy, metaphysics পড়্‌ছিস, কত কত দেশের নূতন নূতন কাহিনী জান্‌ছিস, আমাকে বল্ দেখি, what is the grandest of all the truths in life?

আমরা মনে করিলাম, তিনি না জানি কি প্রশ্ন করিয়াছেন। সকলেই উত্তরবিমুখ, ভাবিতে লাগিলাম, না জানি তিনি কি উত্তর অপেক্ষা করিতেছেন। অমনি বহ্নি-পূর্ণ ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—

"দেখ্ শোন্—we shall all die, আমরা সকলেই মর্‌বো। প্রতিদিন এই কথা মনে রেখো, তবেই প্রাণ জেগে উঠ্‌বে। তবেই নীচাশয়তা দূরে যাবে, কার্য্যে সক্ষম হবে, শরীর মন সবল হবে, আর তোমার সংস্পর্শে যারা আস্‌বে, সকলেই তোমার কাছ থেকে কিছু পাবে।

আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম—

স্বামীজি! মৃত্যুর কথা মনে আসিলে ত হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, নিরাশা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিবে।

স্বামীজি। তুই ঠিক বলেছিস্, প্রথমে হৃদয় ভেঙ্গে পড়্‌বে, নিরাশা আস্‌বে বটে। কিন্তু যাক্ না ২।১০ দিন। তার পর? তারপর দেখ্ দেখি, হৃদয়ে জোর এসেছে, মৃত্যু চিন্তা সর্ব্বদা হৃদয়ে থেকে তোকে নবীন জীবন দান কর্‌ছে। প্রতি মুহূর্ত্তে রক্তমাংসের নশ্বরতা জানিয়ে দিয়ে তোকে চিন্তাশীল করে তুল্‌ছে। দুদিন যাক্, দুমাস দুবছর যাক্, দেখ্‌বি তুই সিংহবিক্রমে জেগে উঠেছিস্। ক্ষুদ্র

শক্তি মহৎ শক্তি হয়ে উঠেছে। মৃত্যুচিন্তা কর্ দেখি—দেখ্‌বি, তোরা নিজেরাই উপলব্ধি কর্‌বি। কথায় আমি আর কি বোঝাবো।

কোন এক বন্ধু নম্রভাবে স্বামীজির গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন।

স্বামীজি। আমাকে প্রশংসা করিস্ না। প্রশংসা নিন্দার জগতে কোন মূল্য নাই। মানুষকে দোলাতে নাচায় মাত্র। প্রশংসা বহুত পেয়েছি। গালি-বর্ষণও কম খাই নাই। ওসব দিকে তাকিয়ে আমার কি হবে! সকলেই নিজ নিজ কাজ কর্। দিন আস্‌লেই আমি, তুমি, সব মিলিয়ে যাবে। কাজ কর্‌তে এসেছি, ডাক পড়্‌লেই তুমি আমি চলে যাব।

আমি। আমরা কত ক্ষুদ্র--স্বামীজি।

স্বামীজি। ঠিক বলছিস তুই ঠিক বল্‌ছিস্! এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি সৌর মণ্ডলের কথা একবার চিন্তা করে দেখ্ দেখি—কি এক অনন্ত শক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে এ জগৎ যেন কার চরণে ছুটে চলেছে, আমরা কত ক্ষুদ্র, ভাব্ দেখি। এখানে কি আমাদের ক্ষুদ্রতা নীচাশয়তাকে প্রশ্রয় দিতে আছে? এখানে কি শত্রুতা দলাদলি কর্‌তে আছে? তোরা সব্ কলেজ থেকে বেরিয়ে শুধু পরসেবায় লেগে যা দেখি? আমার কথা বিশ্বাস কর্, টাকা পয়সায় পূর্ণ ভাণ্ডারের বোঝা নিয়ে যত সুখ না পাবি, তার চেয়ে অনেক আনন্দ পাবি, এক-দিকে পরসেবা কর্‌বি অপর দিকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হবি।

আমি বলিলাম—আমরা বড় দরিদ্র যে—স্বামীজি!

স্বামিজী। রেখে দে দরিদ্রতা! তুই কিসে দরিদ্র বল্ দেখি? তোর জুড়ি গাড়ী নাই তাই দুঃখ করছিস্? আরে তুই পায়ে হেঁটে দিনরাত খেটে যে সব কাজ করে যাবি, ঐ দেখ্ জীবন-জাহ্নবীর পরপার দেখা যাচ্ছে—ঐ দেখ্ মরণের পরদা খুলে গেছে! তোরা কি এক অমৃত রাজ্যের অধিকারী!

আমি। আপনার কাছে বস্‌লে আমাদের কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে না—সুধু শুনি।

স্বামীজি। দেখ্, এই যে কত বৎসর ভারতের নানাদেশ ঘুর্‌ছি—কত হৃদয়বান্ মানুষ দেখেছি। কত কত মহাপুরুষ দেখেছি, তাহাদের নিকট বস্‌লে হৃদয়ে এক অদ্ভুত শক্তি আস্‌ত, তারই জোরে তোদের দুই এক কথা বল্‌ছি মাত্র, আমাকে তোরা একটা মস্ত কিছু ভাবিস্ না।

আমি। আমরা মনে করি, আপনি ভগবান্‌কে পাইয়াছেন।

যাই এই কথা বলিলাম, এখনও আমার সেই আকর্ণ-বিস্তৃত জলপূর্ণ-চক্ষু মনে পড়ে—অম্‌নি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আস্তে আস্তে বলিয়া উঠিলেন—

"ঐ চরণে জ্ঞানিগণের জ্ঞানের সার্থকতা
ঐ চরণে প্রেমিকের প্রেমের সার্থকতা।

"কোথায় যাবে জগতের নর নারী, ঐ চরণে আস্‌তেই হবে"।

কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন-

"জগতের মানুষগুলি পাগ্‌লামি করে সমস্ত দিন মারামারি কাটাকাটি কর্‌ছে! সারাটা দিন কি আর এই ভাবে চলে? সন্ধ্যায় মায়ের কোলে আস্‌তেই হবে।"

এইরূপে বেলুড়ের পুণ্য মঠে কতদিন গিয়াছিলাম, স্বামীজির কত কথাই শুনিয়াছিলাম! জাপান যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে কি এক নিদারুণ বাণী আসিয়া পহুছিল, 'স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোকে নাই'!

আজ কোথায় তুমি স্বামীজি? কোথায় গিয়াছ! আর কি বেলুড় মঠে আসিবে না? পৃথিবী জয় করিয়া আবার কি তোমার চির অশ্রুময়ী ভারত মাতার ক্রোড়ে আসিয়া ক্লান্তি দূর করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না? আবার কি ফিরিয়া আসিয়া বলিবে না, মাগো, তোমার বার্ত্তা জগজ্জনকেশুনাইয়া, তোমার ঋষি-সন্তানদের তটিনীতীর-মুখরিত সেই অমৃতময়ী মৃত্যুঞ্জয়ী বেদবাণী ব্রহ্মবাণী শুনাইয়া মাতাইয়া আবার তোমার ক্রোড়ে আসিয়াছি, মাগো, তোমার কোলই চির-শান্তিময়!

চাহিয়া দেখ, তোমার হস্তরোপিত চারা গাছ আজ ফুল ফলে পল্লবিত হইয়া অনন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে, কত ছায়া দান করিতেছে, তোমার দুন্দুভি-নিনাদ ঘোষিত বেদবাণী ব্রহ্মবাণী আজও পৃথিবীর সহস্র নর নারীর হৃদয়-তন্ত্রীকে জাগাইয়া তুলিতেছে, কত দুর্ব্বল হৃদয় ধর্ম্মজ্যোতিতে বলীয়ান্ হইয়া পথ পাই-য়াছে, জগৎ তোমার অভাব দিন দিন বুঝিতেছে।

তুমি কোন্ লোকে গিয়াছ, তাহা ত আমরা জানি না! তোমার যাত্রার পথে রামমোহন কেশবচন্দ্র হয়ত তোমাকে পাইয়া বুকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছেন, তোমাকে পাইয়া তাঁহারা হয়ত ভারতমাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এই বলিয়া ডাকিতেছেন—"এস ভাই নরেন্দ্রনাথ, কত শত কাঙাল জনকে জীবন দান করিয়া আসিয়াছ, এস ভাই নরেন্দ্রনাথ! অশ্রুময়ী মাকে প্রবুদ্ধ সঞ্জীবিত করিয়া

আসিয়াছ—এস ভাই নরেন্দ্রনাথ, তোমার জন্য অমৃতরাজ্যের দুয়ার খোলা রহিয়াছে”।

তিলক ‘কেশরী’ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, ‘স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান সময়ে ভারতে দ্বিতীয় শঙ্কর আসিয়াছিলেন’।

এ ব্রহ্মাণ্ডে কত নর নারী আসিতেছে, যাইতেছে। অনন্ত কাল প্রবাহে নবীন পুরাতন হইতেছে, পুরাতন নবীন হইবে, যে সব মহাপুরুষের জীবন শত শত ভ্রান্ত ও ক্লান্তজনকে কঠোর জীবন-পথে চলিবার আশা ও বল দিয়া যাইতেছেন :—

"Well have they lived, who leave the world bestowing upon
Posterity a hallowed name."

অথবা তোমার জন্য, আমরা দুঃখ করিবই বা কেন? তুমি ত চলিয়া যাও নাই—অতি নিকটে রহিয়াছ—

তুমি,

Ah ! you who turned the spirit's mystic tide
And gave new life-blood into foriegn lands
Thy country's hero and thy nation's pride.
Oh ! hear the prayers she weeping upwards sends,
And take the offering from her trembling hands.

তিব্বত ভ্রমণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর] [স্বামী অখণ্ডানন্দ।

৺হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমের শেষ প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত আমি যতগুলি প্রয়াগ দেখিয়াছি, সে সকলই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারে পূর্ণ এবং তাহাদের সুপবিত্র মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিলে তপোনিষ্ঠ পূতাত্মা মহর্ষিগণের অলৌকিক তপস্যার বিষয় মাত্র আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। কিন্তু গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম (বর্ত্তমান প্রয়াগ বা এলাহাবাদ) মাহাত্ম্য যুগপৎ ভারতের যে, অতুল গৌরব ও অক্ষয় কীর্ত্তি-কাহিনী এবং তাহার ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির দিগন্ত-দীপ্ত সুস্নিগ্ধ বিমল-যশোরাশি পূর্ণ মহাপ্রভাব সম্পন্ন উত্তুঙ্গ শিখর শ্রেণীর পরম অদ্ভুত চিত্র আমাদিগের স্মৃতিতে প্রতিফলিত করিয়া দেয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইলে

একখানি পৃথক্ পুস্তক রচিত হয়। সুতরাং আমার এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব। তবে ত্রিপথগা গঙ্গা ও যমুনার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিতে লিখিতে, বিশেষতঃ শ্রীযমুনার আশ্চর্য্য স্বতন্ত্র ভাব এবং তাঁহার অতি বিচিত্র কার্য্যকলাপের যৎসামান্য আলোচনা করিতে করিতে, বাধ্য হইয়া আমাকে এ স্থলে মহা পুণ্যধাম গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গমের কথা উত্থাপন করিতে হইল। কোন বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা করিতে হইলেই তাহার মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখাই স্বাভাবিক ; সুতরাং আমিও সেই স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই সুদূর গিরিপ্রান্ত হইতে কল্পনাসহায়ে একবার মধু-মোদ-বিলাসিনী যমুনার শেষ বিলাসস্থান সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহার অনুপম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এইখানে লিপিবদ্ধ করিয়াই পুনরায় বাবা শ্রীকেদারনাথের পথে আরোহণ করিব। মহাপুণ্য-ধাম প্রয়াগ হইতে জহ্নুকন্যা মা গঙ্গা এখনও অনেক দূর যাইবেন, সুতরাং তাঁহার কোন কথা বিশেষরূপে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় নাই। কেবল স্বর্গাধিক বরণীয় ও বাঞ্ছনীয় গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের অতুলনীয়া বিচিত্রতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে এই স্থলে দুই চারিটী কথা বলাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম প্রয়াগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ। প্রয়াগরাজ এলাহাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরাখণ্ডের সীমান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ পুণ্যদর্শন ৭টী প্রধান উল্লেখযোগ্য পুরাণ-প্রসিদ্ধ প্রয়াগ আছে ; তাহার মধ্যে এই শেষ তীর্থরাজ প্রয়াগই সর্ব্বপ্রধান। প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পবিত্রতা ও রমণীয়তা অসীম ; ইহা আমাদের পরম মোক্ষধাম। শাস্ত্রোক্ত প্রয়াগমাহাত্ম্য পাঠ করিলে মনে হয় যে, মর্ত্ত্যে ইহার তুল্য পবিত্র স্থান অতি বিরল ; এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু যে কি অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এই ত্রিলোক-বিখ্যাত প্রয়াগের আরাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাহার আভাস মাত্র দিবার জন্য মৎস্য পুরাণোক্ত প্রয়াগাষ্টক হইতে নিম্নে দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল। যথা :—

"শ্রুতিঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
পুরাণমপ্যত্র পরং প্রমাণম্
যত্রাস্তি গঙ্গা যমুনা প্রমাণং
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥
ন যত্র যোগাচরণপ্রতীক্ষা
ন যত্র যজ্ঞেষ্টিবিশিষ্টদীক্ষা

ন তারকজ্ঞানগুরোরপেক্ষা
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ॥

হিন্দুর এই প্রয়াগ যে, কত আদর ও শ্রদ্ধার স্থান, তাহা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বাক্য হইতেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রমাণের আর আবশ্যক কি? যথায় ভগবতী গঙ্গা ও যমুনাই স্বয়ং প্রমাণ রূপে অবস্থিতা। আহা, কি সুন্দর কথা, অন্যান্য শত শত প্রমাণ থাকিলেও গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম আপনি আপনার প্রমাণ; এবং যাগ, যজ্ঞ, যোগ, শিক্ষা, দীক্ষা, এমন কি, তারকব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরুরও কথার অপেক্ষা থাকে না, সেই স্বতঃপ্রমাণ মোক্ষধাম প্রয়াগের গভীর ও অসাধারণ মাহাত্ম্য যে, প্রাচীন হিন্দুগণের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রেই যে দেখিতে পাই তাহা নহে, ইতিহাসেও আমরা তাহার ভূরি ভূরি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। এই অসামান্য প্রয়াগ মাহাত্ম্যে প্রাচীন ভারত এতই প্রভাব-সম্পন্ন হইয়াছিল এবং আর্য্য ঋষিগণ তাহার পবিত্রতায় এতই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অম্লানবদনে বলিয়া গিয়াছেন, যথা, "গঙ্গাযমুনামাসাদ্য ত্যজেৎ প্রাণান্ প্রযত্নতঃ।" যে আর্য্য মহর্ষিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই আত্ম-হত্যাকে মহাপাপ বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং জীবের কল্যাণ কামনায় সর্ব্ব শাস্ত্রেই যাহার ভূরি ভূরি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই আবার এই তীর্থরাজ প্রয়াগে অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে প্রাণত্যাগ করিবার বিধান করিয়া গিয়াছেন। তীর্থরাজ প্রয়াগের পৌরাণিক মাহাত্ম্য এবং কেবল গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের দর্শন ও স্পর্শনে শ্রদ্ধাবান্, শুদ্ধসত্ত্ব, ভারতের সুসন্তান প্রকৃত হিন্দুর হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক ভাবের উদয় হয়, সকলের তাহা বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু এই অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান নগরের সে অসা-ধারণ প্রতিষ্ঠার অতুলনীয়া কথা অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত আছে, তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই তীর্থোত্তম প্রয়াগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অদ্ভুত লীলাক্ষেত্র; এই দুই পরস্পর বিরোধী ভাবের যুগপৎ চরমোৎকর্ষ যেমন এইখানে দৃষ্ট হয়, এমন আর কুত্রাপি নহে। এই দুই ভাবের চরম আদর্শ এবং তাহার অপূর্ব্ব সমাধান এই একই স্থানে নিষ্পন্ন হইয়াছে দেখিতে পাই। তীর্থরাজ প্রয়াগ প্রকৃতই জীবের ভুক্তি ও মুক্তি দাতা। প্রবৃত্তিপরায়ণ জীবের পক্ষে যেমন কল্পতরু, নিবৃত্তিপরায়ণ মুমুক্ষু জীবের পক্ষে তেমনি মুক্তিদাতা গুরু হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ স্মরণাতীত কাল হইতে এ পর্য্যন্ত

আপনার পুঞ্জীকৃত পুণ্যময় ভূমিতে যে কত অদ্ভুত কাণ্ডই জগৎকে দেখাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই. প্রবৃত্তির অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব বিলাস এবং নিবৃত্তির চরম বিকাশ ; প্রবৃত্তির ভোগৈশ্বর্য্য এবং নিবৃত্তির যোগৈশ্বর্য্য ; প্রবৃত্তির আপাত-রমণীয়া, ভোগৈকপরা, অপার বিষয়াশয়া সুরাসুরমনোমোহিনী, অন্তঃসার-শূন্যা, চাক্‌চিক্যময়ী মূর্ত্তি, এবং নিবৃত্তির নিত্যমধুরা, সদাশয়া, অক্ষয়-শান্তি-বিধায়িনী মোক্ষৈক-পরা, সারাৎসারা, চিন্ময়ী মূর্ত্তির অভূতপূর্ব্ব মিলন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ যথার্থই এই অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নগরকে এ জগতে সুপ্রতি-ষ্ঠিত এবং অতুল মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতের আর কোন তীর্থই এরূপ অঘটন সংঘটন করিয়া আমাদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই। এই অত্যাশ্চর্য্যময় মহাপুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগের বিষয় যতই ভাবিতেছি, ততই ইহার চমৎকারিতা ও বিচিত্রতার উপলব্ধি হইতে হইতেছে।

ক্রমশঃ।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ।

ওয়ালটেয়ার, বিশাখাপত্তন ও সিংহাচলম্।

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ)

২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অতি প্রাতে পুরী হইতে যাত্রা করিলাম। প্রায় ৬টার সময় মাদ্রাজ মেল ছাড়ে, আমরা সেই গাড়ীতে চড়িলাম। আন্দাজ ৮টার সময় খুর্দ্দা রোড ষ্টেসনে আমাদের গাড়ী আসিল, আমরা তথায় অবতরণ করিলাম। আমাদের গাড়ীখানি খুর্দ্দা ষ্টেসনের প্লাটফরমের অন্য পার্শ্বে লাগিয়াছিল, সুতরাং অন্য গাড়ীর যাতায়াতের জন্য তাহাকে আর সরিয়া যাইতে হইল না, উহা পুনরায় পুরীতে যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ মেলখানি আসিবে, সুতরাং আমরা প্লাটফরমেই বিচরণ করিতে করিতে স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। ষ্টেসনটী একটী বহুদূরব্যাপী ফাঁকা উচ্চ জমীর উপর, জমিটীও পাহাড়ে জমী, ছোট ছোট লালবর্ণ কাঁকরে পরিপূর্ণ, তাহার উপর ঘাস। পুরীর দিকে জঙ্গলপূর্ণ উচ্চ পাহাড় দূরে দেখা যাইতেছিল। ঐ দিকে

কলিকাতা-মাদ্রাজ লাইনটী উচ্চ নীচ জমীর উপর দিয়া সরলভাবে গিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ অভিমুখে লাইনটী কিয়দ্দূরে যাইয়া ক্রমে নীচু হইতে হইতে আবার ক্রমে উচ্চ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহার সর্ব্ব নিম্ন ভাগটী সমতল রেখা হইতে যেন প্রায় ৫০।৬০ হাত নিম্নে। যথায় ইহা অদৃশ্য হইয়াছে, তথায় একটী ছোট পাহাড়কে দ্বিখণ্ড করিয়া যেন পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কলিকাতা অভিমুখে যেখানে লাইনটী অদৃশ্য হইয়াছে, তথায় একটী উচ্চভূমি, সুতরাং লাইনটী তাহার শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াই অদৃশ্য। আমাদের সঙ্গে একটী ফিল্ডগ্লাস্ ছিল, আমরা তাহার সাহায্যে এই সব দৃশ্য খুব আনন্দ সহকারেই সন্দর্শন করিতেছিলাম। মধ্যে একটু মেঘ দেখা দিয়া ২।১ ফোঁটা বৃষ্টিও হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী আসিল, আমরা একটী খালি ঘর দেখিয়া সেই ঘরেই উঠিয়া বসিলাম। ষ্টেসনে যাত্রী অধিক ছিল না, সুতরাং আমাদের গাড়ীতে ভিড় হইল না, আমরা স্বচ্ছন্দে দুই পার্শ্বের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এ স্থান হইতে উদয়াচল বা Eastern Ghat পর্ব্বত আরম্ভ। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কখন দক্ষিণ পার্শ্বে কখন বা বাম পার্শ্বে নূতন নূতন পর্ব্বতশোভা আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বামপার্শ্বে বিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ড, মধ্যে মধ্যে তাল বা খর্জ্জুর বৃক্ষ বক্ষে ধারণ করিয়া যেন অনন্তে মিশিয়া যাইতেছে। তৎপরেই মনে হইল যে, ইহা বুঝি চিল্কা হ্রদের প্রারম্ভ। ক্রমে জলের অস্তিত্ব দেখা গেল। আরও একটু অগ্রসর হইলে দেখা গেল, সুদূর অনন্তের মধ্যে একটী ভূভাগ রেখাকার ধারণ করিয়া হ্রদের জলকে বেষ্টন করিয়া সমুদ্র ও হ্রদের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, কোথাও বা সেই রেখা ক্ষীণ হইতে হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কেবল তদুপরি অবস্থিত ২।১টী তালবৃক্ষ তথায় ভূভাগের পরিচয় দিতেছে। ক্রমে রেলপথ হ্রদের সন্নিকটস্থ হইতে লাগিল, দূরে জলের বর্ণ পরিবর্ত্তনে উহার গভীরতা বুঝা গেল। অতঃপর প্রশান্ত হ্রদসলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ, রেলের শব্দে ভীত হইয়া কোথাও দলবদ্ধ হইয়া উড্ডীন হইতে হইতে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। কোথাও বা উহারা পূর্ব্ব স্থান ত্যাগ করিয়া একটু দূরে আবার সানন্দে বিরাজ করিতে লাগিল। কতকগুলি পক্ষী বোধ হইল উড়িতে অক্ষম, তাহারা পক্ষে ভর দিয়া জল হইতে একটু উচ্চে উঠিয়া জলের উপর দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিয়া একটু দূরে পুনরায় ভাসমান হইল।

এইরূপ দেখিতে দেখিতে গাড়ী আরও নিকটে আসিতে লাগিল, ক্রমে একেবারে জলের ধার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তখন সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি সূর্য্যালোকে চিক্ চিক্ করিতে করিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। উদয়াচলের ক্ষুদ্র শৃঙ্গগুলি হ্রদতীর হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জলমধ্যে ইতস্ততঃ প্রতিবিম্বিত হইয়া এক চমৎকার অপূর্ব্বভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বচ্ছ নির্ম্মল শুভ্রবর্ণ বিস্তীর্ণ জলরাশি মধ্যে ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গ কখন নানাবিধ বৃক্ষাদি-মণ্ডিত হইয়া কখন বা কৃষ্ণ পীত হরিতাদি বর্ণ শৈবালযুক্ত প্রস্তরখণ্ডভূষিত হইয়া এক আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা এই সব গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে প্রস্ফুটিত কুমুদদলসদৃশ অপরিচিত জলপুষ্পসমূহ তত্তৎ গিরিশৃঙ্গের শোভা সমুদ্ভাসিত করিয়া চলিয়াছে, কোথাও বা জলরাশি স্থলভাগের নিম্নভূমি অনুসন্ধান করিতে করিতে পর্ব্বতসমাকীর্ণ প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। ধীবরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী সাহায্যে চতুঃপার্শ্বে-ভাসমান হইয়া মৎস্য ধরিবার জাল বিস্তার করিতেছে, বিচিত্র শোভায় শোভিত জলরাশি ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ধীবরতরণীসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। গিরিরাজিভূষিত তীরভূমি কোথাও নবদূর্ব্বাদল শ্যাম কান্তি ধারণ করিয়া, কোথাও বা বিচিত্র গুল্মপাদপাদিভূষিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গ-পরিপূরিত নির্ম্মল জলরাশির সহিত সৌন্দর্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করিতেছে। আবার কোথাও জলরাশি যেন পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক অপসারিত হইয়া সিক্ত ভূমিভাগকে পূতিগন্ধময় করিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতেছে। কোথাও স্থলভাগ পুনঃ প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত অপসারিত জলের তলদেশে প্রস্তরময় হইয়া তদুপরি জলজাত শৈবালরাশির দ্বারাতেই স্বীয় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া বিরাজিত! কোথাও বা উভয়ে বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া পরস্পর মৈত্রী স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে উভয়েই সমধিক সমলঙ্কৃত হইয়া পরস্পরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বাষ্পীয় যানও যেন ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া সুঠামবঙ্কিমভাবে চলিতে চলিতে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিতে লাগিল, তাহার আশ্রয়পথও তাহার সহায়তা করিবার মানসে কোথাও সরল কোথাও বক্র এবং কোথাও সমতল দেশে, কোথাও বা গিরিশৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে আবার কোথাও বা হ্রদবক্ষে সেতুর উপর, কোথাও বা ভিত্তি স্থাপন করিয়া হ্রদের তীরে, আবার কোথাও বা গতিরোধ হওয়ায় ক্রোধভরে ভূধর বিদীর্ণ করিয়া কুটিল গতিতে চলিতে চলিতে হ্রদের সহিত লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইরূপ

শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে আমরা রম্ভা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রায় ৫।৭টী ষ্টেশন মধ্যে থাকিলেও আমাদের ডাক গাড়ী তথায় থামে নাই। না থামিয়া বরং ভালই করিয়াছিল, কারণ, চকিতের মধ্যে বহুদূর-ব্যাপী দৃশ্য ক্রমান্বয়ে দেখিবার সুযোগ অন্যথা অসম্ভব।

এদিকে দিবাকরের তাপ ক্রমে প্রখর হইতে লাগিল। ক্ষুধার উদ্রেক ইতিমধ্যেই হইয়াছিল সুতরাং এইবার আমরা আমাদিগের সহিত আনীত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া নানাবিধ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দিবাভাগটী যাপন করিলাম। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে পুনরায় পর্ব্বতমালার শোভা প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। চিল্কা হ্রদ প্রদেশের শোভা দেখিয়া এতক্ষণ আর কিছুই তত সুন্দর বোধ হইতেছিল না। এক্ষণে অপরাহ্নের মৃদু সুশীতল সমীরণ দ্বিপ্রহরের তাপ নিবারণ করিয়া আবার দৃশ্যদর্শন-পিপাসার উদ্রেক করিয়া দিল। পর্ব্বতগুলি এতক্ষণ যেন বন্যভাবে পূর্ণ ছিল, এখন ক্রমে যে সমস্ত পর্ব্বত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তাহারা কিন্তু সে প্রকার নহে। এই পর্ব্বতগুলির উপর যেন সর্ব্বত্র সমভাবে তৃণাবৃত। একটীও অন্য জাতীয় বৃক্ষ না থাকায় মনে হইল বুঝি দার্জ্জিলিং এর "চা" চাষের মত কোন চাষ এই সকল পর্ব্বতে হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে যতদূর জানিলাম, তাহাতে বুঝিতে হইল, এ সব পর্ব্বতোপরি কোন চাষ আবাদ হয় না। পর্ব্বতগুলি পরস্পর অসং-যুক্তরূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় পাদদেশগুলিতে প্রায়ই সমতল ভূমি বর্ত্তমান। এ সব প্রদেশে পূর্ব্বের অভ্যুদয়ের চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। এ স্থানের গ্রাম-গুলিরও শ্রী আছে, উর্ব্বরা ভূমিগুলিতে যথাসময়ে চাষ আবাদ হয় বোধ হইল। বৈকালে আমরা বহরমপুর ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এই স্থান হইতে আমরা একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এটী উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ, সুতরাং উড়িষ্যা ভাষা, উড়িষ্যাবেশ ও উড়িষ্যার প্রকৃতির সহিত তৈলঙ্গ বা বর্ত্তমান মাদ্রাজী ভাষা, মাদ্রাজী বেশ ও মাদ্রাজী প্রকৃতির একটী সুন্দর মেশামিশির ভাব। ইহাদের ক্রমপরিবর্ত্তন এ স্থলে বেশ লক্ষ্য করিবার বিষয়। হয়ত যাহাকে মাদ্রাজী মনে করিলাম, সে উড়িয়া, আবার যাহাকে উড়িয়া মনে করিলাম, সে হয়ত মাদ্রাজী হইয়া গেল।

বহরমপুর ষ্টেসনে ২টী বালক ও একটী তেলেগু দেশীয় ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন, বালক দুইটীর মধ্যে একটী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও একটী তাঁহার ভ্রাতা। ভদ্রলোকটী একটী স্কুলের মাষ্টার। বালক দুইটী সেই স্কুলেই পড়ে। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাটী যাইতেছেন। ভদ্রলোকটী ৫।৬ হাত দীর্ঘ প্রায়

৪৪ ইঞ্চি বহরের একটী মলমলের থানের কাপড় পরিয়াছেন, কাপড়ের প্রান্তভাগ গুলির এক বিঘত ও কোণ চারিটীর ১॥০ বা ২ বিঘত গোলাপি রঙে রঞ্জিত। কাছাও আছে কোঁচাও আছে। আমাদের যেমন কোঁচায় খানিকটা কাপড় কুঞ্চিত থাকে, তাঁহার তাহা নাই, কুঞ্চিতযোগ্য অংশ বাদ দিয়া কোঁচার মত করিয়া পরিলে যেমন হয় তেমনি। কাচাও ঠিক তদ্রূপ। গায়ে একটী বাঙ্গালী ধরণের সাহেবী কোট, তাহার ভিতর একটী টুইলের কামিজ। মাথায় উড়েদের মত চুল, চারিদিকেই একটু একটু কামাইয়া ঘাড় কপাল ও জুল্পী একটু একটু বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। চুলের প্রান্তভাগে একটী গ্রন্থিও আছে। গ্রন্থিসহ চুলটী একটী ফেল্টের টুপীর ভিতর লুক্কায়িত। রংটী কাল, তবে কাফ্রিদিগের মত নহে। হাতে এক গোছা আস্ত আস্ত ছোট ছোট পান, বোঁটাগুলি কিন্তু কাটা ; গোছার ভিতরের পানটীতে খানিকটা ডেলা ডেলা চুণ। মুখে তাহারই গুটি কতক চিবাইতে চিবাইতে গাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের গাড়ীতে আসিলেন। বালক ২টী জিনের ইজের পরা গায়ে চেক ছিটের কোট, মাথায় ঐরূপ টুপী। গাড়ীতে বসিয়াই বালকটী এক গাছি ইক্ষু ক্রয় করিল ও চঞ্চল স্বভাব প্রদর্শন করিতে করিতে আনন্দে ইক্ষু চর্ব্বণ করিতে লাগিল। ভদ্রলোকটীর সঙ্গে আলাপ করিলাম, তিনি ইংরাজী জানিতেন, সুতরাং অনেক সংবাদ তাঁহার নিকট হইতে লইতে লাগিলাম। তেলেগু ভাষায় কতকগুলি জিনিস পত্রের নামও তাঁহার নিকট খাতায় লিখাইয়া লইলাম।

ইঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে ভিজিয়ানাগ্রাম ষ্টেশনে আসিলাম। আমাদের এখানে নামিবার কথা ছিল, কিন্তু শীঘ্র অন্যান্য স্থান দর্শন আশায় ঐ স্থানে অবতরণ করিলাম না। ষ্টেশনের নিকট হইতে এ সহরটী বেশ জনাকীর্ণ অট্টালিকাদিবহুল বলিয়া বোধ হইল। একটী হ্রদপ্রায় বৃহৎ তড়াগের তীরে সহরের কতক অংশ বিদ্যমান। ষ্টেশন হইতে সহরাভিমুখে উচ্চ ভূধরশ্রেণী সহরের অপর পার্শ্বে বর্ত্তমান। ষ্টেশনের অপরদিকেও নানাবিধ ফলমূলের বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান প্রভৃতি অবস্থিত, উহার পরে আবার পর্ব্বতমালা। সহরটী যে সমতল ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত, তাহার চারিদেকেই শৈলশ্রেণী, একরূপ এক জাতীয় বৃক্ষে পূর্ণ হওয়ায় বোধ হইল, যেন পর্ব্বতগুলি দূর্ব্বাদলমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। এখানে একটী দেশীয় রাজা আছেন। এখানে সংস্কৃতচর্চ্চা বেশ আছে, ইংরাজী কলেজও আছে। ইহা একটী প্রধান স্থান।

সন্ধ্যা ৭টা আন্দাজের সময় ওয়াল্‌টেয়ারে পঁহুছিয়া তথায় অবতরণ করিলাম।

ষ্টেশনের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে প্লেগ কর্ম্মচারীর লোক আমাদিগকে প্লেগ আফিসে যাইতে বলিল। কুলীরা পূর্ব্ব হইতেই তদ্দিকে যাইতেছিল; বোধ হইল যেন তাহাদের উপর এরূপ একটী সাধারণ হুকুম আছে। প্লেগ আফিসটী প্ল্যাটফরমের গায়েই, তথায় যাইবামাত্র একটী তদ্দেশীয় লোক আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিল, লোকটী ইংরাজীভাষাজ্ঞ ও পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরিচ্ছদাদি পরিহিত। দেখিলাম, আরও ২টী বাঙ্গালী তাহারই আদেশে একটী বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিয়াছে। বিলম্ব দেখিয়া আমরা একটী গোযান ভাড়া করিবার চেষ্টা করিতে গেলাম, বিদেশীয় দেখিয়া তাহারা বিস্তর ভাড়া চাহিল। আমরা কুলীগুলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা ঠিক কথা বলিতে অনিচ্ছুক, যাহা হউক আন্দাজ পাইয়া ৵০ আনায় একটী গাড়ী ভাড়া করিলাম। কোথায় যাইব ইতিপূর্ব্বে কিছুই স্থির ছিল না। পথে সেই লোকটীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, দক্ষিণ দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই ছত্র বা হোটেল থাকে, এদিকে প্লেগের চৌকিদারটী ও কুলীরা সকলেই বলিল যে, ছত্রই ভাল; আমরা সুতরাং ছত্রে যাইব স্থির করিয়া গাড়োয়ানের সহিত গাড়ীর বন্দোবস্ত করিলাম। কুলীরাও আমাদের জিনিষ পত্র গাড়িতে উঠাইয়া দিল। বন্ধুটীকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া আমি প্লেগ কর্ম্মচারীর নিকট আসিলাম।

দেখিলাম তিনি তখন কয়েকটী ফিরিঙ্গী মহিলাকে প্লেগ সার্টিফিকেট দিতে ব্যস্ত। তাঁহারা যদিও পরে আসিয়াছেন, তথাপি অগ্রে তাঁহাদের কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। একদল একটু সাহেবী মেজাজ দেখাইয়া সেই আফিসে না আসায় প্লেগকর্ম্মচারীটী প্ল্যাটফরমের ভিতর যাইয়া তাহাদের নাম ধাম লইয়া আসিলেন, এইরূপে আমাদিগের একটু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক তিনি ফিরিঙ্গীদিগের পরেই আমাদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, ও নাম ধাম, পিতার নাম, কোথা হইতে আগমন, কোথায় গমন, এই সকল লিখিয়া লইলেন, এবং পরিশেষে তাহাতে আমাদের সহি লইয়া উহার একটী অনুলিপি আমাদের হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন যে, আপনাদিগের ছত্রের নিকট একটী পুলীসষ্টেশন আছে, তথায় প্রাতে প্লেগ ডাক্তার আইসেন। আপনারা প্রত্যহ তাঁহার নিকট আসিবেন, তিনি আপনাদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন, আমরা অগত্যা তথাস্তু বলিয়া সেই গাড়ীতে চড়িয়া ছত্রাভিমুখে আসিতে লাগিলাম।

যে পথ দিয়া চলিলাম, উহা একটী প্রশস্ত পথ কিন্তু আলোকাভাবে অন্ধকারাবৃত। প্রায় ২০।২৫ মিনিট পরে আমরা ছত্রের নিকট আসিয়া পঁহুছিলাম।

ছত্রটির নাম টরনার ছত্র। টরনার সাহেব এককালে এখানকার শাসনবিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁরই যত্নে দেশীয় ধনিগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা এই ছত্রটি স্থাপিত। ছত্রটী প্রাচীর পরিবেষ্টিত ও একটী প্রধান ও প্রশস্ত পথপার্শ্বে অবস্থিত, উহার সম্মুখে একটী বৃহৎ ফটক। আমাদের গোযান ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুলবাগানের মধ্যে ছত্র গৃহের সম্মুখে থামিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় ৮৷১০টী ধাপ উঠিয়া ছত্র মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে একটী বৃহৎ দালানবিশেষ, উহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে গৃহশ্রেণী বর্ত্তমান। তন্মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বের গৃহে একটী কেরাণির আফিস ও বাসগৃহ। আমরা আমাদের গাড়োয়ানকে সঙ্গে লইয়া কেরাণী বাবুর গৃহের সম্মুখে আসিলাম। দেখিলাম যে, তিনি ব্রাহ্মণাদিবৎ আচার সম্পন্ন ও আফিসগৃহটীই তাঁহার বাসগৃহ। আফিস গৃহে টেবিল চেয়ারের পরিবর্ত্তে ভূমিতলে কম্বলাসনে দোয়াত কলম ও লিখিবার বাক্স প্রভৃতি, ও পার্শ্বেই শয়নার্থ খাটিয়া রহিয়াছে। কাজেই আমাকে গৃহ প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইল। ইহাদের মাতৃভাষা তেলেগু। হিন্দুস্থানী জানে না ইহা পূর্ব্বেই জানিতাম সুতরাং আমাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিতে হইল। তিনি আমাদিগকে ভিন্নদেশীয় ও ইংরাজীতে কথা কহিতে শুনিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রথমেই এরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া একটু চিন্তান্বিতচিত্তে আমাদের পরিচয় দিলাম ও আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। তিনি কিন্তু আশ্রয় পাওয়া যাইবে কি না কিছুই না বলিয়া অগ্রে আমাদের প্লেগ পাশ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন ও আছে শুনিয়া উহা দেখিতে চাহিলেন। আমরা তাহা দিতে, তিনি পড়িয়া আমাদের জাতি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ নহি শুনিয়া ব্রাহ্মণেতরদিগের জন্য গৃহশ্রেণীর মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে একটী ঘর খুলিয়া দিলেন।

আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতি জ্বালিয়া ক্রমে আমাদের জিনিষপত্র সমুদায় আনাইলাম ও সর্ব্বাগ্রে বিছানা করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অতঃপর একটী ভৃত্যের জন্য কেরাণীটীকে অনুরোধ করায় তিনি একটী বালক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বালকটী পূর্ব্বে একটি বাঙ্গালী বাবুর কাছে থাকায় একটু একটু হিন্দী বুঝিত। আমরা সমস্ত দিন গাড়ীতে থাকায় শৌচাদির জন্য চাকরটীকে স্থান দেখাইয়া দিতে বলিলাম। বালকটী আমাকে ছত্রের পশ্চাদ্ভাগে দূরে বাগানটীর এক কোণে লইয়া গেল। এখানে পায়খানার ব্যবস্থা দেখিয়া বড়ই ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল, ইহা একটী ১০৷১২ হাত লম্বা ও ৭৷৮ হাত

প্রশস্ত এক খণ্ড ভূমি, একটী প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও উভয় পার্শ্বে ইহার দুটী প্রবেশ পথ। সে ২টী এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে, বহির্দ্দেশ হইতে অভ্যন্তর দেখা যায় না। অনেকটা রেলওয়ে ষ্টেশনের মত। অভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে দুই একটী নালী কাটা ও নালীর ধারে একটী ২ ফুট প্রশস্ত ও ১ বা ১॥ ফুট উচ্চ ধাপ বিশেষ। ইহা এতই অপরিষ্কার যে, দৃষ্টি মাত্রেই ঘৃণা উপস্থিত হয়। বাগানের অপরকোণে স্ত্রীলোকদিগের জন্য ঠিক এইরূপ একটী স্থান আছে। অতঃপর স্বগৃহে প্রত্যা-গমন পূর্ব্বক সঙ্গে যাহা খাদ্য ছিল, তদ্দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্ত করিয়া রাত্রিটী যাপন করিলাম।

শয়নার্থ যে ঘরটী পাইয়াছিলাম, তাহা একতলা ও মাটী হইতে ৩।৪ হাত উচ্চ ও প্রশস্ত। ঘরের পশ্চাতে একটী দ্বার। উহা খুলিলেই একটী দালান, তাহার পর একটী উঠান ও তাহার পর আবার দালান। তথায় দুটী উনান প্রস্তুত রহিয়াছে এবং তাহার পরেই একটী দ্বার। ইহা খুলিলেই ছত্র-বেষ্টিত বাগানটীর মধ্যে যাওয়া যায়। ঘরের প্রবেশদ্বার, দালানের দ্বার ও শেষ বাগানে যাইবার দ্বার কয়টী সামনাসামনি। সুতরাং সব কয়টী খুলিলে খুব হাওয়া পাওয়া যায়। ঘরে আলোক ও বাতাস আসিবার জন্য দ্বার ২টীর উপরে সার্সি-বিশিষ্ট জানালা আছে। প্রয়োজন হইলে লম্বমান রজ্জু টানিয়া উহা খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যত গুলি ঘর আছে, সমস্ত এই প্রকারের এবং সব গুলি একটী বৃহৎ উচ্চ উঠানের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। উঠানের মধ্যে একটী আলোকস্তম্ভ আছে, রাত্রে উহাতে প্রতিদিন আলোক জ্বালা হয়। যাহা হউক উপযুক্ত তত্ত্বাবধান হেতু ছত্রটী অতি সুব্যবস্থিত। ছত্রের সম্মুখে জলের কল ও পশ্চাতে একটি কূপ আছে। কূপের দড়ী ও তালপত্রের এক প্রকার জল তুলিবার পাত্রও রক্ষিত রহিয়াছে। ২ দিনের পর ।০ আনা করিয়া ঘর ভাড়া দিতে হয়।

প্রাতে উঠিয়াই চাকরটীকে সঙ্গে করিয়া পুলীসের প্লেগ আফিসে গেলাম। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর প্রায় ৮ টার সময় একটী দেশীয় ডাক্তার আসিলেন ও আমাদের সুস্থ চেহারা দেখিয়া প্লেগের পাশে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। অতঃপর আমরা মাদ্রাজ যাইব বলায় সেটীও তাহাতে লিখিয়া দিলেন। ষ্টেশনে যখন ইহা আমাদিগকে প্রদত্ত হয়, তখনই ইহা ৩ কাপি হইয়াছিল। তাহারই একটী কাপি ইতিমধ্যে ডাক্তারের নিকট আসিয়াছিল। সেই খানিতে অতঃপর আমাদের গন্তব্য স্থানের উল্লেখ করিয়া উহা মাদ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। প্লেগ আফিসটী বাজারের নিকট ও ছত্রেরও খুব নিকটে ; আমরা ফিরিয়া আসিবার

কালে ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে কিছু খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া ছত্রে আসিয়া পঁহুছিলাম। অতঃপর সত্বর পাকাদি সম্পন্ন করিয়া সিংহাচলে যাইবার জন্য একটী ঘোড়ার গাড়ী ডাকাইলাম। যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া ২৵০ আনা স্থির হইল ও প্রায় ১১ টার সময় সিংহাচল দর্শন মানসে ছত্রের কেরাণী বাবুটীর সহিত বহির্গত হইলাম। কেরাণী বাবুটী ইতিপূর্ব্বে আমাদের সিংহাচলে যাইবার কথা শুনিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আমাদের সম্মতিতে দেব দর্শন উদ্দেশে উপবাসী ছিলেন।

সিংহাচল অতি প্রাচীন তীর্থ। ইহা নৃসিংহদেবের স্থান। এখানকার পুরোহিত-গণ মুখে শুনিলাম, ইহা সত্যযুগে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত। ইহা হইতে সত্যযুগের সম্বন্ধে পুরোহিতগণের জ্ঞান কিরূপ তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারিলাম। বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রায় ৬০০।৭০০ শত বৎসরের পুরাতন, ইহা উড়িষ্যার গজপতিরাজবংশীয়গণ নির্ম্মাণ করেন। ইহা সুকঠিন কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ও অতি সুন্দর সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক দেবলীলা প্রভৃতি কারুকার্য্যে ভূষিত। অনেকের মুখে শুনিলাম, ইহা অতি প্রাচীন মন্দির সমূহের অন্যতম। মন্দিরের উপরিভাগটীতে কালজনিত ক্ষয় নিবারণার্থ চুন বালী দিয়া কারুকার্য্যসমূহ আবৃত করিয়া মন্দিরটীর সংস্কার করা হইয়াছে। তলদেশে মন্দিরপ্রাচীরে যে সমস্ত কারুকার্য্য রহিয়াছে, তাহা আবৃত করা হয় নাই। তাহা দেখিয়া মন্দিরের উপরের কার্য্যগুলি কি ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। শুনিলাম, কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রধান মূর্ত্তিগুলির নাক, কান, হাত, পা প্রভৃতি, কোনও সময় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক এই মন্দির লুটপাটকালে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। মন্দিরের মধ্যে এখন কোন পূর্ব্বের বিগ্রহ নাই। নৃসিংহ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একটী এক হস্ত পরিমিত ব্যাসের গোলাকার ৪।৫ হাত উচ্চ ক্রমসূক্ষ্ম চুণকাম করা একটী স্তম্ভে ২।১ ইঞ্চি মোটা সুবর্ণফলক নির্ম্মিত রামানুজীগণের চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান। গৃহের পশ্চাদ্ভাগে বহির্দ্দেশে দেয়ালে একটী ২ হাত লম্বা ও ১ হাত প্রশস্ত হিরণ্যকশিপুবিনাশকারী অতি সুন্দর নৃসিংহ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে ; তাহা দেখিয়া বোধ হইল যে, মন্দিরের ভিতরেও এই প্রকার কোন একটী বিগ্রহ ছিল, যাহা বিনষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ স্তম্ভ হইতে ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপু বধ করেন বলিয়া স্তম্ভ মাত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবানের পূজা হইয়া আসিতেছে, উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও হয়ত আবার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহাই হউক স্তম্ভের রামানুজী চিহ্নটি যে রামানুজের কীর্ত্তি ঘোষিত করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে সহজেই বুঝা যায় যে, রামানুজী স্থান সমূহে এই চিহ্নটি বৃহদাকারে দেবালয় প্রভৃতিতে অতি মাত্রায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। এস্থানটিকে নৃসিংহ ক্ষেত্র বলা হয়। জগন্নাথদেবের স্থান যেমন শ্রীক্ষেত্র, তাহার দক্ষিণে যেমন কূর্ম্ম ক্ষেত্র, তদ্রূপ আবার তাহারও দক্ষিণে এই নৃসিংহ ক্ষেত্র। কূর্ম্ম ক্ষেত্রের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে প্রদান করি নাই। আমরা তথায় নামিতে পারি নাই সুতরাং শুনা কথা ব্যতীত অধিক বলিবার ক্ষমতা নাই। যাঁহারা এস্থলে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই বি, এন, আর, রেল লাইনে চিকাকোল রোড ষ্টেশনে নামিয়া গরুর গাড়ীর সাহায্যে সমুদ্রাভিমুখে ৭।৮ মাইল দূর যাইলে কূর্ম্ম ক্ষেত্রে ভগবানের কূর্ম্ম-মূর্ত্তির দর্শন পাইবেন। বলিতে কি ক্ষেত্র কথাটির সার্থকতা এই স্থানগুলি দেখিলেই বোধ হয়। শ্রীক্ষেত্রে সুজলা সুফলা শ্যামল ভূমির শ্রী বা শোভা দর্শনে শ্রীক্ষেত্র কথাটির সার্থকতা মনে স্বতই উদয় হইয়াছিল। এই কূর্ম্মক্ষেত্র প্রদেশও তদ্রূপ বহুদুরব্যাপী কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ। গোলপর্ব্বতগুলি সমতল ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অগণিত কূর্ম্মরূপ স্মরণ করাইয়া দেয়। এজন্যই বোধ হয় ইহাকে কূর্ম্মক্ষেত্র বলা হয়।

যাহা হউক এক্ষণে আমরা সবিস্তারে সিংহাচলের কথা বর্ণন করিব। ইহা পূর্ব্বকালে দুর্গম থাকিলেও প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইত। গীতা ভাগবত প্রভৃতির টীকাকার শ্রীধর স্বামী, যাঁহাকে চৈতন্য দেব বহুমান্য করিতেন, তিনি এই সিংহাচলে নৃসিংহদেবের মন্দিরে বহু সাধনার পর ভগবান্‌কে নৃসিংহ মূর্ত্তিতে দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। এখানে প্রায় সমস্ত ধর্ম্মসংস্থাপকগণই আসিয়াছিলেন। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই এ স্থলের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা ইহার গুরুত্বানুরূপ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তথাপি ইহার পথ-ঘাটের বিবরণ কিঞ্চিৎ দিতেছি। ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদের বহু গবেষণার বিষয়; ইহা হইতে ঐতিহাসিক ঘটনা অনেক উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। এই তীর্থ ভিজিগা-পট্টন বা বিশাখা পত্তন হইতে ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে। পরন্তু যে পথ দিয়া যাইতে হইল, তাহাতে ইহা ১০ মাইল দূর। বিশাখাপত্তনের উত্তর পশ্চিম দিকে যে পর্ব্বত শ্রেণী বর্ত্তমান, তাহারই ক্রোড়স্থলে ও উক্ত নগরীর বিপরীত দিকে নাতি-উচ্চ পর্ব্বতোপরি মন্দিরটী অবস্থিত। যে দিকে সিংহাচল, সেদিকে উক্ত পর্ব্বতের ঢালু পার্শ্ব ও যে দিকে বিশাখাপত্তন বর্ত্তমান, সে দিকে পর্ব্বতটী খাড়া। সুতরাং আমাদের গাড়ী ক্রমে সহরের সমতলভূমি অতিক্রম করিয়া উক্ত পর্ব্বতের

তলদেশ দিয়া একটি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে পর্ব্বতের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তটি বেষ্টনানন্তর পর্ব্বতটির অপর দিকে আসিয়া পঁহুছিল।

এ স্থলের স্বাভাবিক শোভা অতি মনোরম। এ দিকের পর্ব্বতগুলিতে মনুষ্যের বসতি নাই বলিয়া বোধ হইল সুতরাং বন্য ভাবের শোভা যেন অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। সমতল ভূমিতে কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র, কোথাও তাল বৃক্ষ কোথাও বা নিবিড় অরণ্য। এই ভূমিখণ্ড কোথাও উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত কোথাও বা ক্রমশঃ পর্ব্বত মধ্যে বিলীন। সে অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এখানে পর্ব্বতও নানাপ্রকার। কোনটি বা বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ, কোনটি বা তৃণমণ্ডিত, আবার কোনটি বা রুক্ষ ও শুষ্ক বিবিধ বর্ণের প্রস্তরপ্রচুর। উচ্চতায়ও এগুলি বড় কম নহে, কোন কোনটির শিরোদেশ মেঘমালায় আবৃত দেখা গিয়াছিল। ক্রমে আমরা নিতান্ত বিজন প্রদেশে আসিলাম, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই যেন একটি পল্লিগ্রাম পরিলক্ষিত হইল। বিজয় নগরের রাজা এই রাস্তার দুই ধারে কতকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেছেন, বোধ হইল ইহা বাসস্থান বা দোকান ঘরের উদ্দেশে নির্ম্মিত হইতেছে। অনতিদূরে বাজার একটী বাগানবাটী ও বাজার। বাজারের কিয়দ্দূর উভয় পার্শ্বে অনধিকৃত গৃহশ্রেণী, মধ্যে একটী ঘণ্টাবিশিষ্ট ধ্বজার স্তম্ভ।

বাজারের রাস্তার মোড় ফিরিয়া সিংহাচলের সিঁড়ী আরম্ভ। এই খানে কয়েকখানি দোকানে জলখাবার, কলা, ডাব ও ফুল প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। আমাদের গাড়ী এই খানে আসিয়া থামিল। আমরাও নামিয়া কিঞ্চিৎ ফুল ক্রয় করিয়া সকলের কথামত খালি পায়ে সিঁড়ীতে উঠিতে লাগিলাম। এই সিঁড়ী ৮।১০ হাত লম্বা ও পাকা বাঁধান, মধ্যে মধ্যে প্রস্তরে নাম খোদিত করিয়া এক একটী ধাপের মধ্যস্থলে বসান। অভিপ্রায় এই যে, নৃসিংহদেব-দর্শনাভিলাষী ভক্তগণের পাদস্পর্শে তাঁহারা চরিতার্থ হইবেন। সিঁড়ীর সংখ্যা যতদূর মনে হয় ৭।৮ শত হইবে, এই সিঁড়ীর উভয় পার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষ শ্রেণী; উহাদের ছায়ায় পথিকের আতপতাপ দূর হইবে, এই কারণেই বৃক্ষগুলি রোপিত হইয়াছে। নানাবিধ ভিক্ষুক এই সিঁড়ীর পথের প্রথমার্দ্ধে ভিক্ষার্থ উপবিষ্ট; তাহারা তেলেগু ভাষায় সুর করিয়া তাহাদের কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে; উহাতে লোকের মনে স্বতঃই দয়ার উদ্রেক করিয়া দেয়। ইহারা সংখ্যায় এতই অধিক যে, কোনও বিশেষ ধনী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ তাহাদিগের সকলকে কিছু কিছু দিয়া উঠিতে পারে না। ক্রমে আমরা যতই উঠিতে লাগিলাম, তলভূমির

শোভা ততই মনোমুগ্ধকর বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরিভাগে আসিয়া পঁহুছিলাম ও একটু সমতলক্ষেত্রের উপর আসিলাম। এই ক্ষেত্র মধ্যে ২।৩টী অতি প্রাচীন বৃহৎ বৃক্ষের গোড়া বাধাইয়া বসিবার স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকে ক্লান্ত হইলে এইখানে বিশ্রামের বেশ সুবিধা পায়।

কিয়দ্দূরে আবার উচ্চ সিঁড়ী আরম্ভ, আমরা বিশ্রাম না করিয়াই উঠিতে লাগিলাম, কারণ ভোগান্তে মন্দির বন্ধ হইবার আশঙ্কা ছিল। কিয়ংক্ষণ পরে উভয় পার্শ্বে খোলার চালযুক্ত গৃহশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, দরিদ্র গৃহস্থ ব্যক্তিগণ তাহাতে বাস করে। অনুসন্ধানে জানিলাম, উহারা বারাঙ্গনাবিশেষ। তাহারাই মন্দিরের দেবদাসী। ইহারা কেহ কেহ মুরগীও পোষে। কোথাও বা গৃহের সম্মুখস্থ রাস্তায় চ্যাটাইয়ের উপর তেঁতুল, ডাল প্রভৃতি শুকাইতে দিয়াছে দেখিলাম। মোড় ফিরিয়াই উচ্চে মন্দির দেখিতে পাইলাম, মন্দিরের চূড়ায় সুবর্ণ বর্ণের কলস সূর্য্যালোকে চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে। ক্রমে আমরা নিকটে আসিলাম, কেরাণি বাবুটী বলিলেন যে, প্রথমে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিতে হয়। উহা ইহার পশ্চাদ্ভাগে একটু দূরে অবস্থিত। সুতরাং মন্দিরটীকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। এ পথটী সমতল, ইহার বামপার্শ্বে পাণ্ডাদিগের খোলার ঘর। যাত্রীরাও ইহার ভিতরে থাকিতে পায়। দক্ষিণ পার্শ্বে মন্দিরের প্রাচীর ও তৎপরে বামদিকের মত পাণ্ডাদিগের ঘর। মন্দিরের প্রাচীরেও বারাণ্ডার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সমূহ রহিয়াছে, বোধ হইল পূর্ব্বে ইহাতেও যাত্রিগণ অবস্থান করিত। এখন ইহা অপরিষ্কৃত ও বাসের অনুপযোগী। কিয়দ্দূরে যাইয়া আবার একটী মোড় ফিরিতে হইল ও আবার পর্ব্বতোপরি উঠিতে হইল। এই পথের উভয়পার্শ্বে বাগান। নানাবিধ বৃক্ষের মধ্যে আম্র ও লাল কলার গাছ যথেষ্ট দেখিলাম। কিয়দ্দূরে ঝরণা ও একটু আধটু জঙ্গল।

আধ মাইল দূরে উচ্চ পর্ব্বতের ক্রোড়ে রামচন্দ্রের মন্দির। ইহার সম্মুখে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মত একটী ঝরণা ও কুণ্ড। তিনদিকের পর্ব্বত কাটিয়া ইহা প্রস্তুত। অনবরত জলপাতে প্রস্তরগাত্রে কৃষ্ণবর্ণ শৈবাল প্রভৃতি জন্মিয়াছে ও সর্ব্বদা সিক্ত থাকিয়া কিরূপ যেন একটা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ কুণ্ডে জল নাই, বোধ হইল পূর্ব্বে এখানে কোন দেবমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, অথবা ইহাতে স্নান মাত্রই করিতে হয়, এখন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ইহারই সংশ্লিষ্ট ঠিক মন্দিরপ্রাচীরের গাত্রেই একটী চৌবাচ্চার মত কুণ্ড, ইহার মধ্যে বৃষ ও শিবলিঙ্গ বিরাজমান ও তদুপরি জলধারা পতিত হইতেছে। তাহার ধারে পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ কুণ্ডের এক প্রান্তে আর একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। পরন্তু যত্নের যথেষ্ট অভাব বোধ হইল। অধিক কি ইহা যেন পূর্ব্বকালের কিছুর ভগ্নাবস্থা বিশেষ। আমরা মন্দিরের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ এই স্থানটী দেখিয়া মন্দিরপ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ইহা একটী অতি ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দির, সম্মুখে সংলগ্ন একটী নাটমন্দির। ইহা এত ছোট যে, বোধ হয় ২০।২৫ জনের অধিক লোক ইহাতে স্থান পায় না। রামচন্দ্রের মূর্ত্তিটী সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক। নাটমন্দিরের ভিতর অনেকগুলি ছবি ও ফটো রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকখানি রামানুজীয় সাধুগণের ছবি। অপর কয়েকখানি যতদূর মনে হয় দেবলীলার চিত্র। মন্দিরের একধারের প্রাচীরের ভিতর দিকে গৃহশ্রেণী রহিয়াছে, তাহারই এককোণে একটী বৃদ্ধ পুরোহিত বাস করেন। বোধ হইল পুরোহিতের পরিবারবর্গও এখানে আছেন। একটী প্রকোষ্ঠে একটী রামানুজীয় ব্রহ্মচারী সাধু তীর্থভ্রমণোপলক্ষে অবস্থান করিতেছেন। সঙ্গে তাঁহার একটী বাক্স, তাহারই ভিতরে কয়েকটী দেবমূর্ত্তি ও পূজোপকরণসমূহ রহিয়াছে। বাক্সের ডালা খুলিয়া তাহার উপর ঠাকুর বসাইয়া পূজান্তে স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন।

একটী কম্বলের উপরে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে দেখিয়া আমরা তাঁহাকে রামানুজ সম্প্রদায়ের কয়েকখানি পুস্তকের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু পরে জানিলাম যে, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। সাধুটীর নিকটে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে, একটী স্থানীয় বালক তাহাতে মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করিতেছে। বুঝিতে পারিলাম না যে, উহা সাধুটীর দ্বারা স্থাপিত বা উহা মন্দিরের পুরোহিত দ্বারা স্থাপিত কোন যজ্ঞকুণ্ড। ইঁহারা হিন্দুস্থানী বড় অল্প জানিতেন, কাজেই আমাদের তথ্য সংগ্রহের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। মন্দিরের প্রাচীরের ফটক হইতে বাহির হইয়াই সম্মুখে একখণ্ড অতি বৃহৎ উচ্চ প্রস্তরগাত্রে কতকগুলি নাম নানা ভাষায় লেখা রহিয়াছে দেখিলাম। তাহাতে দুইটী মুসলমানেরও নাম রহিয়াছে। বোধ হইল উহাঁরা এইস্থলে আসিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমরা সেই পথ দিয়াই নৃসিংহ মন্দিরে আসিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে প্রায় ৪০।৫০টি সিঁড়ী উঠিতে হয়, তৎপরে মন্দিরের ফটক পাওয়া যায়। এই সিঁড়ীর অর্দ্ধেক উঠিয়া দুইধারে ২টি বারাণ্ডার মত গৃহ আছে; একটি খালি পড়িয়া রহিয়াছে, অপরটিতে

একটী বৃহৎ ঘড়ী সময় নিরূপণার্থ রহিয়াছে। ঘড়িটী একটী লোহার সিকের দরজা বিশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে আবদ্ধ। দরজায় তালা দেওয়া, পাছে কেহ কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য স্পর্শ করে।

তাহার পর মন্দিরের ফটকে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম, দক্ষিণে এক ব্যক্তি কতকগুলি ঝুনা নারিকেল বিক্রয় করিতেছে। একটী নারিকেল ৵০ আনার কমে বিক্রয় করে না। যাত্রিগণ নারিকেল লইয়া দেবদর্শন করে বলিয়া ঐ ব্যক্তি তথায় রহিয়াছে। অতঃপর মন্দিরের নাটমন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে একটী ব্রাহ্মণ প্রহরী আমার জাতি জিজ্ঞাসা করিল। আমি কায়স্থ বলায় আমার নিকট চারিটী পয়সা দাবী করিল। আমি আপত্তি করিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণেতরজাতীয় লোক উহা-দেয় জানিয়া উহা দিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইহার ভিতরে যথেষ্ট স্থান, বোধ হয় ৩।৪ শত ব্যক্তির এককালে স্থান হইতে পারে। যতই যাইতে লাগিলাম, ক্রমে অন্ধকার ও চামচিকার দুর্গন্ধ। ক্রমে ইহা এতই প্রবল হইল যে, দেবদর্শন উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলাম। ক্রমে মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইলাম, দেখিলাম তখন ভোগ হইতেছে, সুতরাং প্রবেশ করিতে পাইলাম না। ইত্যবকাশে আমি নাট-মন্দিরের ভিতরে ভিতরেই মন্দিরটীকে প্রদক্ষিণ করিলাম ও পুরোহিতগণের নিকট হইতে মন্দিরের বৃত্তান্ত সংগ্রহে যত্ন করিতে লাগিলাম। তেলেগু ভাষা না জানায় এবং তাহারাও ইংরাজী নিতান্ত অল্প জানায় বড়ই অসুবিধা হইল। বুঝিলাম, ইহাঁরা শঙ্কর সম্প্রদায় ভুক্ত। দক্ষিণদেশীয় বিষ্ণুমন্দির সমূহ প্রায়ই যেমন রামানুজ সম্প্রদায়ের হস্তে রহিয়াছে, এটী তদ্রূপ নয়। বিজয়নগরের রাজার অধীনে মন্দিরটী থাকিলেও ইহারাই পুরোহিত। শুনিলাম, মুসলমান নবাব সাজাহান ইহার বিস্তর ক্ষতি করেন। সেবার জন্য জায়গীর প্রভৃতি আছে। সমাগত যাত্রী ও পাণ্ডা ব্রাহ্মণগণকে সমভাবেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদ এখানে অন্ন ও যৎকিঞ্চিৎ উপকরণ, বড় বড় পিতলের পাত্রে রক্ষিত হইয়াছে। অন্নও যে খুব উৎকৃষ্ট চাউলের, তাহা নহে। যাহা দেখিলাম, তাহাতে উহা আমাদের দেশের আউস চালের অন্নের মত লাল ও মোটা। পাণ্ডা ও সমাগত যাত্রিগণ অতি ব্যস্ততা সহকারে প্রসাদ লইয়া চলিয়া যাইতেছে।

অতঃপর প্রসাদ সমুদায় নিঃশেষ হইলে কয়েকটী লোক শীঘ্রই সেই স্থানটী মার্জ্জিত করিল ও একটী লোক আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া যাইল। ভিতরে আরও অন্ধকার, সুতরাং দীপালোক সাহায্যে যাইতে হইল। দীপও প্রচুর নহে, পরন্তু দীপস্থানগুলি বহুকাল হইতে তৈলসিক্ত হইয়া অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হইয়া

রহিয়াছে। কিছুদূর এইরূপ অন্ধকারের ভিতর দিয়া যাইয়া দেবগৃহের দ্বারে উপনীত হইলাম। দ্বারের চারিপার্শ্বে প্রদীপ সংস্থান ব্যবস্থাও পূর্ব্ববৎ অপরিষ্কার। অতি নিবিড় অন্ধকারে প্রদীপের ক্ষীণালোকে শ্বাসরোধকারী চির অবরুদ্ধ বায়ুতে জনতার মধ্যে সুবর্ণ ফলকের দ্বারা রামানুজী বৈষ্ণবগণের কপালে অঙ্কিত চিহ্নের ন্যায় চিহ্নে চিহ্নিত শ্বেতবর্ণ স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। এখানে দর্শনার্থ পয়সার জন্য তত পীড়াপীড়ি নাই। কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতির পর মন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিলাম। মন্দিরের সর্ব্বত্রই অতি সুন্দর কারুকার্য্য, পরন্তু দুঃখের বিষয়, সে ঘোর অন্ধকারে প্রদীপালোকে সমস্ত ভালরূপ দেখা গেল না। অতঃপর আমার বন্ধুগণ আসিলেন, তাঁহারা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে আমরা পূর্ব্বোক্ত সিঁড়ীর পার্শ্বে অবস্থিত ঘরটীতে বসিয়া প্রসাদস্বরূপে প্রাপ্ত কলা ও নারিকেল খণ্ড ভক্ষণ করিলাম এবং সেই পূর্ব্বোক্ত পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। মন্দিরটী পাহাড়ের যেস্থানে অবস্থিত, তাহা সমুদ্র হইতে ৮০০ ফিট উচ্চ, সুতরাং পুনরায় পূর্ব্বোক্ত সিঁড়ী দিয়া আন্দাজ ১টার সময় আমাদের গাড়ীর নিকট আসিয়া পঁহুছিলাম।

সিংহাচলের বিষয় শেষ করিবার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। "ভাইজাগ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যানুয়েলে" নিম্নলিখিত সমাচার পাওয়া যায়। সিংহাচলের সহিত উর্দ্ধশির-শায়িত সিংহাকৃতির সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা বিশাখাপত্তন হইতে ১০ মাইল দূর। মন্দির এবং অন্যান্য অট্টালিকা প্রভৃতি উড়িষ্যার লাঙ্গল গজপতি রাজার দ্বারা প্রায় ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এস্থলে অনেক পবিত্রবারিবিশিষ্ট ঝরণা আছে। গঙ্গাধারি, গোদাবরিধারি, মাদাপাহিরি প্রভৃতি নামে উহারা পরিচিত। দেবমূর্ত্তিটী ঘৃতাক্ত চন্দনচূর্ণ দ্বারা আবৃত রাখা হয়। প্রতিবৎসর বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া দিবসে মূর্ত্তিটীকে উক্ত প্রলেপমুক্ত করা হয় ও সাধারণের সমক্ষে পূজা করা হয়। এই মহোৎসবটী চন্দনযাত্রা নামে এ দেশে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরে "কপ্পস্তম্ভ" নামে একটী স্তম্ভ আছে। ইহার অন্য নাম ভেকস্তম্ভ। ইহার উপরিভাগে একটী গর্ত্ত আছে। কথিত আছে, কোন সময়ে একটী ভেক এই স্তম্ভের উপরিভাগ হইতে নির্গত হওয়ায় এই গর্ত্তটী হইয়াছিল। বন্ধ্যা নারীগণ পুত্রার্থী হইয়া ইহার পূজা করেন। পর্ব্বতোপরি অর্দ্ধপথে একটী তোরণদ্বার আছে। ইহার নাম হনুমদ্দ্বারম্। ইহা হনুমানের স্থান। ইহার কারুকার্য্যও বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার বিবরণ তেলেগু ভাষায় ২।৩ খানি কাব্যে পাওয়া যায়। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন পশুপতি রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার হয়, এই মন্দির তখন তাঁহাদের অধীন ছিল।

ইঁহারা মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সাড়ে চৌদ্দ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করেন।

যাহা হউক ছত্রে ফিরিতে প্রায় বৈকাল হইল। আমরা ছত্রে পঁহুছিয়াই জগরাও মানমন্দির দর্শনে আবার বহির্গত হইলাম। জগরাও এখানকার একজন বড় জমিদার, প্রায় ৩।৪ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পাশ্চাত্য রীতিতে একটী মানমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটী বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও মানমন্দির সংক্রান্ত প্রায় সমুদায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রই আনাইয়াছেন। মানমন্দিরটী একটী প্রকাণ্ড মনোহর বাগানের মধ্যে। সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত একটী বাস বাটী, একটী বৃহৎ লাইব্রেরী ও আফিস প্রভৃতি প্রায় সমুদায়ই বেশ সুব্যবস্থিত। প্রধান কর্ম্মচারীর অনুমত্যনুসারে অপর এক কর্ম্মচারী আমাদিগকে সমুদায়ই দেখাইলেন। এই মানমন্দিরের সবিশেষ খ্যাতি আছে। বিলাতের নটিক্যাল অ্যালমানাকেও এই মানমন্দিরের উল্লেখ আছে। ওয়াল্‌টেয়ারে ইহা একটী দর্শনীয় বস্তু। অতঃপর আমরা সমুদ্রতীর দর্শনে বহির্গত হইলাম। সমুদ্রতীরটী অতি মনোরম। জলমধ্যে স্থানে স্থানে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত পর্ব্বতের অগ্রভাগ অল্প অল্প মাথা তুলিয়া তটের শোভা বড়ই মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। এ স্থলে তটটী সরল রেখা ক্রমে অবস্থিত নহে। একটু দক্ষিণ ভাগে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত ঠিক সমুদ্রের উপর খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, ইহার নাম Dolphin's nose এবং সমুদ্রের কিয়দংশ উক্ত পর্ব্বতে উত্তর দিকে সমতল ভূভাগের মধ্যে প্রবেশ করায় একটি ক্ষুদ্র উপসাগরের ন্যায় হইয়াছে। ইহাকে Lawson's Bay বলা হয়।

ডল্‌ফিন নোজের শিখরদেশে একটী পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে, অদ্যাপিও উহার ধ্বজা রাখিবার স্থানটি রহিয়াছে। পর্ব্বতের উত্তর ভাগে তলদেশে, একটী কামান রাখিবার স্থান ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। উহার পূর্ব্বদিকে একটী কএকমাইল ব্যাপী গুহা রহিয়াছে। উহা অতিশয় অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় বলিয়া এ পর্য্যন্ত উহার ভিতরে কেহ প্রবেশ করে নাই ইহার নিকটে একটী লাইট হাউস আছে। আমরা যে সময়ে সমুদ্রতীরে আসিয়াছিলাম, একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ তখন সমুদ্রবক্ষে অবস্থিতি করিতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগরের বালকগণ সমুদ্রতটে ক্রীড়া করিতেছিল। ওয়ালটেয়ার ও বিশাখাপত্তন পাশাপাশী সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ওয়ালটেয়ারটী ক্যাণ্টনমেণ্ট। দেশীয়গণের বাস সাধারণতঃ বিশাখাপত্তনে। বিশাখাপত্তনের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। চৈতন্যদেব তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে এ স্থলে আসিয়াছিলেন। ইংরাজি মতে

প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্রীর অন্ধ্রবংশীয় কুলোত্তুঙ্গ কোলা (এ নামের আদি ব্যক্তি নহেন) নামক রাজা বারাণসী যাইবার পথে এ স্থানটী অতি মনোরম দেখিয়া, তাঁহাদের কুল দেবতা কার্ত্তিকেয়দেবের একটি মন্দির স্থাপন করেন। ঐ স্থানটির নাম তীর্থপুরালু। ইহা লসন্স বের দক্ষিণে। সমুদ্রের ভাঙ্গনীতে ইহা এক্ষণে বিলুপ্ত। তথাপি অদ্যাবধি এ স্থানের হিন্দু-গণ বৎসরের কোন এক বিশেষ দিনে উক্ত মন্দির যথায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তথায় সমুদ্র-স্নান করিয়া থকেন। কার্ত্তিকেয়ের মন্দির হইতে এই স্থানটি অদ্যাবধি বিশাখা-পত্তন নামে খ্যাত রহিয়াছে। ওয়াল্‌টেয়ারের স্বাস্থ্য খুব ভাল। আজকাল অনেক বাঙ্গালী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এ স্থানে আসিতেছেন। শুনিয়াছিলাম এস্থানে অনেক খরচ পড়িয়া থাকে; কিন্তু যাহা আমরা দেখিলাম, তাহাতে ইহাকে ওরূপ বলা যায় না। এখানে দ্বিতল বাটী চাকর প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। লোকগুলিও উত্তম প্রকৃতি। পুরীর দক্ষিণে সমুদ্র তীরে বায়ু পরিবর্ত্তনের পক্ষে ইহা অতি উত্তম স্থান। প্লেগ এখনও এখানে প্রবেশ করে নাই এবং কোন বিশেষ ব্যাধিরও এখানে প্রাবল্য নাই। একাধারে এ জেলার সমস্ত বিবরণ জানিতে হইলে ভিজা-গাপটাম্ জেলার সরকারি ম্যানুয়েল পুস্তক দেখা উচিত। অতঃপর সন্ধ্যা ৭টার সময় কলিকাতা হইতে যে মেল গাড়ি আসে, তাহার জন্য আমরা প্রস্তুত হইলাম ও যথাসময়ে ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম।

ক্রমশঃ।

সাবিত্রী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উন্মোচিয়া ফেলি দূরে যত অলঙ্কার
সুবর্ণের, রাখি করে শঙ্খের বলয়,
ঘুচায়ে সুপট্টবাস পরিয়া বল্কল,
পতি অনুরূপ বেশে সাজিলা সুন্দরী
সন্ন্যাসিনী; তপোবনে উদয় কি আজি,
ধরি বরতপস্বিনী মূর্ত্তি, আদ্যা সতী!

শ্বশুর শ্বাশুড়ী উভে কহিলেন কত
সাদরে চিবুক ধরি, "এ বেশ কি মাগো,
সাজে মা তোমার, বরাঙ্গিনী তুমি, যথা
তারকার মালা পরি শোভে সুধাকর,
শোভে এ সুতনু তব রতন ভূষণে।
দিতে খেদ, সাজিলা কি সন্ন্যাসিনী বেশে?"
"হে আর্য্যে", কহিলা সতী, "পতি যে জনার
সন্ন্যাসী, সাজে কি তার অলঙ্কার দেহে?
পত্নীর দ্বিতীয়া আখ্যা সধর্ম্মিণী বলি।"
সাবিত্রী রমণীকুলে অতুল রতন,
যে রত্ন সৃজন করি বিধাতা আপন
সৃষ্টির মহত্ত্ব তাঁর করিলা প্রকাশ।
শ্বশুর শ্বাশুড়ী দোহে পিতৃ-মাতৃ-জ্ঞানে
স্বামীর সঙ্গিনীরূপে লাগিলা সেবিতে;
মনোমত তাঁহাদের সেবা বা শুশ্রূষা
হলে পর, চিত্তে তাঁর আনন্দ কতই।
ফলমূল আহরণ করি বন হতে,
আনি দেয় সত্যবান্ সাবিত্রীর করে,
সাবিত্রী যতনে তাহা করি সংস্কার,
দোঁহার আহার তরে দেন সাজাইয়া।
পরে সে প্রসাদ লভি, পতিপত্নী দোঁহে
পরম প্রফুল্লমন; যথা ভক্তজন
পাইয়ে প্রসাদ দিব্য, শিবশঙ্করীর।
তপোবন শোভাকর কুসুম উদ্যান
তা হতে যতনে চয়ি কুসুমের রাশি
অর্চ্চনার আয়োজন দিইত করিয়া।
শ্বশুর শ্বাশুড়ী দোহে তুষিতেন তাঁয়
সৃষ্টি স্থিতি নাশ যাঁর আদেশ অধীন।
আপনি তুষিত বালা শিব শঙ্করীরে
স্বামী সত্যবান্ সাথে। অতিথি আইলে,

আপন আহার হোতে সন্তোষিয়া তাঁয়
সাদর বচনে তুষি দিতে না বিদায়।
সাবিত্রীর এই যত্ন স্নেহ শ্রদ্ধা দয়া,
শ্বশ্রুগৃহে সীমাবদ্ধ ছিল না কেবল।
পতি পুত্র ভগ্নী ভ্রাতা প্রিয়জন শোকে
প্রতিবেশিগণে কেহ হইলে ব্যথিত
অমনি ধাইত বালা মুছাইতে তার
আঁখি জল, ঘুচাইতে হৃদয়ের তাপ ;
এমনি পবিত্র বামা আগমনে তার,
ভয়ে দুঃখ শোক যেন ছাড়িত সে স্থল।
হের দেখ সাবিত্রীর পরণ কুটীরে,
কাঁদে যথা অভাগিনী অথবা অভাগা
মুষ্টিমেয় অন্ন তরে ; নিবারিতে তার
অন্নতৃষা ; সাবিত্রী লক্ষ্মীর অবতার।
সবাকার অনাটন করিতে মোচন
সতত তৎপর দেবী করি প্রাণপণ।
প্রবল ব্যাধির গ্রাসে হইয়া পতিত,
আত্মীয় বান্ধব জন শুশ্রূষা বঞ্চিত,
নিঃসহায় সাশ্রুনেত্রে, মলিনবদনে,
বিদ্রুত হৃদয়ে হায় ঘূর্ণিত মস্তকে,
প্রতিক্ষণ অপেক্ষায় মৃত্যু আগমন
হাদে দেখ, সেই স্থলে সাবিত্রী উদয়
সাক্ষাৎ করুণাদেবী ! কর দরশন,
আনন্দে উৎফুল্ল কিবা আর্ত্ত মুখখানি,
নিদাঘের তাপ তপ্ত কুমুদ যেমতি
প্রফুল্ল, পরশি কর পীত সুধাংশুর ;
কিম্বা স্তনপায়ী শিশু বহুক্ষণ পরে
পেয়ে মাতৃক্রোড় যথা সানন্দ বদন।
রোগী সে রোগের কথা সম্যক্ বিস্মৃত,
সেকর পল্লব স্পর্শে সুস্থ দেহ তার।

অন্ধ, খঞ্জ, হস্তহীন, জীর্ণ পক্ষাঘাতে,
অকর্ম্মণ্য, নিঃসহায় প্রতিবেশী যত,
স্নেহরসে প্রফুল্লিত রাখিতা সবায়,
রাখেন হিমাংশু যথা সদা ফুল দলে ।
জনক জননী হীন বালক বালিকা,
(সতত বিরস মুখ দেখি বুক ফাটে)
দয়াময়ী সাবিত্রীর লইয়া আশ্রয়,
মিটাইত পিতৃ-মাতৃ-স্নেহলাভ-আশ ।
মর্ত্ত্যলোকে কল্পতরু সাবিত্রী ভামিনী !
আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে,
মুহূর্ত্ত আপন দুঃখ না চিন্তি অন্তরে,
সতত ঈশ্বর নামে জয়ধ্বনি করে,
পরদুঃখ বিমোচনে নিয়ত চেষ্টিতা ।
জগতের দুখে দুঃখী দেবী কোন্ জন,
যেন হায় নারীবেশে ভূতলে উদয় !
আছিলা সাবিত্রী দেবী গুণে আপনার
প্রতিবেশী সবাকার আনন্দ আঁখির ।
গুণের তাঁহার কেহ প্রশংসা করিলে,
নত আঁখে মৃদু বাক্যে দিত প্রত্যুত্তর,
"মানব মানব-হিত পারে কি করিতে,
বিভুর বিধান মতে চলিছে সংসার ।"
সাবিত্রী যতেক সুখী পর দুঃখ হরি,
তা হতে অধিক সুখী সাধু সত্যবান্,
ভার্য্যায় নিযুক্তা হেরি সাধু অনুষ্ঠানে ।

শ্রীহা—　　ক্রমশঃ ।

পারলৌকিক স্বার্থপরতা।

(ব্রহ্মচারী উপেন্দ্রনাথ)।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ দুইদল দার্শনিক দেখা যায়। একদল বলেন, জ্ঞানের পর আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই; আর একদল বলেন, জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অবস্থান হওয়াই উচিত। প্রথম দলের নেতা ভগবান্ শঙ্করস্বামী, দ্বিতীয় দলের নেতা রামানুজাচার্য্য। আত্মার সম্বন্ধে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়াতেই জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্নরূপ ধারণা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন—আত্মা এক ও বিভু, রামানুজ বলেন—আত্মা অণু সুতরাং বহু। শঙ্কর বলেন, জ্ঞানের চরম লক্ষ্য আত্মার বিভুত্ব উপলব্ধি; সেই জ্ঞান লাভ হইলে কর্ম্মের শেষ হইয়া গেল। আর আমাদের আকাঙ্ক্ষিত কিছু রহিল না; জীবনের ছুটাছুটী শেষ হইয়া হইয়া গেল। সুতরাং তখন আর কি কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিবে? শঙ্করমতাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে আজকাল অনেকে কি সেইজন্য নিশ্চেষ্ট?

কাশীর দ্বার পার হইতে না হইতেই সোহং এর যথেষ্ট ঘটা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগকে কোনও লোকহিতকর কার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। জগৎটা সব মায়া কিনা, সেইজন্য তাঁহারা মায়ার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আছেন, পাছে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে মায়া আসিয়া তাঁহাদের ধরিয়া ফেলে। অথচ নিত্য নৈমিত্তিক আহারাদি ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, এবং ভোগ বিলাসেরও ক্রটি নাই। সত্ত্বগুণের সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর দিয়া তমোগুণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে?—শঙ্করাচার্য্য? যিনি কর্ম্মের বিরোধী হইয়াও অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়া যিনি জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন, যিনি নিজে কর্ম্মবীর, তাঁহার যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিলে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে এরূপ জড়তার সম্ভাবনা থাকিত না।

জ্ঞানের চরম কথা আত্মার বিভুত্ব উপলব্ধি। আমি যখন আমার স্বরূপ অবগত হইলাম, যখন জানিলাম যে, আমি জন্মমৃত্যু শোক দুঃখের অতীত, তখন আমার আর নিজের কোনও কর্ম্ম থাকিতে পারে না, ঠিক কথা। জ্ঞানের পর আমার কর্ম্মনাশ, আর কর্ম্ম সঞ্চিত হইতে পারে না; কিন্তু পরের জন্য আমার তখনও কর্ম্ম করিতে হইবে। আপনি যে জ্ঞানলাভ করিয়া জগতকে তুচ্ছ স্বপ্ন

বোধে ত্যাগ করিয়াছি, অপরকেও সে জ্ঞানের অধিকারী করিতে হইবে। আমি জাগিয়া উঠিয়াছি; আর সকলে আমার পার্শ্বে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে; জানি সে কান্না স্বপ্নমাত্র, কিন্তু তাহাদিগকেও জাগাইয়া দিতে হইবে; তাহাদের কষ্ট যে আমার কষ্ট। যাহার যে পথ উপযোগী, তাহাকে সেই পথে লইয়া গিয়া ক্রমে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী করিতে হইবে।

ঐটুকু ভুল বুঝিয়াই আমরা গোলমাল করিতেছি, আর ধর্ম্মের নামে একটা প্রকাণ্ড জড়তার সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছি। পরের প্রাণের বেদনা আমাদের প্রাণে বাজে না, আর্ত্তের ক্রন্দনে আমরা বধির। আমরা সকলে একেবারে বিষমজ্ঞানী হইয়া পড়িয়াছি। সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, পরমহংস সকলেই আপন আপন জপমালা লইয়াই ব্যস্ত; যে সমাজের ভিক্ষান্নে তাঁহাদের শরীর পরিপুষ্ট, সে সমাজের প্রতি যে তাঁহাদের কোনও কর্ত্তব্য থাকিতে পারে একথা তাঁহাদের বড় একটা মনে হয় না। সমাজ দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, রোগক্লিষ্ট, কিন্তু ধ্যানমগ্ন সাধুদিগের গণ্ডীর বাহির হইবার যো নাই—মায়াবিনী রাক্ষসী তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! মায়া কাটাইবার ইচ্ছাও যে মায়া—এ কথা তাঁহারা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসীদের কর্ম্ম করিলে নিরয়গামী হইতে হয়—এই একটা ভীষণ ধারণা আসিয়া জুটিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজপুতানায় একবার দুর্ভিক্ষ হয়। একজন সন্ন্যাসী ক্লিষ্টদিগের সেবার জন্য ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীর এ ব্যবহার একজন ব্রাহ্মণের সহিল না। তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এখন আবার কর্ম্ম করিলে যে আপনাকে নরকগামী হইতে হইবে।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রের বচন ত আর মিথ্যা হইবার নহে; নরকে যাইতে হয় যাইব।" সন্ন্যাসী নরকভয়ে ভীত নহে দেখিয়া ব্রাহ্মণ একটু বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর যথার্থ মনোগত ভাব জানিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মহাশয়! দুর্ভিক্ষপীড়িতের কষ্ট দূর করা কাহার কর্ম্ম?—গৃহস্থের। গৃহস্থ আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া এখন ভোগসুখলিপ্ত, আর্ত্তের কষ্ট দূর করিবে কে? কাজেই আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে। আপনারা আসিয়া এই কাজ করিতে থাকুন, আমরা চলিয়া যাইব। জগতের সেবা করিতে গিয়া যদি নরক ভোগই করিতে হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সবই ত সেই ব্রহ্ম।"

সমস্ত সন্ন্যাসীদের ভিতর যদি এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকিত তাহা হইলে আমাদের সমাজে কখনই এতটা জড়তা থাকিতনা। ধর্ম্মের যাঁহারা রক্ষক, তাঁহাদের

হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হইলে সমাজে ভীষণ ভেদবুদ্ধি আদি আসিয়া পড়ে। সেই ভেদ বুদ্ধির বিষময় ফল আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ হতভাগ্য শূদ্রের দৃষ্টিদোষের ভয়ে অস্থির। উভয়ের এক পথ দিয়া চলিবার উপায় নাই; ব্রাহ্মণ দেখিলে পারিয়াকে রাস্তার ধারে লুকাইতে হইবে। এ হেন দেশে যে সহস্র সহস্র শূদ্র বিজাতীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সমাজ শরীরে শূলস্বরূপ বিদ্ধ হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুচি, বেশ কথা—কিন্তু শুচিবাই যে মহাপাপ। যাহাদের দয়া নাই, তাহাদের আবার ধর্ম্ম কি? যাহাদের সমবেদনা নাই, তাহাদের আবার পবিত্রতা কি? এই শুষ্ক কঠোরতা যে শুধু উচ্চবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে যাহারা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাদের মধ্যেও এই অভিমান কম প্রবল নহে। কাশীর একজন প্রথিতনামা সন্ন্যাসী শূদ্রকে তাঁহার মঠে আসিতে দিতেন না।

এখন উপায়? যে সাপ কামড়াইয়াছে, তাহাকেই বিষ তুলিয়া লইতে হইবে। যাহারা বর্ণাভিমানে স্ফীতবক্ষ, তাহাদেরই বংশধরদিগকে নিম্ন বর্ণের জন্য প্রাণান্ত করিতে হইবে। যাহারা ভোগের সুখশয্যায় শয়ান, তাঁহাদিগকে দরিদ্রের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে।

ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশে আত্মার একত্ব উপলব্ধ হয় নাই, কিন্তু সেই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের নামে এত ভেদবুদ্ধি, আচারের নামে এত অত্যাচার! নিয়মের উপর নিয়ম, বন্ধনের উপর বন্ধন আঁটিয়া আমরা সমাজকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছি; গণ্ডীর এক পা বাহির হইতে না হইতেই একেবারে তুষানল ব্যবস্থা! মানুষ কি একটা যন্ত্র মাত্র?

অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া সকলকেই মুক্তির পথ দেখাইয়া দেওয়া—এই বর্ণ-বিভাগের উদ্দেশ্য? নিম্ন শ্রেণীর উপকারের জন্যই জাতিভেদ, তাহাদের পীড়নের জন্য নহে। সেই উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হইল তাহা হইলে ধিক্ আমাদের ব্রাহ্মণত্ব অভিমানে, ধিক্ আমাদের বেদাধিকারে! যে দিন দেখিব দীন দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট শোকতাপার্ত্ত ভারতবাসীর জন্য দেশের শতসহস্র যুবকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে; যে দিন দেখিব ব্রাহ্মণ ঘৃণিত পদদলিত শূদ্রের সেবা করিয়া আপনার মহত্ব প্রমাণ করিতে উদ্যত সেই দিন বুঝিব বৈদিক ঋষিদিগের সমাধি-লব্ধ একাত্মজ্ঞান সফল হইয়াছে; আর যতদিন তাহা না হইবে জ্ঞান শুধু কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে, ততদিন জানিব আমরা যাহা আজকাল ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেছি তাহা কেবল—পারলৌকিক স্বার্থপরতা।

স্বর্গীয় তাতা ও তাঁহার প্রস্তাব।

স্বদেশবৎসল ৺তাতা মহোদয় ভারতে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি কল্পে মহাত্যাগ স্বীকার ও অসীম উদ্যোগ সহকারে যে সকল কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন তাঁহার জীবদ্দশায় নানা কারণে তাহা সম্পন্ন হয় নাই। যথাসম্ভব পাশ্চাত্য প্রণালীতে বিজ্ঞান গবেষণার নিমিত্ত তিনি যে শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রস্তাবরূপেই বর্ত্তমান। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে বোম্বাই প্রদেশে না হইয়া কলিকাতায় তাতার প্রস্তাবিত কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। যদিও কোন শিক্ষালয় স্থাপিত হয় তথাপি তাহাতে ভারতবাসীগণের শিক্ষাপ্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধীয় নূতন আইন প্রভৃতির দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের যথার্থ শিক্ষা বিস্তারের ইচ্ছা আদৌ নাই। বিলাতে কুপার্স হিল কলেজের যেরূপ অবস্থা ভাবী বিজ্ঞান-গবেষণা শিক্ষালয়ও যে তদ্রূপ হইবে তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষা সম্বন্ধে প্রতিকার একমাত্র স্বাবলম্বন হইতেই সম্ভব। আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা দিতে পারেন এমন লোকের যে নিতান্ত অভাব তাহাও নহে। বিজ্ঞানজগতে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় গভীর গবেষণা দ্বারা ধীরে ধীরে যে সকল অভিনব ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য জগতকে স্তম্ভিত করিতেছেন কয়জন ভারতবাসী তাহার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন?

শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন যাহাতে বাক্যেই পর্য্যবসিত না হয় তজ্জন্য স্বদেশহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের সত্বর সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। আর যখন দিল্লী দরবার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতিতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতে পারে, তখন এ কার্য্যের জন্য যে অর্থের অভাব হইবে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

সময় উপস্থিত উপযুক্ত লোকের ও অভাব নাই। এক্ষণে যদি কতিপয় যথার্থ ভারত সন্তান অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার দ্বারা ভারতে বিজ্ঞান চর্চ্চার নিমিত্ত পাশ্চাত্য প্রণালিতে একটি গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগ্য বিজ্ঞানবিদের হস্তে শিক্ষার সম্পূর্ণ ভারার্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে ৫।৬ বৎসর মধ্যেই ফলভোগে সক্ষম হইবেন ও সহস্র ভারতবাসীর মহৎ কল্যাণসাধন করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জগদীশ বাবু নিজ অধীনে কয়েকটী শিক্ষার্থী রাখিয়া তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচন করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট সহস্র ক্রন্দন করিয়াও কোন ফল লাভের আশা নাই। একটি পার্শি কবিতা আছে . . .

উর্ফি আগর বগিরিয়ে মায়সর শুদে বসাল
সদ্‌সাল মেতয়াঁ বতমন্না গিরীস্তন্‌।

অর্থাৎ, হে উর্ফি! যদি কাঁদিলে অভীষ্ট লাভ হইত, তবে আমি অতীব আনন্দের সহিত শত বর্ষ ধরিয়া কাঁদিতাম।

"বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বীর্য্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন তাহা পুনর্ব্বার সঞ্চারের জন্য।" চিরকাল প্রকৃতিকে ফাঁকি দেওয়া চলে না এ কথা যেন আমাদের দেশের অগ্রণীগণের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

রাগিণী—ভৈরবী তাল—আড়াঠেকা।

বড় সাধ হয় মা মনে।
আঁখি মুদে হেরি তোমায় হৃদি-শ্মশানে ॥
মানসেতে পুষ্পচয়ন, মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন,
প্রেম-বারি রেখে গোপন দিব চরণে
জ্ঞানাগ্নিরে জ্বালাইব, অভিমান আহুতি দিব,
বিবেক অসিতে ছেদিব রিপু ছ'জনে ॥
লক্ষ্মী গেলে অন্তর্জলে, তুমি দাঁড়াইবে কূলে,
প্রাণ যাবে 'জয় কালী' বলে, হেরে নয়নে ॥

উপরোক্ত গানটী শয্যাগত অবস্থায় আমার একজন বন্ধু রচনা করেন। রচনার কয়েক দিন পরে (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল) জাহ্নবীতীরে জনৈক আত্মীয় গায়কের মুখে গানটী শুনিতে শুনিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি একজন সংসারী, সকল কার্য্যেই তাঁহার সুবন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া একমাত্র ইষ্ট দেবের মহিমা। এরূপ মৃত্যু ঘটনা শুনিলে মৃত্যুভয় দূর হয়। সেই নিমিত্তই ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমার স্বর্গগত বন্ধু সংসারে বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন না, কিন্তু এ পরীক্ষা-স্থলে তিনি গুরুকৃপায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমার বন্ধু বাগবাজার নিবাসী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

দ্বারকাপুরী

(শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিক।)

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট বা আনর্ত্তদেশে আরবসাগরের উপকূলে এই দ্বারকা বা দ্বারাবতীপুরী অবস্থিত। হিন্দু সাধুসন্ন্যাসী মুখে ভারতবর্ষে শ্রীভগবানের যে প্রসিদ্ধ চারিধামের কথা শুনা যায়, যে চারিধাম দর্শন করিয়া আজও পর্য্যন্ত সাধু সন্ন্যাসিগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন এবং উক্ত ধাম সমুদায়ের পবিত্রতা বিধান করেন, যে চারিধামে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিলে আজ পর্য্যন্তও ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়গণ আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, যে চারি ধাম দর্শন করা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্তিপরায়ণ হিন্দুগণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, সেই চারি ধামের মধ্যে এই দ্বারকাধাম দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান ছিল। এ কারণ এবং দ্বাপর তৃতীয় যুগ, এ জন্য ইহা ধাম সংখ্যায় গণনায় তৃতীয় বলিয়া উক্ত হয়। বিশেষতঃ শাস্ত্রে অযোধ্যা মথুরা মায়া প্রভৃতি যে সপ্ত মোক্ষক্ষেত্রের কথা লিখিত আছে, এই দ্বারাবতীপুরী তাহার অন্যতম, এ কারণ হিন্দুদিগের ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

মহাভারত, হরিবংশ ও ভাগবতে লেখা আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংশকে বধ করিয়া যখন মথুরায় অবস্থান করেন, সে সময় কংশের শ্বশুর জরাসন্ধ এই নগর অবরোধ পূর্ব্বক যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করেন। শেষ যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগর পর্ব্বত পরিখাদির দ্বারায় সুরক্ষিত নয় এ কারণ যুদ্ধে নিজ সৈন্য ও পুরীর বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া, বলরাম সমভিব্যাহারে পশ্চিমসাগরের উপকূলে আধুনিক পর্টুগিজ গোয়া ও হুনাবর বন্দরের নিকট গোমন্ত পর্ব্বতে গিয়া তথায় জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করেন। এইস্থানে জরাসন্ধের প্রভূত সৈন্য বিনাশপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করিয়া নিজ বাহন গরুড়কে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে কোন সুদৃঢ় বাসস্থান অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিয়া নিজে বলরাম সমভিব্যাহারে মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণবাহন গরুড় রৈবতক (গিরনার) পর্ব্বতের নিকট প্রাচীন কুশস্থলী নগর পর্ব্বত ও সমুদ্রের দ্বারা সুরক্ষিত দেখিয়া এইস্থান শ্রীভগবানের বাসার্থ মনোনীত করিয়া, মথুরায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ইহা নিবেদন করেন। পুনরায় যখন জরাসন্ধ কালযবনের সাহায্যে মথুরা অবরোধ করেন, তখন শ্রীভগ-

বান্ রাজা উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণকে মথুরা ত্যাগ করিয়া কুশস্থলী বা দ্বারকায় যাইতে অনুমতি দিয়া, নিজে কালযবনকে বিনাশপূর্ব্বক এই দ্বারকায় আগমন করেন। এখানে তিনি শিল্পী ও স্থপতি সমুদয় একত্র করিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মাকে এই পুরী নির্ম্মাণে আদেশ করিলে, তিনি স্থানের অল্পতার বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ জলনিধি সমুদ্রের নিকট স্থান প্রার্থনা করিলে সমুদ্র তাঁহাকে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত স্থান জল অপসারিত করিয়া পুরী নির্ম্মাণার্থ প্রদান করেন। বিশ্বকর্ম্মা, শুদ্ধাক্ষা, ঐন্দ্র, ভল্লাট ও পুষ্পদন্ত এই চারি দেবতাযুক্ত চতুর্দ্বারসমন্বিত, পরিখা ও তোরণ সমন্বিত চারিটী প্রশস্ত রাজপথ, দুর্গপ্রাকার, ক্রিয়াস্থান, উপবন, দেবস্থান ও মহাবীরদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহল পরিশোভিত অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় এই দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই পুরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ হইতে সুধর্ম্মা নামক দেবসভা আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করিয়া নিজে যাদবগণের সহিত বসবাস করেন। এই পুরী অবরোধ করিতে আসিয়া সৌভপতি শাল্ব ও পৌণ্ড্রুরাজ বাসুদেব শ্রীভগবানের হস্তে নিহত হয়। প্রভাস তীরে মৌষল যুদ্ধে সমুদয় যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরাম দেহ ত্যাগ করিলে অর্জ্জুন হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় আসিয়া যাদব রমণীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র, অনিরুদ্ধকুমার ব্রজকে লইয়া হস্তিনাপুর প্রত্যাগমন অভিলাষে দ্বারাবতী ত্যাগ করিবামাত্র উক্ত পুরীর প্রায় সমুদয় অংশ সমুদ্র গ্রাস করে। এখন সেই চারি দ্বারের একটী মাত্র দ্বার পুরাতন চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে রণত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন, এ কারণ এতদঞ্চলবাসিগণ শ্রীভগবান্কে রণছোড়জী নামে অভিহিত করেন। অধুনা দ্বারকা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ বরদারাজ্যের এলাকাভুক্ত।

দ্বারকা আসিতে হইলে বম্বে বরদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান্ রেলের ওয়াড ওয়ান জংশনে গাড়ী বদল করিয়া জুনাগড় পোরবন্দর রেলযোগে পোরবন্দরে নামিতে হয়। পোরবন্দর বা সুদামাপুরী হইতে ১৫।১৬ ক্রোশ উত্তরে দ্বারকাপুরী অবস্থিত। পোরবন্দর হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, এই রাস্তায় গরুর গাড়ী করিয়া দ্বারকায় আসিলে যাত্রীদের আর সমুদ্র ভ্রমণের কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। যাঁহারা সমুদ্র পথে যাইতে ভয় না করেন, তাঁহারা বম্বে, করাচি বা কাটিবারের অপর যে কোন বন্দর হইতে ষ্টীমারযোগে একেবারে দ্বারকায় যাইতে পারেন। তবে রেল অপেক্ষা ষ্টীমার ভাড়া অনেক কম। কিন্তু দ্বারকা

প্রভৃতি কোন স্থানে জেটী না থাকায় জাহাজ হইতে নৌকায় নাবা ও পুনরায় সেই নৌকা করিয়া তীরে অবতীর্ণ হওয়া বড়ই বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য।

আমি করাচি বন্দর হইতে শেফার্ড (Shepherd) কোম্পানীর ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া প্রায় ৪৮ ঘণ্টা বাদে বৈকাল ৪।৫টার সময় দ্বারকা পুরী হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌছিলাম। এই স্থানে জাহাজ বন্ধ করায় উপকূল হইতে ২।৩ খানি নৌকা জাহাজের নিকট আসিলে আমরা তাহাতে অবতীর্ণ হইলাম। এই নৌকাগুলি বেশ বড় বড়; উহারা একমাত্র পালের সাহায্যে যাতায়াত করে। বাতাস না থাকায় এই নৌকা কিনারায় দ্বারকার আলোকস্তম্ভের (Light-house) কাছে আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা রাত্র হইয়া গেল। উক্ত নৌকা কিনারা পর্য্যন্ত না আসায় পুনরায় ছোট ডিঙ্গী করিয়া আমাদিগকে কিনারায় নামাইয়া দিল। এই জাহাজ কোম্পানীর (Shepherd Co.) সত্বাধিকারী একজন কাটীবারদেশীয় মুসলমান, নাম হাজী কাসেম। ইঁহার বড় বড় অনেকগুলি সমুদ্রগমনোপযোগী ষ্টীমার আছে; কতকগুলি করাচি হইতে কাটিবার উপকূলবর্ত্তী বন্দর হইয়া বম্বে গমনাগমন করে, আর কতকগুলি করাচি হইতে পারস্য উপসাগরের বন্দর সমূহে যাতায়াত করে। পাশ্চাত্য জাহাজ কোম্পানীর ন্যায় এই দেশীয় কোম্পানীর জাহাজগুলিতেও সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত আছে। দুঃখের বিষয়, এই একটী ভিন্ন আমাদিগের দেশে আর কোন দেশীয় জাহাজ কোম্পানী নাই; আরও দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনবান্ ব্যক্তিদিগের এদিকে বড় একটা লক্ষ্য নাই। আমাদের দেশের বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে নিজেদের জাহাজ চাই, বিশেষতঃ বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষে যে ইহা একান্ত আবশ্যক, তাহা ভুক্তভোগিগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন। আমাদের দেশের অনেকেই এখন অর্থোপার্জ্জন বা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন ও বসবাস করিতেছেন; কিন্তু ঐ সকল স্থানে আমাদের যাওয়া আসা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য জাহাজ কোম্পানীর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি কোন কারণ বশতঃ ঐ সকল পাশ্চাত্য জাহাজ কোম্পানী ভারতবাসীর পক্ষে তাহাদের জাহাজে যাওয়া নিষেধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদের দেশীয় ঐ সকল প্রবাসী ব্যক্তিদিগের যে কি ভয়ানক অবস্থা হইবে এবং কি উপায়েই বা তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়।

আমি জাহাজ হইতে কিনারায় নামিয়া ধরমশালায় রাত্রের জন্য বাসা লই-

লাম ; আমার সহিত পাঞ্জাবের উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত একটী সাধুও এই ধরম্‌শালায় রহিলেন ; ইঁহার সহিত পূর্ব্বে জাহাজেই আলাপ হইয়াছিল। ধরমশালায় আসা মাত্র আমার পাণ্ডা ঠিক হইয়া গেল এবং পাণ্ডার সহিত আমি রাত্রেই রণছোড়জীর আরতি দেখিয়া আসিয়া রাত্রের মতন শয়ন করিলাম। পরদিন প্রাতে পাণ্ডা আসিলে আমি তাহার সহিত প্রথম গোমতী গঙ্গার চক্রতীর্থে গমন করিলাম। এখানে গোমতীর খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে, ইহাকেই চক্রতীর্থ বলে। পাণ্ডারা বলেন, প্রভাসে মৌষল যুদ্ধের পূর্ব্বাহ্ণে, দ্বারকায় ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল হইতে আরম্ভ হইলে শ্রীভগবানের হস্তস্থিত সুদর্শন চক্র এইস্থানের জলমধ্যে ভগবানের হাত হইতে তিরোহিত হয়। কিন্তু মহাভারতে মৌষল পর্ব্বে দেখা যায়, শ্রীভগবানের হস্তস্থিত চক্র আকাশমার্গে অন্তর্হিত হয়। সে যাহা হউক সেই জন্য এই স্থানের নাম চক্রতীর্থ হইয়াছে। দ্বারকাপুরী মধ্যে এই চক্রতীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে গোমতী সাগরসঙ্গম অতি নিকট। এই চক্রতীর্থে স্নান করিতে যাত্রীদের দুই টাকা হিসাবে কর লাগে। পার্শ্বেই বরদা রাজের কাছারী ঘর আছে, আমি এইস্থানে কর্ম্মচারীর নিকট উক্ত কর জমা দিয়া গোমতীর পূজা করিয়া চক্রতীর্থে স্নান করিতে নামিলাম। স্নান করিবার জন্য বেশ বাঁধা ঘাট আছে।

স্নানান্তে এই স্থানে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হইল। এখানকার কার্য্যসমাধা করিয়া আমি রণছোড়জীর মন্দিরে গমন করিলাম। একটী সিঁড়ি দিয়া উচ্চ সমতল প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। প্রাঙ্গনটী খুব প্রশস্ত এবং ইহাতে দুটী ছোট ছোট মন্দির আছে। এই প্রাঙ্গন হইতে পুনরায় আর কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া প্রধান মন্দিরে উঠিলাম। এই প্রধান মন্দির খুব কারুকার্য্য খচিত এবং বেশ প্রশস্ত ; ভিতরে শ্রীভগবানের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজমূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় বেদীর উপর বিরাজিত। মূর্ত্তি বেশ বড় ও অলঙ্কারাদির দ্বারায় শোভিত, পার্শ্বে রুক্মিণী প্রভৃতি দেবীর মূর্ত্তি আছে। আমি শ্রীভগবানের পূজা দিয়া তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম।

এই মূর্ত্তি নবপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রায় ২০০ শত বৎসর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এস্থানে পূর্ব্বে রণছোড়জীর মূর্ত্তি ছিল, তাহা এখন বেট বা বেটদ্বারকায় আছে। এই প্রধান মন্দির শিখর সমেত উচ্চে প্রায় এক শত হাত, একারণ ইহা প্রায় ৮।১০ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এত বড় উচ্চ মন্দির পশ্চিম ভারতে আর কোথাও নাই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ধর্ম্মসম্প্রদায়গণ

প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রক্ষা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন হেতু, প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সমুদয়ে, বিশেষতঃ চারিধামে মঠ নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এ কারণ দ্বারকায় যে সারদা নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা এই মন্দির সংলগ্ন একটি মহলে অবস্থিত। এখানে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের গদি আছে, এই গদির পূজা ও ভোগ রাগ হইয়া থাকে। এই মঠের কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। মঠের আধুনিক মোহান্ত বেশ সৌম্যমূর্ত্তি প্রবীণ পুরুষ। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দিরে যেমন আজ কাল শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের উক্ত স্থানস্থিত মঠের, সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব, সেইরূপ দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মঠের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব রহিয়াছে কিন্তু এখানকার পাণ্ডারা, মন্দিরের পূজারী প্রভৃতি এবং স্থানীয় লোক প্রায় সকলেই বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

মন্দিরের বাহিরে, নিকটেই প্রাচীন সহরের গড় দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বারকা সহরটী বেশ বড়, সকল দ্রব্যের দোকান পাট দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পানীয় জলের বড়ই কষ্ট। এখানকার কূপ সমুদয়ের জল লোনা বলিয়া, প্রায় ২।৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে গোরুর গাড়ী করিয়া জল আনাইয়া কয়েক জন সদাশয় ব্যক্তি সহরের স্থানে স্থানে জলসত্র খুলিয়া সাধারণের ও যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সহরের বিভিন্ন স্থানে ও আশে পাশে অনেক দেব দেবীর মন্দির; ভারতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মঠ, যাত্রীদের জন্য অনেক গুলি ধরমশালা ও সমুদ্রোপকূলে আলোকস্তম্ভের নিকট কয়েকটী সাহেবদের বাঙ্গালা আছে। সহর হইতে একটু দূরে নৃগকূপ নামক একটী জঙ্গলপূর্ণ গর্ত্ত আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই কূপে রাজা নৃগ ব্রহ্মশাপে কৃকলাস হইয়া বাস করিতেন। যাদবগণ একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে উঁহাকে দেখিতে পাইয়া কূপ হইতে তুলিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণকে একথা নিবেদন করিলে তিনি উক্ত কৃকলাসরূপী নৃগরাজকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। রাজাও শাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। সহরের প্রান্তভাগে গোমতী গঙ্গা আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে; এই স্থানকে গোমতী সাগরসঙ্গমতীর্থ বলে। এখানেও স্নানাদি ও শ্রাদ্ধ কার্য্য করিতে হয়। নিকটে গোপ্রচারাদি তীর্থ সকলও আছে।

আমি এই সকল স্থান পাণ্ডার সাহায্যে দর্শন করিয়া তৃতীয় দিবস অতি প্রত্যুষে এখান হইতে বেট যাইবার জন্য রামড়া পর্য্যন্ত গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া

যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে সেই পূর্ব্বপরিচিত পাঞ্জাবী সাধুটীও চলিলেন। দ্বারকা হইতে রামড়া প্রায় ৭।৮ ক্রোশ। সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় বেশ পথ। পথে ২।৩ টা গ্রাম পাওয়া যায়। আমরা বেলা ১০ টার সময় রামড়া আসিয়া পৌছিলাম। রামড়া কচ্ছ উপসাগরের মোহানার নিকট অবস্থিত। এই স্থানে সাধুদের জন্য একটী সদাব্রত আছে। যে সকল যাত্রী দ্বারকার তপ্ত ছাপ লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই স্থানেই ছাপ লইয়া থাকেন। যাত্রীরা ৵০ পয়সা দিলে লৌহের শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের ছাপ ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া যাত্রীদের বাহুমূলে লাগাইয়া দেয়। আমরা যে সময় রামড়া আসিয়া পৌছিয়াছিলাম, তখন এই কচ্ছ উপসাগরে ভাঁটা থাকায়, বেট যাইবার নৌকা পাইলাম না। প্রায় ২।১ ঘণ্টা পরে জোয়ার আরম্ভ হইয়া, জোয়ারের জল একটু বৃদ্ধি হইলে, আমরা একখানি নৌকা করিয়া বেট যাত্রা করিলাম। কারণ, এই স্থানে জলে অনেক চর থাকায়, জোয়ার ভিন্ন বেটে যাওয়া যায় না। এই উপকূল হইতে বেট দ্বীপ প্রায় দুই ক্রোশ হইবে।

আমরা বৈকাল ৩টার সময় বেটে পৌছিয়া এই স্থানে একটী ধরমশালায় আশ্রয় লইলাম। পরে এখানে পুনরায় বেটের আলাহিদা পাণ্ডা ঠিক করিয়া তাহার সহিত রণছোড়জীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে উক্ত মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরটী খুব উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত ও বেশ প্রশস্ত, তিন চারি মহলে বিভক্ত, উপরে শিখরাদি কিছুই নাই। প্রথম মহলে বরদা রাজের দপ্তর খানা আছে, এখানে যাত্রীদের নিকট হইতে রণছোড়জী ভগবানের দর্শনার্থ ২৲ দুই টাকা হিসাবে কর আদায় করা হয়। এ মন্দিরের সমুদয় বন্দোবস্তের ভার উক্ত রাজ দরবারের অধীন। যদিচ বরদারাজ সাধু সন্ন্যাসীদের নিকট এখানে ও দ্বারকা পুরীতে কোন রূপ কর গ্রহণ করেন না; কিন্তু গৃহস্থ যাত্রীদিগের নিকট কর না পাইলে, দেব দর্শন করিতে দেন না। বরদা রাজ সরকার যদিচ মন্দিরের ব্যয়াদি নির্ব্বাহের জন্যই যাত্রীদের নিকট হইতে এই কর আদায় করেন; তত্রাচ হিন্দু রাজা হইয়া দেব দর্শনার্থ যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায় করা আমার মনে ভাল বলিয়া বোধ হইল না। বিশেষতঃ ভারতের অপর কোন স্থানে আর কোন হিন্দু নরপতিকে এরূপ ভাবে কর আদায় করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। আমি উক্ত স্থানে ২৲ টাকা কর জমা দিয়া মন্দিরের ভিতরে আর একটী মহলে প্রবেশ করিলাম। এটী রুক্মিণীর মহল, এখানে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান্ রণছোড়জীর মূর্ত্তি, রুক্মিণী দেবীর সহিত একত্রে অবস্থিত। ইহাই ভগবান্ রণছোড়জীর

আসল মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি পূর্ব্বে দ্বারকা পুরীস্থ মন্দিরে ছিল, পরে মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে উক্ত স্থান হইতে এই মূর্ত্তিকে আনিয়া এই বেটে লুক্কায়িত ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমরা এখানে ভগবানের সন্ধ্যা আরতি দেখিয়া, সত্যভামার মহল দর্শন করিতে গমন করিলাম। এমহলে ভগবান্ রণছোড়জীর ও সত্যভামার মূর্ত্তি আছে। এই রূপ জাম্ববতীর ও অপরাপর মহল দর্শন করিয়া ধরমশালায় ফিরিয়া আসিলাম। বেট দ্বারকায়ও ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনেক মঠ মন্দির আছে এবং এই সহরটিও নিতান্ত মন্দ নয়।

আমরা এই সমুদয় দেখিয়া রাত্রের জোয়ারে নৌকাযোগে এস্থান ত্যাগ করিয়া প্রায় ২ক্রোশ দূরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত কচ্ছ উপসাগর উপকূলে গোপী তলাওয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার উপকূলে রণ (Runn of Cutch) হইতে সংগৃহীত লবণ স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে এবং উহার তত্ত্বাবধারণের জন্য পাহারার বন্দোবস্ত আছে। এখানে যাত্রীদের জন্য একটী ধরমশালাও দেখিলাম। এখান হইতে আমরা পুনরায় গোরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া ১ মাইল আসিয়া গোপীতলাও পৌঁছিলাম।

পুষ্করিণীটী নিতান্ত ছোট নয়, প্রায় ১০।১২ বিঘা জলকর হইবে ; তিন দিকে পাথরের ঘাট বা সিঁড়ি দিয়া বাঁধান। পুকুরের পাড়ে অনেকগুলি দেবমন্দির বা মঠ আছে, তন্মধ্যে শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরই প্রসিদ্ধ। এই পুষ্করিণীর মাটীকেই গোপী চন্দন বলে। ইহার বর্ণ পীতাভ শ্বেত, অনেক বৈষ্ণব এই মৃত্তিকায় তিলক সেবা করে। আমরাও এই মাটী বা গোপী চন্দন, পুকুরের জলমধ্য হইতে ও পাড় হইতে কিছু কিছু সঙ্গে লইলাম এবং এখান হইতে পুনরায় উক্ত গরুর গাড়ী করিয়া দ্বারকাপুরীর দিকে যাত্রা করিলাম। গোপীতলাও হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ আসিয়া এই পথের বামপার্শ্বে নাগেশ নামক মহাদেবের মন্দির দেখিতে পাইলাম। আমরা এই স্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া নাগেশ মহাদেব দেখিতে যাইলাম। একটী চতুষ্পার্শ্ব পাথরে বাঁধান কুণ্ডের পার্শ্বে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী নিতান্ত মন্দ নয়, তবে বিশেষ কিছু জাঁক জমক নাই, নিকটেও কোন বড় গ্রাম বা বস্তি নাই। মন্দিরের মধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত, বাহিরে পাথরের ষাঁড় বা নন্দী আছে। আমরা এই কুণ্ড হইতে জল লইয়া মহাদেবের পূজা করিলাম। নাগেশ মহাদেব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একতম যথা "নাগেশম্ দারুকবনে" একারণ ইহার নাম ভারতের সর্ব্বস্থানেই শুনিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে নাগেশ্বর মহাদেব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, দারুকা নাম্নী পার্ব্বতীর বরে বরদর্পিতা কোন রাক্ষসী ছিল। তাহার স্বামীর নাম দারুক, দারুকও অতিশয় বলশালী ছিল। বহুতর রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া দারুক যজ্ঞধ্বংস ও ধর্ম্মধ্বংস করত লোক সমূহের মহাপীড়ন করিতে লাগিল। পশ্চিম সাগরের সমীপে দারুকের সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন বন ছিল। দারুক সেইস্থানে থাকিয়া সকল লোকের ভীতি উৎপাদন করিত। একদা রাক্ষসগণ লোক-পীড়ার্থ নির্গত হইয়া, জলমার্গ রোধ পূর্ব্বক আরোহিপূর্ণ বহু নৌকা ধৃত করিল, এবং নৌকারোহী সমস্ত মনুষ্যকে ধরিয়া নিজ নগরে লইয়া গেল। সেই ধৃত মনুষ্যেরা দারুক বনে দুঃখে অবস্থান করিতে লাগিল। তন্মধ্যে সুপ্রিয় নামে একজন শিবভক্ত বৈশ্য ছিলেন। তিনি কারাগারে অবস্থান করিয়াও প্রত্যহ ধ্যান পূর্ব্বক মানস উপচারে শিব পূজা করিতে লাগিলেন, ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ তৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। এইরূপে ছয় মাস অতীত হইল। একদা সুপ্রিয় বৈশ্যের সম্মুখে শঙ্করের সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া রাক্ষসগণ দারুকের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে নিবেদন করিল। রাক্ষসরাজ তখন সুপ্রিয় ও তাহার সহিত একত্রে ধৃত অপরাপর লোক সকলকে বধ করিবার জন্য রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিল। সুপ্রিয় রাক্ষসদিগকে তাহাদিগের প্রাণবধার্থে আগত দেখিয়া ভয়-চকিতনেত্রে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে দেবেশ শঙ্কর! রক্ষা কর, রক্ষা কর, আপনি আমার সর্ব্বস্ব। তখন শিব এইরূপ প্রার্থিত হইয়া সুন্দর চতুর্দ্বার-যুক্ত মন্দিরের সহিত ভূমিচ্ছিদ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উক্ত মন্দিরের মধ্যে মহাদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় শিবরূপ, সঙ্গে পরিবারবর্গ; বৈশ্য তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পূজা করিলেন। শিব পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং রাক্ষসগণকে বধ করিলেন। জ্যোতিপতি নাগেশ্বর দেব এইরূপে আবির্ভূত হন।

আমরা এই মহাদেব দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার গোরুর গাড়ি চড়িয়া পথিমধ্যে একটী উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমি (এই স্থানে অনেক গুলি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়) অতিক্রম পূর্ব্বক প্রায় বেলা ১টার সময় দ্বারকাপুরী আসিয়া পৌঁছিলাম। গোপীতলাও হইতে দ্বারকা প্রায় ৮।৯ ক্রোশ পথ। আমি দ্বারকা-পুরীস্থ পূর্ব্বোক্ত ধরম শালায় আহারাদি করিয়া আমার সঙ্গী সেই পাঞ্জাবী সাধুটীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, ঐ দিবসই পূর্ব্বের ন্যায় নৌকার সাহায্যে ষ্টিমারে চড়িয়া পোরবন্দর বা সুদামাপুরী যাত্রা করিলাম।

স্বামীজির পত্র।

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

(১)

বাল্টিমোর, আমেরিকা।

২২শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

প্রেমাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাঠে সকল সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার ঘোষের এক পত্র লণ্ডন নগর হইতে অদ্য পাইলাম, তাহাতে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইলাম।

*　*　*　*　*

ভারতবর্ষের মিটিং ও এড্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য এদেশের জন্য নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য। এক্ষণে তোমরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পাইলে—Strike the iron while it is hot. মহাশক্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কর ও মহা বলে লাগিয়া যাও। বাকী প্রভু সব পথ দেখাইয়া দিবেন। মহাবন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। Work, work, work এই মূল মন্ত্র। আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। এ দেশে কার্য্যের বিরাম নাই—সমস্ত দেশ দাব্ড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে তাঁর তেজের বীজ পড়্বে, সেইখানেই ফল ফল্বে—অদ্য বা শতাব্দান্তে বা। সকলের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তবে আশু ফল হইবে।

*　*　*　*　*

* এক পত্র লিখিয়াছেন; তোমাদের দ্বারা যদি তাঁহার কোন সহায়তা হয় করিও। জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, আপনাদের নাম বাজান উদ্দেশ্য নহে।

*　*　*　*　*

* * * পালিভাষা শিক্ষা এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন আবশ্যক, অনর্থক ভ্রমণে কি ফল? * * * তাঁহার যাহারা শরণাগত, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ

পদতলে, মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ হইতে হইবে ; এইটী যদি পার, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।

* * * মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করিবে। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে প্রায় হরিসভা আছে ; ঐ গুলিকে ধীরে ধীরে লইতে হইবে।

বিবেকানন্দ।

(২)

প্রাণাধিকেষু—

* * * * *

* * এক সুদীর্ঘ পত্রে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার হিন্দু ধর্ম্মে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। আমাকে প্রতিষ্ঠা হইতে সাবধান হইবার জন্য অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার গুরুর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা লিখিয়াছেন। গুরুর প্রণীত এক পুস্তক পাঠাইয়াছেন, উক্ত পুস্তকে সপ্ততত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা যে, এতদ্দেশ হইতে উক্ত পুস্তক ছাপাইবার সাহায্য হয়। তাহার ত কোনও উপায় দেখি না ; কারণ, ইহারা বাঙ্গালা ভাষা ত মোটেই জানে না, তাহার উপর হিন্দু ধর্ম্মের সহায়তা ক্রিশ্চিয়ানেরা কেন করিবে ? ইনি এক্ষণে সহজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মধ্যে তিনি ও তাঁহার গুরু। এই দুই জন ছাড়া পৃথিবীতে আর কাহারও ধর্ম্ম হইতে পারেই না, কারণ, তাহাদের ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং উক্ত দুই জনের কেবল উচ্চ দিকে উঠিয়াছে। এই প্রকারে ইনি এক্ষণে সনাতন ধর্ম্মের যে আসল সার তাহা খিঁচিয়া লইয়াছেন। ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে দাদা ? জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ, সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুৎ মার্গ, আমায় ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান্! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই, এখন কেবল ভাতের হাঁড়িতে। পূর্ব্বে মহতের লক্ষণ ছিল, ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ ; এখন হচ্চে আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া ধর হামারা পায়েরকা নীচে।

আর এক মহাপুরুষ হুজ্জুক সাঙ্গ করে দেশে ফিরে যেতে লিখ্‌চেন। তাকে বল, কুকুরের মত কারুর পা চাটা আমার স্বভাব নয়, কার ঘরে ফিরে যাব? এদেশ আমার more ঘর—হিন্দুস্থানে কি আছে ? কে ধর্ম্মের আদর করে ?

কে বিশ্বের আদর করে? ঘরে ফিরে এস!!! ঘর কোথা? আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ' এই আমার ধর্ম্ম। অলস, নিষ্ঠুর, নিৰ্দ্দয়, স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত আমি কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। যার ভাগ্যে থাকে, সেই মহাকার্য্যের সহায়তা করিতে পারে। সাবধান সাবধান। এ সকল কি ছেলে খেলা স্বপন দেখা না কি? সাবধান! * * *

* * * * সকলকে আমার ভালবাসা দিবে, সকলের help আমি চাই। Neither money pays nor name nor fame nor learning, it is character that can cleave through adamantine walls of difficulties—মনে রেখো। জায়গায় জায়গায় এক একটা centre করিতে হইবে। যেখানে পাঁচ জন লোক তাঁহাকে মানে সেখানেই এক ডেরা; এম্নি করে চল এবং সৰ্ব্বদা সকল জায়গার সঙ্গেই communication রাখিতে হইবে। কিমধিকমিতি।

বিবেকানন্দ।

দস্যুগৃহে।

(ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন হইতে)

ষ্টাইরিয়া প্রদেশস্থ গ্র্যাজ নামক সহরটা বিয়েনা ও ট্রিষ্টি রেল লাইনের মধ্যবর্ত্তী দেখিয়া আমরা তথায় অবতরণ পূর্ব্বক দুই চার দিবস যাপন করিবার ইচ্ছা করিলাম। গ্র্যাজ সহরে পঁহুছিতে বড় অল্প বিলম্ব ঘটে নাই; শনিবার বেলা আন্দাজ সাড়ে পাঁচটার সময় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া "হাতী হোটেলের" উপযুক্ত যাত্রিরূপে গ্র্যাজে উপনীত হইলাম। "হাতী হোটেল" শুধু গ্র্যাজ নয়, ষ্টাইরিয়া প্রদেশস্থ সমস্ত হোটেল গুলির শীর্ষস্থানীয়।

ষ্টেশনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। দলে দলে কতকগুলি বলিষ্ঠ যুবক যুবতী ট্রেন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত নিৰ্ব্বিরোধী অন্যান্য যাত্রিগণকে ইতস্ততঃ ধাক্কা দিয়া বেগে চলিয়া গেল। যতক্ষণ না এই দুর্দ্দমনীয় বাহিনী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া গেল, ততক্ষণ ষ্টেশন কর্ম্মচারিগণ চোকে কাণে দেখিতে বা শুনিতে পান

নাই। বাহিরে আসিয়া দেখি, একখানিও গাড়ী নাই। দূরে বুকে হাঁটিয়া আসার মত জীবন্মৃত অশ্বযুক্ত একথানি অতি ক্ষুদ্র ক্যাব আসিতেছিল বলিয়া বোধ হইল। যাহাই হউক আমরা উহারই সাদর সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলাম।

পোর্টম্যান্টু ব্যাগ প্রভৃতি গাড়ী মধ্যে আপনি স্থাপিত করিয়া "হাতী হোটেল" যাইতে আজ্ঞা করিলাম। হোটেলে স্থানাভাব জানাইয়া শকটচালক ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এর কারণ কি? আমি জানিতাম, গ্র্যাজ একটী শান্তিময় স্থান। তদুত্তরে জানিলাম, আমার ধারণা সত্য বটে তবে পরদিবসে তথায় এক বাৎসরিক গীতবাদ্যোৎসব উপলক্ষে অষ্ট্রীয়া প্রদেশের বহু গায়ক গায়িকা আসিয়া প্রায় সপ্তাহ কালাবধি সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

নিরুপায় দেখিয়া "হাতী হোটেল" ছাড়া প্রায় সমস্ত হোটেলে শকটচালক স্থান প্রার্থনা করিয়া জানাইল যে, কোথাও আমাদের স্থান মিলিবে না। অভাবে আমরা সেই শকটথানি সেই রাত্রির জন্য ভাড়া লইতে প্রস্তুত হইলাম ও শকট-চালককে "হাতী হোটেলের" দ্বারদেশে শকটথানিকে স্থাপিত করিতে বলিলাম। কেননা সেখানে স্থান না মিলিলেও আহারোপযোগী প্রচুর সুখাদ্য ও পেয় মিলিবে। কোন মতেই শকটচালক এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না; সে তাহার গাড়ীখানি ভাড়া দিবে না বা হাতী হোটেলের সম্মুখে কিছুতেই সমস্ত রাত্রি গাড়ীখানি বাহিরে রাখিবে না।

কি করা যায়, এই পরামর্শ চলিতেছিল, শকটচালকের উপর আমাদের এ যাবৎ কোনও সন্দেহ ছিল না। এমন সময় যেন কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে সে জানাইল যে, প্রায় এক মাইল দূরে তাহার বন্ধুর একটী ছোট হোটেল আছে। আমাদের পক্ষে সেটী উপযুক্ত স্থান না হইলেও ইচ্ছা করিলে আমরা সেখানে অদ্য রজনী অতিবাহিত করিতে পারি। নাই মামার চেয়ে কাণা মামাই ভাল। আমরা তাহার কথায় কোনও প্রতিবাদ না করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ তথায় যাইতে আজ্ঞা করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে যখন আমরা যাহা কিছু সজীব পশ্চাতে রাখিয়া, লোকলোচনের বহির্ভাগে আসিলাম, তখন কিঞ্চিৎ ভীতিবিকলচিত্তে আমি শকটচালককে তাহার গতিরোধ করিতে বলিলাম। সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া জানাইল যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা গন্তব্য স্থানে পহুছিব। বলিতে না বলিতে সে একটা লম্বা অথচ সরু কাষ্ঠভবনের দ্বারে উপস্থিত হইয়া একটী নূতন রকম হুইসিল্ দিল।

যেন আমরা সেখানে ঠিক অতিথি হইব, এইভাবে প্রস্তুত হইয়া একটী নর-দানব আলোক হস্তে বাহিরে আসিয়া দরজার একপার্শ্ব হইতে শকটচালকের সহিত এক নূতন অবোধ্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। আমি অস্থির হইয়া স্থান পাইব কিনা জিজ্ঞাসা করায়, সে তাহার সুনিশ্চয়ত্ব জ্ঞাপন করিল।

আমরা তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া, যথারীতি অত্যধিক ভাড়া দিয়া, নিশ্চিন্ত হইতে না হইতে, চকিতের মধ্যে শকট ও শকটচালক দূরে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। দূরে দুইটী লোক ইতস্ততঃ করিতেছিল। হোটেলস্বামী তাহাদিগকে আমাদের লগেজ ইত্যাদি লইতে বলিয়া আমাদিগকে প্রবেশাধিকার দিল। ভিতরে আসিয়া কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের কেন, সশস্ত্র লোকেরও ভীতি সঞ্চার হইয়া থাকে। গৃহমধ্যে আমরা দুটী বিপন্ন অপরিচিত যাত্রী, সম্মুখে ৬০।৭০ জন ভয়ঙ্কর দস্যু।

গৃহটীর মধ্য দিয়া একটু সরু পথ, দুইধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলে চারিজনের বসিবার স্থান সংলগ্ন। তাহার একটীও খালি নাই। ছাদের তলদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গন্ধময় তৈলযুক্ত দীপাধারগুলি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোক বিকীর্ণ ও দুর্গন্ধ সঞ্চার করিতেছিল। এই সকল দেখিয়া এমনই বোধ হইল যে, সুবিধা হইলে তৎক্ষণাৎ দ্রুত পলায়নে সে স্থান পরিত্যাগ করি। আমি এত দেশভ্রমণ করিলাম কিন্তু এমন অপরিচ্ছন্ন, অসভ্য ও কুৎসিৎ লোক কখনও আমার নয়নগোচরে আইসে নাই। গৃহস্থিত সকলেই আহার, পান, শপথ ও কলহোন্মত্ত। তাহাদের মধ্যে যাইয়া গৃহস্বামী উচ্চরবে আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "নূতনযাত্রী আসিয়াছে।" এই বার্ত্তা ঘোষিত হইবামাত্র ক্ষণকালের জন্য একেবারে চারিদিক্ স্তব্ধ হইল। পরে কেহ কেহ শিস্ দিয়া উঠিল। আমাদের লগেজ ইত্যাদি নয়নগোচর হইবামাত্র সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিল। আমি বিপদে আশ্রয় পাইব ভাবিয়া আগ্রহে প্রায় প্রত্যেকের মুখের দিকে এক একবার চাহিয়া দেখিলাম বটে, কিন্তু বৃথায়। আমরা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে একটী কাচের দরজাযুক্ত ছোট ঘরের মধ্যে আসিলাম। আসিবার কালে আমাদের দেখিয়া কেহ কেহ উপহাস করিল। প্রায় সকলেই যে নরঘাতক ভয়ঙ্কর দস্যু, তাহারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। যাহা হউক, সেই ছোট গৃহটীতে আসিয়াই আমরা কিছু খাদ্য ও এক এক বাটী কাফি চাহিলাম। তদুত্তরে হোটেলস্বামী অপূর্ব্ব বিকৃত-ভাষায় বলিল, "স্থির হউন! ঠিক সময়ে পাইবেন।" গৃহটী বোধ হয় রন্ধনশালা

রূপে ব্যবহৃত হয়। গৃহের আসবাবের মধ্যে একখানি টেবিল ও দুইখানি চেয়ার। অপর পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, দূরে একটী উনুন জ্বলিতেছে। সম্মুখে এক অতি কুৎসিতা বৃদ্ধা রমণী দাঁড়াইয়া পার্শ্বের গৃহস্থিত লোকসমূহের জন্য নানাবিধ ভোজ্য পাক করিতেছিল। হাত পা খালি, মাথায় একখানা কাল ন্যাকড়া জড়ান. গায়ে একটী অতি ময়লা হাতাকাটা. গলায় ফাঁস দেওয়া ছোট জ্যাকেট পরা; অতি কদাকার, এমন স্ত্রীলোক বোধ হয় আমি জীবনেও দেখি নাই। স্ত্রীলোকটী আমরা আসিবামাত্র একবার নিকটে আসিয়া, হিংস্র পশু যেমন আপন শীকার দেখে, সেইভাবে কোমরে হাত দিয়া এদিক ওদিক্ অর্থাৎ আমাদের লগেজ ইত্যাদির উপর খরদৃষ্টি করিল। আমি যদিও আকার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহাকে কোন কথা বলা বৃথা. তথাপি স্ত্রীলোক বলিয়া তাহাকে বলিলাম, "দেখ, যদি কাফি না থাকে, আমাদের জন্য এক গ্লাস জল আনিয়া দাও। আর দোহাই তোমার, তুমি স্ত্রীলোক. আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহটী দেখাইয়া দাও।" সে এক অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আপন রন্ধনকার্য্যে চলিয়া গেল।

ঠিক সেই সময়েই সম্মুখের গৃহস্থিত লোকদিগের জন্য খাদ্য লইয়া একটী অতি ক্ষীণকায়া দীনাহীনা বালিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার আকৃতি এত অসামান্য রকমের যে, তাহাকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া প্রতীতি হওয়া দূরে থাক, একটী জন্তু বলিয়া মনে হইল। বয়স অনুমান সপ্তদশবর্ষ। অঙ্গরাখার পরিবর্ত্তে কতকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া ইতস্ততঃ স্থাপিত করিয়া গাত্রাবরণ রূপে ব্যবহৃত। পুরু কাল চুলগুলি চারিদিকে ন্যস্ত, কতকগুলি কাণের উপর দিয়া আসিয়া চক্ষুর উপরে পড়িয়াছে, আর কতকগুলি স্কন্ধ ও বাহুদ্বয় ঢাকিয়া পদপ্রান্তে বিন্যস্ত। গায়ে সর্ব্বাঙ্গেই ময়লা। বোধ হয় সাবান নামে দ্রব্যটী তাহার নিকট একেবারে অপরিচিত। বলা বাহুল্য, তাহার পায়ে মোজা বা কোনও রকম আবরণ ছিল না।

সে আমাদের সম্মুখে আসিয়াই চমকিয়া উঠিল। যেন তাহার মনে ভীতি ও নৈরাশ্যের চিহ্ন জাগিয়া উঠিল! সে যেন কেমন এক রকমের! যেন আমাদের মত লোক জীবনে কখনও দেখে নাই। আর আমরাও বোধ হয় উহার মত জীব কখনও দেখি নাই। কিন্তু তাহার চক্ষুদ্বয় অতীব সুন্দর ও উজ্জ্বল। ইহা বেশ প্রতীয়মান হইল যে, অবস্থান্তরে পড়িলে এই বালিকা অত্যুৎকৃষ্ট সুন্দরীগণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। সে ভক্তিসহকারে একবার আমাদের দিকে চাহিয়া নতজানু হইয়া বসিল ও আমার পোষাক ও হস্ত চুম্বন করিল। হস্তে হীরকাঙ্গুরী দেখিবামাত্র সে একবার সেই হতভাগা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ

তাহাকে কার্য্যে ব্যস্ত দেখিয়া, আমাকে ইসারায় জানাইল, যেন আমি তৎক্ষণাৎ অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া লুক্কায়িত করি।

আমি তাহার কথামত সেই অঙ্গুরীয়টী লুক্কায়িত করিতেছি, এমন সময় সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "এই মাংসের ডিস তোমার প্রভুর জন্য লইয়া যাও।" সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া আমি বলিলাম, "দেখ আমাদের জন্য যদি কিছু রুটী, দুগ্ধ ও জল আনিয়া দাও, বড়ই ভাল হয়।" তখন সেই ভীতচিত্তা বিষাদপ্রতিমা অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "হায় ভগবান্! আমার ইচ্ছা তোমাদিগকে সাহায্য করি, কিন্তু আমার কোনও ক্ষমতা নাই, ক্ষমা কর, আর তোমরা কিন্তু একটু সাবধানে থাকিও।" তাহার শেষের কয়েকটী কথার অর্থ পরিগ্রহ করিতে না করিতে সে দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে বালিকাটী একখানি সুন্দর ডামাস্ক কাপড়ে ঢাকা একটী ট্রে লইয়া আসিল। ট্রের উপর একখণ্ড পোড়া রুটী, দুবাটী কৃষ্ণ কাফি এবং একটী ছোট জলের জাগ্ ছিল। বালিকা ওই ট্রেখানি রাখিবার সময় সেই বৃদ্ধার দিকে পশ্চাৎ করিয়া এমন একটী ইঙ্গিত করিল, যাহাতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, সে ঐ কাফি পান করিতে নিষেধ করিতেছে। আমরা যেরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের পক্ষে ঐ কাফি দুবাটী প্রত্যাখ্যান করা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে, তাই বালিকা ঐ কাফি পান করিতে নিষেধ করিয়াছে। যাহাই হউক আমরা তৎক্ষণাৎ সেই দগ্ধ রুটী খণ্ডের সদ্ব্যবহার করিয়া কিঞ্চিৎ জল পানান্তর একটু শ্রান্তি দূর করিলাম। ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধা আমাদের কাফিবাটীদ্বয়ের দিকে খর দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে দেখিয়া, আমরা ছলনা করিয়া এক একবার কাফির বাটী মুখে ধরিলাম।

তখন আর একবার আমরা বৃদ্ধাকে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহটী দেখাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তদুত্তরে সেই 'ব্যস্ত হইও না' পুরাতন কথা শুনিলাম। তবে জানাইল যে, তাহার রন্ধন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সে আমাদের শয্যা রচনা করিয়া দিবে। অবশেষে সে আমাদের বাক্সটীর প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই দ্রুতবেগে আসিয়া সেই বালিকাটী আমাদের বলিয়া গেল, "তোমরা নিদ্রিত হইও না।" এমন কি আমরা তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলাম না। বোধ হইল যেন কোনও "দেবীপ্রতিমা" আকাশ-সম্ভব-বাণী জ্ঞাপিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমরা দস্যুগৃহে প্রবেশের প্রায় তিন ঘণ্টা পরে হোটেলস্বামী আসিয়া আমাদের পার্শ্বেই দেয়ালে একটী দ্বার উন্মোচন করিল। টেবিলের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় সে দেখিতে পাইল যে, কাফি পড়িয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাদনুসরণকারিণী সেই বালিকাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "তুই যদি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিস্, আমি তোকে কুকুর মারার মত মারিয়া ফেলিব।" এই কথা বলিয়া, আমাদের বলিল, "কাফি কি উত্তম হয় নাই ?" আমরা বলিলাম, "না, আর অনেক বিলম্বে পাওয়ায় আমাদের আর আবশ্যকও হয় নাই।" কাফি পান করিলে বোধ হয় আমাদের আর নিদ্রাভঙ্গ হইত না।

তখনও সেই পার্শ্বগৃহ হইতে এত উন্মাদ চীৎকার-শব্দ উঠিতেছিল যে, অপর কিছুই বড় একটা কর্ণগোচর হয় না। বৃদ্ধা আসিয়া একটা বোতলে আঁটা তিন ইঞ্চি আন্দাজ একটী বাতি দিয়া গেল। বোতলটী বাতিদানের স্বরূপ। তৎপরে বৃদ্ধা অনায়াসে আমাদের সেই ভারী বাক্সটা একলা উঠাইয়া, নূতন গৃহে স্থাপিত করিয়া, আমাদিগকে বিস্মিত করিল।

একে একে সকলেই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দ্বারটি বন্ধ করা যায় কি না অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম; তাহাই ঠিক্। দ্বারের গায়ে কোনও রূপ অর্গল নাই। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, গৃহাস্থিত একটী বৃহদায়তন টেবিল টানিয়া দ্বারের উপরে স্থাপন করিলাম। আর আমাদের সেই ভারী বাক্সটী টেবিলের পায়ার উপর ঠেস দিয়া রাখিলাম। উদ্দেশ্য,—বিনা আয়াসে না দ্বারটী উন্মুক্ত হয়। গৃহটীর সকলই অদ্ভুত। চারিধারে নানারকমের পোষাক ঝুলিতেছে। বহুরূপী সাজিবার যত রকম পোষাক আবশ্যক, আমার বোধ হয় তাহার কোনটীর অভাব ছিল না। গৃহটী যতদূর অপরিষ্কার হইবার ততদূরই ছিল। ছাদের নিম্নে একটীমাত্র ক্ষুদ্র জানালা আলোক ও বায়ু সঞ্চারের দ্বার। কোনও রূপ গৃহবাসোপযোগী দরিদ্র-কুটীর-সম্ভব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও কুত্রাপি দৃষ্ট হইল না। আমরা বিশ্রামের জন্য এই গৃহে যখন প্রবেশ করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় ১টা। পাঠকগণ আমাদের অবস্থা বেশই বুঝিতে পারিতেছেন। সঙ্গে অনেক টাকা কড়ি, দু দশখানি বহু-মূল্য হীরকাদিও ছিল। এরূপ অবস্থায় সেই দস্যুদলপরিবেষ্টিত হোটেলে রাত্রি যাপন করা কিরূপ ভয়প্রদ, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না।

গৃহটীর একটী ব্যতীত দ্বার নাই। তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, রন্ধনগৃহের মধ্য দিয়া। তবে কিরূপে এই শয্যা প্রস্তুত হইল আর সামান্যমাত্র খড় বিছাইয়া,

চাদর ঢাকিয়া, এই বিছানা প্রস্তুত করিতে কেনই বা এত বিলম্ব হইল, এই সকল ভাবিতেছিলাম, এমন সময় বাতিটা ফুরাইয়া আসিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সঙ্গে একটা বাতি ছিল। তাহা জ্বালিয়া দিলাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রায় আধ ঘণ্টা নিস্তব্ধভাবে শুইয়া আছি, সঙ্গে একখানি সুদীর্ঘ ছুরিকা শয্যাপার্শ্বে রাখিয়াছি। এমন সময় বোধ হইল শয্যাটী যেন নামিয়া যাইতেছে। উঠিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া কোনও কল কব্জার শব্দ বা কার্য্য দেখিতে না পাইয়া বুঝিলাম, স্ব স্ব মাথার বিকৃতি মাত্র। পুনরায় শুইলাম। কিন্তু এবার আর সন্দেহ নাই, সত্য সত্যই বিছানাটী খাট সহিত নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য কৌশল, যেমন আমরা বিছানা হইতে নামিলাম, যেখানকার খাট ঠিক সেইখানেই। খাট দুখানি যে নীচের দিকে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে নামিয়া যাইতেছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না। ধন্য কৌশল! এতক্ষণে সেই বালিকার কথা হৃদয়ঙ্গম হইল। এতক্ষণে বুঝিলাম, দস্যু-গৃহে এই দেবীপ্রতিমা অন্য কি ভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে। ধন্য জগদীশ্বর! ধন্য তোমার মহিমা! তুমি যথার্থ বিপন্নের বল, দীনের সহায়! কেন যে এত দেরীতে শয্যা প্রস্তুত, কেন যে বাতিটা সবেমাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম! তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ধীরে ধীরে অতি সাবধানে খাট দুইখানি উত্তোলন করিয়া গৃহের অপর পার্শ্বে স্থাপিত করিয়া তাহাতে পুনরায় শুইলাম। তখন আমরা তাহাদের কৌশল ব্যর্থ করিয়াছি বুঝিতে পারিয়া বোধ হয় ব্যাপার কি জানিবার জন্য, গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া ফিস্ ফিস্ শব্দে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। আমরা দুইজনেই নির্ব্বাক্। এটী আমরা বেশ জানিতাম যে, তাহারা সহজে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহারা দ্বার উন্মোচনে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। দু একটী ধাক্কা দিবার পর আমি নিদ্রা-জড়িত অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি! কি চাও?" একটী পুরুষ উত্তর করিল, "গৃহস্থিত টানা দেরাজের মধ্যস্থ কোনও দ্রব্যের বিশেষ আবশ্যক, সেইজন্য আমি গৃহমধ্যে যাইব।" "অসম্ভব," আমি বলিলাম, "এ গৃহ কল্য প্রাতঃ-কাল পর্য্যন্ত আমাদের, আমরা রাত্রে কাহাকেও প্রবেশাধিকার দিতে পারি না।" পুরুষটী রাগান্বিত হইয়া দ্বারে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিল। আমাদিগকে অগত্যা বলিতে হইল, "আমরা কোনও পুরুষকে গৃহমধ্যে আসিতে দিব না। হয় সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে না হয় সেই বালিকাকে পাঠাইয়া দাও। অন্য কোনও ব্যক্তি প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে তাহার উপর গুলি বর্ষণ বা ছুরিকাঘাত অবশ্যম্ভাবী।"

তখন সাহসে বুক বাঁধিতে বাধ্য হইলাম। যেমন করিয়া পারি, প্রাণ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। তখন বৃদ্ধা বলিল, "তবে আমাকে যাইতে দাও, হোটেলের কোনও যাত্রী চলিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য বস্ত্রাদি আবশ্যক।"

তখন আমি বেশ গম্ভীরভাবে বলিলাম, "কেবল তোমাকে মাত্র আমি প্রবেশাধিকার দিলাম, কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতকতার সামান্য পরিচয় পাই, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত জানিও, ছুরিকাঘাতে তোমার দেহ খণ্ডিত হইবে।"

যদিও আমাদের নিকট বাতি ছিল কিন্তু আমরা তাহার সমস্তটা ব্যয় করি নাই। আবশ্যক হইলেই তাহার ব্যবহার হইবে এই জন্য আমার স্বামী প্রস্তুত ছিলেন। বৃদ্ধা একটী বাতি হস্তে গৃহ মধ্যে অতি যত্নে কোনও মতে প্রবেশ করিল, কারণ, আমরা দ্বারটী অতি অল্পই উন্মোচন করিয়াছিলাম। সে গৃহমধ্যে আসিয়া অবধি সেই দেরাজের নিকট কি যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি সেই কোণে রক্ষিত শয্যাবিস্তৃত খাট দুটীর উপর ছিল, সেটী আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। "শীঘ্র যাও" আমি বলিলাম, "তোমাদের জন্য আমরা সারা রাত্রি না ঘুমাইয়া থাকিতে পারি না।" যাইবাব সময় আমি হস্তে ছুরিকা উত্তোলন করিয়া দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম। কোনও রূপ অত্যাচারের আভাস পাইলেই আমি নিশ্চয়ই বৃদ্ধাকে ছুরিকা বিদ্ধ করিতাম। অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন। হয় তার না হয় আমার প্রাণসংশয় এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। আমি সশস্ত্র না থাকিলে সেও বোধ হয় আমায় ছাড়িয়া যাইত না। তাহার গৃহ প্রবেশের উদ্দেশ্য কেবল খাট দুখানি নিম্নের গহ্বর মধ্যে কেন গেল না, তাহার অনুসন্ধান করা।

পুনর্ব্বার আমরা দ্বারটী দৃঢ়রূপে বন্ধ করিলাম। দূরে দুই খানি চেয়ারে বসিয়া আবার কি নূতন ঘটে জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। প্রায় ৪ ঘটিকার সময় হোটেলস্বামী স্বয়ং পুনর্ব্বার প্রবেশাধিকার চাহিল। আমরা কিছুতেই তাহার কথা শুনিলাম না। সে আমাদের কত কি ভয় দেখাইল।

ধন্য ভগবান্! ধীরে ধীরে উষা সমাগম দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইলাম। তখন দ্বার উন্মোচন করিয়া আমি সেই রান্নাঘরের কাঁচের দরজার মধ্য দিয়া দেখিলাম, সেই দস্যুদলপূর্ণ গৃহটী একেবারে নিস্তব্ধ। দস্যুগণ গত রাত্রের উন্মাদ চীৎকার ও তাণ্ডবের পর মৃতের মত নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বিকট নাসিকাধ্বনি বন্য পশু গর্জ্জনের ন্যায় সমুথিত হইতেছে। আমি আমাদের গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ইতিমধ্যে চকিতের

ন্যায় কোথা হইতে সেই দয়াময়ী বালিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাদিগকে জীবিত ও সুস্থ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। আমাদের হাত ধরিয়া সে, "তোমরা নিরাপদে আছ" এই কথা বার বার বলিতে লাগিল। আর যোড়করে সাশ্রুনয়নে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। অবশেষে আমাদের দিকে ফিরিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে, জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের ঈশ্বর কি তোমাদের রক্ষা করিয়াছেন?"

তদুত্তরে আমি বলিলাম, "হাঁ বাছা!"

সে তখন যেখানে কলের বিছানা স্থাপিত ছিল, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই তাহার নিকটস্থ হইল না। আমরা যে বাঁচিয়া আছি, তাহাতে সে বড়ই আনন্দিতা। তাহার মুখে ও স্কন্ধের চারিদিকে আঘাত চিহ্ন লক্ষিত হইল। আমাদিগকে সতর্ক করার জন্য তাহার এই শাস্তি। হায়! ভগবান্! তোমার এ কি খেলা! আমাদের জন্য নিরপরাধিনী বালিকার এত শাস্তি কেন?

তৎপরে আমরা যথাসম্ভব মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বালিকাকে বলিলাম, তোমার প্রভুকে বল, শীঘ্র যেন আমাদের বিল পাঠাইয়া দেয়। যাইবার সময় তাহার হস্তে একটা নূতন চক্‌চকে রজত মুদ্রা দেওয়ায় সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিল যে, সে বিচারদিন অবধি ঐ মুদ্রাখণ্ড রাখিয়া দিবে।

পাঠক, এই বালিকা, এই দস্যুগৃহে প্রতিপালিতা দেবীপ্রতিমা কে বুঝিতে পারিতেছেন কি? এ বালিকা সেই দুর্ব্বলের বল, দীনের সহায়, আর্ত্তের আশ্রয়, বিপন্নের বন্ধু, জগৎপাতা ধাতার করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া দস্যুগৃহে বিরাজমান। বোধ হয় এইরূপ দেখিয়া শুনিয়াই সিদ্ধ কবি গাহিয়াছিলেন,

"ধাতার করুণা মর্ত্ত্যে নারী অবতার!"

বলা বাহুল্য সেই ইংরাজ দম্পতি হোটেল হইতে নির্গত হইয়া গ্র্যাজ সহরে আসিয়া হাতী হোটেলের যাত্রী হইয়া রহিলেন। হোটেলস্বামী তাঁহাদের প্রমুখাৎ সেই দস্যুগৃহের পরিচয় পাইয়া পুলিসে সন্ধান দিল। তাহার পর যাহা ঘটে, তাহাই ঘটিল। এ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাও এইখানে শেষ হইল। এই আখ্যায়িকা পাঠে যদি কাহারও মনে সেই পূতচরিত্রা, পরোপকারশীলা, করুণাময়ী বালিকার মধুর ও পবিত্র চরিত্রের আভাস জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। বিশ্বনিয়ন্তার বিশাল রাজ্যে কোথায় কি রত্ন থাকে, কে বলিতে পারে!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

স্বামীজির স্মৃতি।

(শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।)

প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে এটী যে একটী সুবৃহৎ মেলা, তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে অন্যান্য মেলায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরই অধিক সমাগম হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু শতকরা ৯৫ জন শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া থাকেন। এ মেলাতে কোন প্রকার কেনা বেচার বিশেষ সংস্রব থাকে না, তাই বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর লোকের তত প্রাদুর্ভাব হয় না। মেলামাত্রেই কিছু না কিছু ধর্ম্ম সম্বন্ধ আছে, তবে সেই ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবের আনুষঙ্গিক নানাবিধ হাটবাজার প্রভৃতি বসে বলিয়াই অন্যান্য মেলায় নিম্নশ্রেণীর লোকের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব এবং ভয়ানক ভিড় ও ঠেলাঠেলি দেখা যায়। এখানে দশ বিশ হাজার লোক একত্র হইলেও সে প্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ, অধিকাংশই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান।

কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। ষ্টীমার আসিয়া মঠের কিনারায় লাগিল; আর রক্ষা নাই—সকলকেই আগে নামিতে হইবে। মঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ষ্টীমারে উঠিবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ—কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নাই। প্রতিবারই প্রায় দুই এক জন জলে পড়েন। আমাদের ভিতরে সভ্যতার অসম্পূর্ণতাই ইহার কারণ।

আমরা পাঁচ সাত জন একত্র হইলেই আমাদের এই অসংযত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সকলেই এক সঙ্গে কথা কহিবেন, কেহ কাহারও কথা শুনিবেন না। যদি গান আরম্ভ হইল ত সকলকেই তাহাতে যোগ দিতে হইবে; শিক্ষিত অশিক্ষিত বিচার নাই, সুরে সুর মিলিল না মিলিল ভ্রূক্ষেপ নাই, লজ্জা নাই—যেন ভেড়ার খোঁয়াড়ে আগুণ লেগেছে।

স্বামীজির সঙ্গে একদিন মঠে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে,—

যদি না পড়ে পো
সভায় নিয়ে থো।

"কথাটী খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক আধটা সভা, যা কালে ভদ্রে কারও বাড়ীতে হয়, তা নয়। সভা হচ্ছে রাজ দরবার। আগে আমাদের যে সকল স্বাধীন বাঙ্গালী রাজা ছিল, তাদের প্রত্যহই সকালে বৈকালে সভা বস্‌ত। সকালে সমস্ত রাজকার্য্য। আর খবরের কাগজ ত ছিল না, সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর লওয়া হতো, আর তাতে সেই রাজ-ধানীর সব ভদ্রলোক আস্‌তো। যদি কেউ না আস্‌তো, তার খবর হ'ত। এই সকল দরবার সভাই আমাদের দেশের কি সমস্ত সভ্য দেশের সভ্যতার Centre ছিল। পশ্চিমে রাজপুতানায় আমাদের এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে আজও সেই রকমটা কতক হয়।

প্রশ্ন। মহারাজ, এখন দেশী রাজা আমাদের দেশে নাই বলে কি দেশের লোকগুলো এতই অসভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে?

স্বামীজি। এগুলো একটা অবনতি—যার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই লক্ষণ। জাহাজে ওঠ্‌বার সময় 'চাচা আপ্‌না পবাণ বাঁচা,' আর গানের সময় 'হামবড়া' এই হচ্চে সব ভিতরের ভাব; একটু Self-sacrifice শিক্ষা কর্‌লেই ঐটুকু যায়। এটা বাপ মার দোষ—ঠিক ঠিক সৌজন্যও শেখায় না। সুসভ্যতা Self-sacrifice এর গোড়া।

নিতান্ত বালককালেও স্বামীজি যখন দশ পনের জনকে লইয়া গান গল্প করি-তেন, তখনও দেখা গিয়াছে, একটা হৈ চৈ কলরব কখনই ঘটিত না। তাঁর কেমন একটা personalityর জোর ছিল এবং তাঁর নিজের একটা সংযত ভাব আগাগোড়া, প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক ভঙ্গীতে ছিল। তিনি কথা আরম্ভ করিলে যদি কেহ অন্য কোন প্রসঙ্গ তুলিয়া কথা কহিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পর নিজের কথা কহিতেন। সেই শৈশবাবস্থাতেও নরেন গান ধরিলে অন্য কেহ তার সঙ্গে ঠিক সুর লয় মিলাইয়া গাহিতে পারিতেন ত ভাল, নতুবা তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া বলিতেন, "তোর হচ্ছেনা ভাই। আগে গানটা যে রকম গাই, মনে মনে গেয়ে শিখে নে; তারপর সঙ্গে সুর মিলিয়ে তুই একবার গেয়ে নিতে হয়, নইলে ভাল লাগ্‌বে কেন?" বালকের অমনি চৈতন্য হইত।

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন,—

"বাপ মার অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলো যে একটা স্ফূর্ত্তি পায় না। গান গাওয়াটা বড় দোষ—ছেলের কিন্তু একটা ভাল গান শুন্‌লে প্রাণ ছটফট করে, সে

নিজের গলায় কেমন করে সেটা বার করবে। কাজেই সে একটা আড্ডা খোঁজে। তামাক খাওয়াটা মহাপাপ—এখন কাজেই সে চাকর বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না ত কি করবে? সকলেরই ভেতর সেই infinite ভাব আছে—সে সব ভাবের কোন রকম স্ফূর্ত্তি চাই। তোদের দেশে তা হবার যো নাই। তা হতে গেলে বাপ মাদেরও নূতন করে শিক্ষা দিতে হবে। এই ত অবস্থা! সুসভ্যই নয়, তার উপর আবাব তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কি না—এখনি রাজ্যিটা ইংরেজ তাঁদের হাতে ফেলে দেয় আর তাঁরা রাজ্যিটে চালান। দুঃখুও হয়, হাসিও পায়। আরে সে martial ভাব কই? তার গোড়ায় যে দাসভাব সাধন করা চাই, নির্ভর চাই—হামবড়াটা martial ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে—তবে না মাথা নিতে পারবে। সে যে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন ভক্ত লেখক যাঁহারা ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবকে *ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহার কোন পুস্তকে তাঁহাদিগের প্রতি* কটাক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বামীজি তাঁহাকে ডাকাইয়া উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোর এমন করে সকলকে গাল দিয়ে লেখ্‌বার কি দরকার ছিল? তোর ঠাকুরকে বিশ্বাস করে না, তার কি হয়েছে? আমরা কি একটা দল করিছি না কি? আমরা কি রামকৃষ্ণ ভজা যে, তাঁকে যে না ভোজ্‌বে, সে আমাদের শত্রু? তুই ত তাঁকে নিচু করে ফেল্‌লি, তাঁকে ছোট করে ফেল্‌লি। তোর ঠাকুর যদি ভগবান্ হন ত যে যেমন করে ডাকুক, তাঁকেই ত ডাক্‌ছে, তবে সবাইকে তুই গাল দেবার কে? না, গাল দিলেই তোর কথা শুন্‌বে? আহাম্মক, মাথা দিতে পারিস তবে মাথা নিতে পার্‌বি; নইলে তোর কথা লোকে নেবে কেন?

তিনি একটু স্থির হইয়া যেন গভীর শোকপূর্ণ বচনে পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"বীর না হলে কি কেউ বিশ্বাস কর্‌তে পারে, না নির্ভর কর্‌তে পারে? বীর না হলে হিংসা দ্বেষ যায় না, তা সভ্য হবে কি? সেই manly শক্তি, সেই বীর ভাব তোদের দেশে কই?

"নেই, নেই। সে ভাব ঢের খুঁজে দেখেছি, একটা বই দুটো দেখ্‌তে পাই নি।

প্রশ্ন। কার দেখেছ, স্ব ?

স্বামীজি। এক G. C.র দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক দাস ভাব; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তার আম্‌মোক্তারনামা নিয়েছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখ্‌লুম না, নির্ভর তার কাছে শিখেছি।”

এই বলিয়া স্বামীজি হাত তুলিয়া গিরীশ বাবুর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

স্বামীজি আজীবন কাহারও মনকষ্ট দেখিতে পারেন নাই। তাই আজ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন ভক্ত জনসাধারণের নিকট সেই গুরুতর অপরাধে অপরাধী দেখিয়া লেখককে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। স্বামীজি একে পীড়িত, তাহাতে আবার তাঁহাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া সকলে একে একে সরিয়া পড়িলেন।

* * * * *

দ্বিতীয়বার স্বামীজির মার্কিনে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, তিনি অনেকটা ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাগবাজারে ৺ বলরাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন নৌকা ডাকিতে গিয়াছেন—স্বামীজি এখনি আবার মঠে যাইবেন। ইতিমধ্যে স্বামীজি তাঁহার অন্য একজন বন্ধুকে ডাকাইলেন।

স্বামীজি। চল্, মঠে যাবি চল্ আমার সঙ্গে—অনেক কথা আছে।

বন্ধুটী উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন,—

“আজ বড় মজা হয়েছে। একজনের বাড়ী গেছ্‌লুম—সে একটা ছবি আঁকিয়েছে—কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জ্জুনকে গীতা বল্‌ছেন। ছবিটা দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞেস কর্‌লে, কেমন হয়েছে। আমি বল্লুম, মন্দ কি। সে জিদ করে বল্‌লে, সব দোষ গুণ বিচার করে বল কেমন হয়েছে। কাজেই বল্‌তে হল—কিছুই হয় নি। প্রথমতঃ রথটা আজ কালের প্যাগোডা রথ নয়, তার পর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয় নি।

প্রশ্ন। কেন প্যাগোডা রথ নয়?

স্বামীজি। ওরে, দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ কর্‌ত না। রাজপুতানায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মত। Grecian mythologyর ছবিতে যে সব রথ আঁকা আছে দেখেছিস? দুচাকার, পিছন দিয়ে ওঠা নাবা যায়; সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁক্‌লেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন

ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলি দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent করা চাই, নইলে কিছুই হয় না। যত মায়ে খেদান বাপে তাড়ান ছেলে যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting শিখ্‌তে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করান আর একখানা perfect drama লেখা, একই কথা।

প্রশ্ন। কৃষ্ণকে কি ভাবে আঁকা উচিত ওখানে?

স্বামীজি। শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস, সমস্ত গীতাটা personified আর তাঁর central ideaটী, যখন অর্জ্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বল্‌ছেন, তখন তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এই বলিয়া স্বামীজি শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে আঁকা কর্ত্তব্য, সেই মত নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেন :—

"এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাস টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা দুটো প্রায় হাঁটু গাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে— ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action খেল্‌ছে। তাঁর সখা, ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর, দু পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মত রথের উপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই রকম ঘোড়ার রাস টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটাকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মত মুখখানি অর্জ্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বল্‌ছেন। এখন গীতার preacherএর এ ছবি দেখে কি বুঝ্‌লি?

উত্তর। ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্যও চাই।

স্বামীজি। অ্যাই!—সমস্ত শরীরে intense action আর মুখ যেন নীল আকাশের মত ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হ'ল গীতার central idea, দেহ জীবন আর প্রাণমন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

যিনি কর্ম্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখ্‌তে পারেন আর যিনি বাহ্য কোন কর্ম্ম না কর্‌লেও অন্তরে যাঁর ব্রহ্মচিন্তারূপ কর্ম্মের প্রবাহ চল্‌তে থাকে, তিনি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম্ম করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন,

নৌকা আসিয়াছে। স্বামীজি যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন ,—

"চল্, মঠে যাই। বাড়ীতে বলে এসেছিস্ ত ?"

উত্তর। আজ্ঞা হ্যাঁ।

সকলে কথা কহিতে কহিতে মঠে যাইবার জন্য নৌকায় যাইয়া উঠিলেন।

স্বামীজি। এই ভাব সমস্ত লোকের ভিতর ছড়ান চাই—কর্ম্ম—কর্ম্ম—অনন্ত কর্ম্ম; তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আর প্রাণ মন সেই রাঙ্গা পায়।

প্রশ্ন। মহারাজ, এ ত কর্ম্মযোগ!

স্বামীজি। হ্যাঁ, এই কর্ম্মযোগ। কিন্তু সাধন ভজন না কর্‌লে কর্ম্মযোগও হবে না। চতুর্ব্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণমন কেমন করে তাঁতে দিয়ে রাখ্‌বি ?

প্রশ্ন। গীতার কর্ম্ম মানে ত লোকে বলে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধন ভজন, আর তা ছাড়া সব কর্ম্ম অকর্ম্ম।

স্বামীজি। খুব ভাল কথা, ঠিক কথা; কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রত্যেক চিন্তার জন্য, তোর প্রত্যেক কাযের জন্য দায়ী কে? তুই ত ?

উত্তর। তা বটে, নাও বটে। ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চিনি। আসল কথা ত দেখ্‌ছি গীতার ভাব—ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন ইত্যাদি। তা আমি তাঁর শক্তিতে চালিত, তবে আর আমার কাযের জন্য আমি ত একেবারেই দায়ী নই।

স্বামীজি। ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কথা। কর্ম্ম করে চিত্ত শুদ্ধ হলে পর যখন দেখ্‌তে পাবি, তিনিই সব করাচ্চেন, তখন ওটা বলা ঠিক, নইলে সব মুখস্থ, মিছে।

প্রশ্ন। মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার করে বোঝে যে, তিনিই সব করাচ্ছেন!

স্বামীজি। বিচার করে দেখ্‌লে পরে তখন। তা সে যখনকার তখনি। তার পর ত নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ্, অহরহ তুই যাই করিস্, তুই কর্‌ছিস মনে করে কর্‌ছিস কি না? তিনিই করাচ্ছেন, কত ক্ষণ মনে থাকে? তবে ঐ রকম বিচার কর্‌তে কর্‌তে এমন একটা অবস্থা আস্‌বে যে, আমিটা চলে যাবে আর তার জায়গায় হৃষীকেশ এসে বস্‌বেন। তখন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন' বলা ঠিক হবে। আর বাবা, আমিটী বুক জুড়ে বসে থাক্‌লে তাঁর আস্‌বার জায়গা কোথায় যে তিনি আস্‌বেন? তখন হৃষীকেশের অস্তিত্বই নেই!

প্রশ্ন। কুকর্ম্মের প্রবৃত্তিটা তিনিই দিচ্ছেন ত ?

স্বামীজি। না রে না ; ও রকম ভাব্‌লে ভগবান্‌কে অপরাধী করা হয়। তিনি কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি দিচ্ছেন না। ওটা তোর আত্মতৃপ্তির বাসনা থেকেই ওঠে। জোর করে তিনি সব করাচ্ছেন বলে অসৎ কায করলে সর্ব্বনাশ হয়। ঐ থেকেই ভাবের ঘরে চুরী আরম্ভ হয়। ভাল কায করলে কেমন একটা elation হয়, বুক ফুলে ওঠে। বেস করিছি বলে আপনাকে বাহবা দিবি। এটা ত আর এড়াবার যো নাই, দিতেই হবে। ভাল কাযটার বেলা আমি আর মন্দ কাযটার সময় তিনি ; ওটা গীতা বেদান্তের বদহজম, বড় সর্ব্বনেশে কথা, অমন কথা বলিস্‌ নি। বরং তিনি ভালটা করাচ্চেন আর আমিই মন্দটা কর্‌চি বল্‌। তাতে ভক্তি আস্‌বে, বিশ্বাস আস্‌বে। তাঁর কৃপা হাতে হাতে দেখ্‌তে পাবি। আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি করে নি, তুই আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেছিস্‌ কি না। বিচার এই, বেদান্ত এই। তবে সেটা উপলব্ধি নইলে বোঝা যায় না। সেই জন্য প্রথমটা সাধককে দ্বৈত ভাবটা ধরে নিয়ে চল্‌তে হয় ; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি। এইটীই হল চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায়। তাই বৈষ্ণবদের ভিতর দ্বৈত ভাব এত প্রবল। অদ্বৈত ভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত। কিন্তু ঐ দ্বৈত ভাব থেকে পরে অদ্বৈত ভাবের উপলব্ধি হয়।

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখ্‌, বিট্‌লেমোটা বড় খারাপ। ভাবের ঘরে চুরী যদি না থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবৃত্তিটা বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তার মনে বিশ্বাস হয় যে, এও ভগবান্‌ করাচ্ছেন, তা হলে কি আর বেশীদিন তাকে সেই নীচ কায করতে হয়? সব ময়লা চট্‌ সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা খুব বুঝ্‌তো। আর আমার মনে হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের যখন পতন আরম্ভ হল, আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতো—বাবা, ছমাস ধরে আর যাগ কর্‌বার যোটী নেই, এক রাত্রেই কাচা মাটির মূর্ত্তি গড়ে পূজা শেষ করে, তাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে—যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে—সেই সময়টা থেকেই তন্ত্রের উৎপত্তি হল। মানুষ একটা concrete চায়, নইলে প্রাণটা বুঝ্‌বে কেন? ঘরে ঘরে ঐ এক রাত্রে যজ্ঞ হতে আরম্ভ হল। কিন্তু প্রবৃত্তি সব Sensual (ইন্দ্রিয়গত) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ নর্দ্দমা দিয়ে পথ করে' ; তেমনি সদ্গুরুরা দেখ্‌লেন, যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ বলে কোন কাযের অনুষ্ঠান করতে পার্‌ছে না, তাদেরও ধর্ম্ম-পথে ক্রমশঃ নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের জন্যই ঐ সব বিট্‌কেল তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হয়ে পড়্‌ল।

প্রশ্ন। মন্দ কাযের অনুষ্ঠান ত সে ভাল বলে কর্‌তে লাগ্‌লো, এতে তার প্রবৃত্তির নীচতা কেমন করে যাবে?

স্বামীজি। ঐ যে প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিলে—ভগবান্ পাবে বলে কচ্চে।

প্রশ্ন। মহারাজ, সত্য সত্যই কি তা হয়?

স্বামীজি। সেই একই কথা; উদ্দেশ্য ঠিক থাক্‌লেই হবে; না হবে কেন?

প্রশ্ন। পঞ্চ মকার সাধনে কিন্তু অনেকের মন মদ মাংসে পড়ে যায়।

স্বামীজি। তাই পরমহংস মশাই এসেছিলেন। ও ভাবে তন্ত্রসাধনার দিন গেছে। তিনিও তন্ত্র সাধন করেছিলেন, কিন্তু ও রকম ভাবে নয়। মদ খাবার বিধি যেখানে, সেখানে তিনি একটা কারণের ফোঁটা কাট্‌তেন। তন্ত্রটা বড় Slippery ground. এই জন্য বলি, এদেশে তন্ত্রের চর্চ্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের চর্চ্চা চাই। চতুর্ব্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য চাই।

প্রশ্ন। চতুর্ব্বিধ যোগের সামঞ্জস্য কি রকম?

স্বামীজি। জ্ঞানবিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা আর স্ত্রীলোকের প্রতি পূজা ভাব চাই।

প্রশ্ন। স্ত্রীলোকের প্রতি পূজা ভাব কি করে আসে?

স্বামীজি। ওরাই হল আদ্যা শক্তি। যে দিন আদ্যা শক্তির পূজো আরম্ভ হবে, যে দিন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি নরবলি দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল সুরু হবে।

এই কথা বলিয়া স্বামীজি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। আজ স্বামীজির কথানুযায়ী কার্য্য করিতে কয় জন প্রস্তুত? জন্মাবধি তাঁর অহর্নিশি ভারতের মঙ্গল চিন্তা। অনশনে, পদব্রজে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, শীতে সমভাবে আত্মবৎ জন্মভূমি পর্য্যটন করিয়া দরিদ্র ভারতসন্তানের দারিদ্র্যে বিগলিতহৃদয় হইয়া একাকী প্রান্তরে পর্ব্বতে কাননে নদীসৈকতে মা সর্ব্বমঙ্গলার চরণে কতই রুধিরাশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন; উলঙ্গ, অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালবিশিষ্ট ভারতসন্তানকে দেখিয়া শোকে উন্মত্ত হইয়া আপনার একমাত্র উত্তরীয় স্বহস্তে পরিধান করাইয়া তাহাকে 'আয় ভাই আয়' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া কতই কাঁদিয়াছেন। রাজদরবারের নিমন্ত্রণ, দেবভোগ্যান্ন, দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্রত্যাখান করিয়া দারিদ্র্যভারনিপীড়িতা, জীর্ণা শীর্ণা কুটীর-বাসিনী বৃদ্ধার ভিক্ষান্ন ও তৃণশয্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দরিদ্র

অনাথ অজ্ঞ—ইহারাই বিবেকানন্দের ভগবান্ ছিল। ইহারই নাম স্বদেশবাৎসল্য—ইহাই যথার্থ ত্যাগ—ত্যাগ ব্যতীত স্বদেশবাৎসল্য কোথায়?

একদিন তাঁহার কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন, "স্বামীজি, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বল্‌লে বল্‌তে, 'বে করব না, আমি কি হব দেখ্‌বি', তা যা বলেছিলে, তাই করলে।

স্বামীজি। হ্যাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা ত দেখেছিস্ খেতে পাই নি, তার উপর খাটুনী। বাপ, কতই না খেটেছি! আজ আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ্ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে, দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।

রক্ত মাংসের শরীর, কতই সহ্য হবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে, শোকে, ভারতের আধ্যাত্মিক ও বাহ্য দুর্ভিক্ষ জনিত অহরহ চিন্তার তাড়নে অকালে দেহত্যাগ হইল। আজ তিনি তাঁহার দেহের বিনিময়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা ভারতের কুসন্তান, কুলাঙ্গার; আমরা কৃতজ্ঞতা জানি না, ভালবাসা জানি না, তিলমাত্র স্বার্থত্যাগ জানি না। যদি জানিতাম, আজ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, বিবেকানন্দের আদর্শে এক একটী Bachelor's Association সমুত্থিত হইত, মাতৃভক্ত বঙ্গবাসী আপনার তপ্ত রুধিরে ভারত ভারতীর দারুণ ক্ষুৎপিপাসা দূর করিত, ঘরে ঘরে নররক্তমাংসে দুখিনী ভারতমাতার রাঙ্গাপদে পাদ্যার্ঘ্য দিয়া জয় ডঙ্কায় মেদিনী পূরিত, বিবেকানন্দের অনুষ্ঠিত নরমেধ যজ্ঞের উদ্‌যাপন হইত, নররুধিরলোলুপা অসুরনাশিনীর অনশন ঘুচিত! হায়, এমন দিন কবে হবে?

সৃষ্টি।

হে মন! বাস কি ভাল কথা চমৎকার,
মুগ্ধকর উপাখ্যান—আশ্চর্য্য ব্যাপার?
এস হে শুনাই তবে, শুন নি কখন,
আরবীয় উপন্যাসে আশ্চর্য্য তেমন।
অসম্ভব বিশ্বে ছিল লোক এক জন,
হয় নাই জন্ম তার, হবে না কখন।
শির পদ বিহীন সে, না বলে না চলে,
দেখে নাই কেহ, তবু আছে সবে বলে।
বলি হে সরলে যদি পাও হে আভাস,
বিশ্ব ছিল অপদার্থ—শুধু অবকাশ।
অসীম অনবস্থান শূন্য সুগভীর,
ছিল নীল নিরালোক নির্ব্বিঘ্ন তিমির
তামসী গরিমা স্থিরা বিকট শর্ব্বরী,
ডাকেনি একটী কীট কিটি কিটি করি।
সে জন সে নিশায় (যে জন জেগেছিল)
চাহিল প্রভাত, ভানু ত্বরিৎ ভাতিল।
বিপুল বর্ত্তুল তপ্ত উজ্জ্বল শ্রীধর,
মহতী মহিমাময় প্রত্যক্ষ ঈশ্বর!
অসীম আঁধার দহি উঠি ক্রমে ক্রমে
হের রে লোহিত ভানু ভাতিল প্রথমে।
তা হতে মধুর রূপ প্রভা সুখকর,
জন্মিল আলোক আরো নব শশধর।
এ কি পুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক বিস্তার
অসংখ্য আকাশকলি—তারা নাম যার।
স্থিরপ্রভ উজ্জ্বল কি নিমেষ সঞ্চার,
পরিমাণ বিহীন আকৃতি দূরতার।
যেন হীরকের খনি তুলি ভীম বলে,
বিক্ষিপ্ত করেছে শূন্যে সীমাশূন্য স্থলে।

*   *   *

সলিল, অনিল, স্থল, অনল সঞ্চার।
সলিল তরল তনু ললিত লীলায়,
পীযূষ ভেষজ রস পিপাসা পীড়ায়।
অনিল অলক্ষ্য সিন্ধু খেলে অসীমায়,
কোটি বিশ্ব রত্নরাশি মগ্ন আছে যায়।

ঋষিকবি ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সমালোচনা।

কর্ম্মফল ও জন্মান্তর-রহস্য। শ্রী আশুতোষ দেব এম, এ প্রণীত। ২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন, থিওসফিকাল পাবলিসিং সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। এই দুইটি মত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের এবং সুতরাং তাঁহাদের মতাবলম্বী অনেক এদেশীয়গণের নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। অথচ জীবনসমস্যার মীমাংসায় এই দুই মতের ন্যায় আর কোন মত উপযোগী নহে। আশুবাবু এই পুস্তক প্রণয়ন কার্য্যে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন এবং হিন্দু শাস্ত্র এবং থিওসফিষ্টগণের গ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই দুই মতকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

এই পুস্তকের অধিকাংশ বিষয় বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে 'সাহিত্যসংহিতা,' 'নব্য-ভারত', 'পন্থা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে বন্ধুবর্গের অনুরোধে আশুবাবু এইগুলিকে একত্র গ্রন্থন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।

আমরা এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। কর্ম্ম সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই বেশ দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। 'অদৃষ্টের খণ্ডন', 'দৈব ও পুরুষকার' এই দুইটী প্রবন্ধ আমাদের খুব ভাল লাগি-

---

* কীটদংশনে অপাঠ্য।

য়াছে। 'কর্ম্ম ও কৃত্য' (Thought forms) প্রবন্ধটী বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। এই বিষয় সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র হইতে অনুসন্ধান করিয়া আরও প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে ইহা আরও অধিক শিক্ষাপ্রদ হইত।

গ্রন্থটী সম্বন্ধে আরও এক আধটী বক্তব্য আছে। ইহাতে অনেক স্থলে সাধারণ যুক্তি এবং অনেক স্থলে আপ্তবাক্য প্রমাণ রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই সকল আপ্ত বাক্য কিন্তু কতটা স্থলে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের বাক্য, কতটাই বা থিওসফিষ্ট মহাত্মাদের উপদেশ বাক্য, অনেক স্থলে তাহা অস্পষ্ট। অবশ্য থিওসফিষ্টগণ বলিয়া থাকেন বটে যে, হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত উপদেশ ও থিওসফি এক কিন্তু তাঁহারা আবার শাস্ত্রের মধ্যে অন্তর্ব্বাহ্য ভেদ করেন বলিয়া সকল সময়ে তাঁহাদের মত বুঝা যায় না। এই গুলি আরও একটু স্পষ্ট করিয়া লিখিলে এবং ভাষাটী আরও একটু সরল করিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় পুস্তকখানি আরও ভাল হইত।

যাহা হউক, গ্রন্থখানি চিন্তাশীলের সুপাঠ্য হইয়াছে। পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতিও সুন্দর।

সংবাদ ও মন্তব্য।

উদ্বোধনের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, গত বৎসর ভাগলপুরে যখন প্লেগ প্রবল হয়, তখন স্থানীয় মিউনিসিপালিটির আহ্বানে রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ সমিতি হইতে কয়েকটী সাধু ও যুবক যাইয়া প্লেগনিবারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাতে সবিশেষ সফলতা লাভ করেন। প্লেগের সময় প্লেগ নিবারণোদ্দেশে বস্তি পরিষ্কার প্রভৃতি করা অপেক্ষা উহার পূর্ব্ব হইতে এতদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিলে অনেক সুফল হইতে পারে, এই বিশ্বাসে ভাগলপুর মিউনিসিপালিটি এবৎসরও প্লেগের পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণ মিশনকে উক্ত কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে গত ২৪শে জুলাই বেলুড় মঠ হইতে উক্ত কার্য্যের জন্য তিন জন ব্রহ্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন আশা করি, তাঁহারা পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারেও এই কার্য্যে সাফল্য-লাভ করিবেন। স্থানীয় লোকে ইঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া নিজেরা এ কার্য্যে উৎসাহবান্ হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতাবাসী কয়েকজন স্বদেশহিতৈষী উদ্যমশীল যুবক 'নব্যভারত সমিতি' নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার দেশহিতকর

কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইঁহারা বিগত ২৪শে বৈশাখ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রাতে ১৪ নং জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীটে সারস্বত বিদ্যালয় নামক একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাভাবে বিদ্যাশিক্ষাদানে অক্ষম ব্যক্তিগণের সন্তান সন্ততিদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করাই এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ৬০ জনের অধিক ছাত্র হইয়াছে। কতকগুলি ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষার যাবতীয় উপকরণ যোগাইয়া পড়ান হইতেছে। মহিষাদলের রাজাবাহাদুর এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ৩০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভাষা ভাবের প্রকাশকমাত্র। ভাষার এই সহজ লক্ষণ ভুলিয়া গিয়া যখন আমরা উহাকে একটী স্বতঃসিদ্ধ বস্তুরূপে গ্রহণ করি, তখনই উহার সম্বন্ধে আমাদের নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়। মানুষের দেহ জীবিতাবস্থায় একরূপ এবং মৃতাবস্থায় অন্যরূপ নিয়মের অধীন হইয়া থাকে। ভাষাও তদ্রূপ। তুমি যদি এমন কোন বিষয় সাধারণকে বলিয়া বা লিখিয়া বুঝাইতে পার, যাহাতে তাহাদের কোন না কোন প্রকার ইষ্টসিদ্ধি হয় এবং তোমার কথা বা লেখা যদি তাহারা বুঝিতে পারে, তবে তাহাই ভাষার পক্ষে যথেষ্ট। ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়মের বাধনে বাধিবার জন্য নহে, ভাষার ব্যাখ্যার জন্য। প্রাকৃতিক নিয়মে ভাষার জন্ম, পরিপুষ্টি, উন্নতি ও অবশেষে মৃত্যু। এই কারণে ভাষার বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ব্যাকরণের প্রয়োজন। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবার সময় এখনও আসে নাই। প্রতিভাশালী লেখকগণ এখন এই ভাষাকে সর্ব্ব প্রকার ভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া গড়িতে থাকুন। বাঙ্গালায় ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা হউক। বাঙ্গালীর ছেলে শুধু বাঙ্গালা জানিয়া সর্ব্ব বিদ্যা শিখিবার অবকাশ পাক। তবে এক সময়ে ব্যাকরণ লিখিবার প্রয়োজন আসিতে পারে। এখন বাঙ্গালায় আছে কি? এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডার নানারত্নে পূর্ণ করিবার চেষ্টা বিশেষ আবশ্যক। অনুবাদ ও মৌলিক গবেষণা উভয়কেই কার্য্যে লাগাইতে হইবে। সর্ব্বোপরি, মনে রাখিতে হইবে, ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য মাত্র, ভাষার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। অনুরাগহীন অনুষ্ঠান ও মন্ত্রমাত্র সম্বল যাগহোমাদি যেমন বিফল, প্রাণহীন ভাবহীন ভাষা যতই ব্যাকরণের বিধি অনুযায়ী হউক না, তাহাও তদ্রূপ বিফল। তাহা কেহ পড়ে না, পড়িলেও কাহারও তাহাতে কোন উপকার হয় না।

শঙ্কর প্রসঙ্গ

(২)

পুরীধাম হইতে বহির্গত হইয়া ওয়ালটেয়ারে ১ দিন অবস্থান করি। তথা হইতে সিংহাচল, ভিজিগাপত্তন ও রাজমহেন্দ্রী দর্শন করিয়া একে বারে মাদ্রাজ যাই। এ সমস্ত স্থানে শঙ্কর সম্বন্ধে খুব অল্পই জানিতে পারি। সুতরাং এ সব স্থানের বিবরণ শঙ্কর প্রসঙ্গের অন্তর্গত করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া পৃথক্ ভাবে বর্ণন করাই প্রশস্ত। কেবল মাত্র শঙ্করের বিষয় বর্ণন উপলক্ষে যে যে স্থানের উল্লেখ প্রয়োজন, এই প্রবন্ধে কেবল সেই গুলিরই উল্লেখ করিব। ওয়ালটেয়ার ও ভিজিগাপত্তন একই স্থান, তবে ওয়ালটেয়ারটী ক্যান্টনমেণ্ট ও ভিজিগাপত্তনটী সহর। সিংহাচল ইহার ১০ মাইল দূরে, ইহা অতি প্রাচীন তীর্থ ও নৃসিংহ দেবের স্থান। শুনিলাম, শঙ্কর এ স্থলে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন জীবন চরিতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই এবং এক্ষণে এমন কোন চিহ্ন নাই, যাহার দ্বারা এই প্রবাদটী প্রমাণিত হইতে পারে। রাজমহেন্দ্রীর উত্তর ভাগে ধ্বংসাবস্থায় পতিত রাজমহেন্দ্রভবনম্ নামক স্থানটী খুব প্রাচীন। এখানকার লোকেরা বলেন, শঙ্কর এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন না। শঙ্করের আগমন সূচক এ স্থলে কিছুই নাই। মাধব বা আনন্দগিরির শঙ্কর বিজয়েও এই স্থানের কোন উল্লেখ নাই। মাদ্রাজ সম্বন্ধে তদ্রূপ হইলেও এখানে শঙ্কর সম্বন্ধে অনেক সন্ধান জানিতে পারা গেল।

মাদ্রাজে আমরা পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আশ্রমে থাকি। স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া বাঙ্গালীর সঙ্গ যে কতই মধুর, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বলিতে কি, এ আনন্দ যে আমরা পরস্পরেই ভোগ করিলাম, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি তাঁহার গৃহের সম্মুখে একটী উচ্চ রকে একটী বেঞ্চের উপর ২।১ টী বন্ধু সহ বসিয়াছিলেন, আমাদের গাড়িটী ফটকে প্রবেশ মাত্রই তিনি সাদরে আমাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। অপরিচিত হইলেও তাঁহার বন্ধুবৎ সস্নেহ সম্ভাষণে আমরা আনন্দে আপ্লুত হইলাম, আমাদের সমুদায় পথশ্রান্তি যেন ভুলিয়া গেলাম। স্বামী সারদানন্দ লিখিত পরিচয় পত্র খানি অতঃপর আমি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হস্তে দিলাম। স্বামীজী কিন্তু অগ্রেই জানিতেন যে, আমরা তথায় যাইব। যে হেতু বন্ধুবর স্বামী শুদ্ধানন্দ আমার নিমিত্ত উক্ত পরিচায়ক

পত্র ব্যতিরেকেও স্বয়ং আর এক খানি পত্র দ্বারা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আমাদের গমন বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন। আমরা এখানে ৪।৫ দিন থাকি। শঙ্কর সম্বন্ধে অনুসন্ধান, আমাদের দক্ষিণ দেশীয় তীর্থ ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য জানিয়া, তিনি আনন্দ সহকারে আমাকে অনেক সন্ধান দিলেন। শঙ্কর যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, তাহাদের কতকগুলির আধুনিক নামও বলিয়া দিলেন। তিনি অনেক দিন মাদ্রাজে থাকায় ও প্রচার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত করায়, উক্ত অনেক স্থানেরই আধুনিক নাম জানিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেক মাদ্রাজী পণ্ডিত বন্ধুর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

শঙ্করের আবির্ভাব কাল যাহাই হউক না, শঙ্করের পূর্ব্বে যে অদ্বৈতবাদ এবং তাহার বিরোধী বাদ সমূহ বর্ত্তমান ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দক্ষিণ-দেশে কিন্তু অদ্বৈতবাদের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই নানা আকারে দক্ষিণ দেশে বর্ত্তমান ছিল। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন সংস্কৃত ভাষার আদর ছিল, বিশেষতঃ বৈদিক সময়ে ও তাহার কিছু পরেও যেমন বিদ্যাচর্চ্চা, সংস্কৃত ভাষার দ্বারাই হইত, দক্ষিণ ভারতে তদ্রূপ বৈদিক মত প্রচারিত ও গৃহীত হইলেও, তামিল ভাষারই আদর ছিল। বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতিও তামিল ভাষার দ্বারাই চলিত। ভাষা-বিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তামিল ভাষাই ভারতের সর্ব্ব প্রাচীন ভাষা এবং সংস্কৃত বা সংস্কৃতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যভাষা (যাহা হইতে সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি) হইতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই, ইহার উৎপত্তিস্থান সম্পূর্ণ পৃথক্। এটী একটী ভারতের আদিম জাতির ভাষা ছিল। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন সংস্কৃত ভাষার অতি প্রাচীন গ্রন্থ বেদ বর্ত্তমান, দক্ষিণ দেশে তদ্রূপ তামিল ভাষার বেদ বর্ত্তমান। দক্ষিণ-দেশীয় হিন্দুগণ তামিল বেদকে সংস্কৃত বেদের ন্যায় সম্মান করেন। আমি একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উক্ত বেদের কতিপয় শ্লোকের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। যতদূর শুনিলাম বোধ হইল, উহা সংস্কৃত বেদের সংহিতা ভাগেরই অনুরূপ। তামিল ভাষায় এবম্বিধ গ্রন্থের সদ্ভাবই তামিল ভাষাটীকে সংস্কৃত ভাষার মত প্রাচীন বলিয়া গণ্য করিবার অন্যতম হেতু। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন শৈব ও বৈষ্ণব মত বর্ত্তমান ছিল, ও সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে অন্যতমটী প্রবল হইত, দক্ষিণ দেশেও তদ্রূপ হইয়াছিল।

শঙ্কর প্রচারিত অদ্বৈতবাদ তাঁহার নিজের নহে। বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে প্রবাহিত নর্ম্মদা তটে গৌড়পাদ শিষ্য গোবিন্দপাদের নিকট শঙ্কর শিক্ষা লাভ করেন। তবে স্বদেশের প্রচলিত মত যে একেবারেই তাঁহার হৃদয় অধিকার

করে নাই, তাহাও বলা যায় না। শঙ্করের জন্মভূমি দর্শন কালে বেশ বুঝিলাম, তাঁহার দেশের প্রচলিত মত তাঁহার হৃদয়ের বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ বা সাক্ষাৎ গুরু গোবিন্দপাদের বিষয় যতটুকু জানা যায়, তাহাতে তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা যতটুকু বুঝিতেন, শঙ্কর তন্মতাবলম্বী নির্গুণ ব্রহ্ম পরায়ণ হইলেও সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বুঝিতেন। গোবিন্দপাদের অদ্বৈতানুভূতি নামক এক-খানি গ্রন্থ আছে, গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা ও সাংখ্যকারিকার ভাষ্য আছে। তাহাতে তাঁহাদের সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। শঙ্কর কিন্তু যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ও কার্য্যে যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি অধিকারী ভেদে উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। তাঁহার তীর্থে গমন ও স্নানাদি তীর্থকৃত্য, দেবদর্শন, স্তবস্তুতি পঠন, দেবতা স্থাপন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্রিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের সহিত সেব্য সেবক ভাবের উপাসনার সমাবেশ বোধ হয়, যেন তাঁহার স্বদেশের সংস্কার বশতঃই ঘটিয়াছে।

বেদমন্ত্রের সহিত ঋষিগণের যেরূপ সম্বন্ধ, দ্রাবিড় বেদের সহিত আলোয়ার-গণের তদ্রূপ সম্বন্ধ। আলোয়ারগণ দক্ষিণদেশবাসীর চক্ষে অভ্রান্ত সিদ্ধ পুরুষ বিশেষ। দ্রাবিড় বেদের নাম তামিল ভাষায় নালায়ির প্রবন্ধম্। এই তামিল বেদ আবার দুই প্রকার; এক প্রকার শৈবমতানুযায়ী ও এক প্রকার বৈষ্ণব-মতানুযায়ী। উভয় প্রকার গ্রন্থই মাদ্রাজে তামিল ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঋষিকল্প আলোয়ারগণের জীবনীও এখানে ছাপা হইয়াছে শুনিলাম। মহীশূরের পণ্ডিত গোবিন্দাচার্য্য আলোয়ারের জীবনী নামক একখানি পুস্তকে আলোয়ার-গণের বৃত্তান্ত অনেক প্রদান করিয়াছেন। এই আলোয়ারগণ শঙ্করের বহুপূর্ব্ব হইতে এবং তাঁহার পরেও বর্ত্তমান ছিলেন। যে দ্রাবিড়াচার্য্যের মত শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিও একজন আলোয়ার। আনন্দ লহরীতে তিনি যে দ্রবিড় শিশুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিও একজন শৈব আলোয়ার, তাঁহার নাম জ্ঞান সম্বন্ধ বলিয়া দক্ষিণদেশস্থ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচার। ইনি নীলকণ্ঠেরও পূর্ব্বে ছিলেন এবং এই নীলকণ্ঠ শঙ্করের সমসাময়িক বলিয়া সাধারণে বিশ্বাস করেন। ইনি বেদান্তের একজন ভাষ্যকার এবং অপ্যয় দীক্ষিত এই ভাষ্যের উপর একটী উৎকৃষ্ট টীকা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ শৈব ছিলেন, শঙ্কর-বিজয়ে শৈব নীলকণ্ঠের সহিত শঙ্করের বিচারের কথা আছে। ইহার অপর

নাম শ্রীকণ্ঠ, ইহার ভাষ্য সম্প্রতি মহীশূরের ওরিয়েণ্টেল লাইব্রেরীর কিউরেটার মহাদেব শাস্ত্রী বোম্বাইয়ের নির্ণয় সাগর প্রেসে ছাপাইতেছেন। শিশুর পর বাগীশ নামে এক শূদ্র, আলোয়ার পদবী লাভ করেন। ইনি ৬৫০—৭০০ খৃঃ অঃ সম্ভবতঃ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার পর সুন্দর মূর্ত্তি নামে এক ব্রাহ্মণও উক্ত পদবী লাভ করেন। এই ৩ জনের সংগৃহীত শ্লোকাবলীই শৈব তামিল বেদ নামে খ্যাত। নীলকণ্ঠ এই পুস্তকের আশ্রয়ে তাঁহার ভাষ্যাদি রচনা করেন। নীলকণ্ঠের মতকে সিদ্ধান্ত মত বলে। ইহার জন্য বেদান্তের নিকট তাঁহারা কোন অংশে ঋণী নহেন, এইরূপ ইহাঁদের বিশ্বাস। বেদান্ত যেমন বেদের সার, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির মত তদ্রূপ শৈব দ্রাবিড় বেদের সার।

দক্ষিণদেশবাসীর অনেকের মত, ইহা তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। পরন্তু ইহা সকলে স্বীকার করেন না, যে হেতু উপনিষদ্বিদ্যা ইহারও অনেক পূর্ব্বে এতদ্দেশে আনীত হইয়াছিল, এবং সিদ্ধান্ত মত যে উপনিষদ্-মূলক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহা প্রকৃত পক্ষে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ। নীলকণ্ঠের পর ময়কণ্ড দেবের আবির্ভাব হয়। ময়কণ্ডদেব শব্দের অর্থ যিনি সত্য পাইয়াছেন। ইনি তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ আলোয়ার পদবী লাভ করেন। ইনি নীলকণ্ঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মতের পূর্ণতা সাধন করেন। সিদ্ধান্ত মতটী ইহাঁরই সময়ে বহুল প্রচারিত হয়। ইহাঁর "শিবজ্ঞানবোধম্" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। মাদ্রাজের সালেম জেলার ডিষ্ট্রীক্ট মন্সেফ জ, ম. নালা স্বামী পিলে মহোদয় ইহার একটী ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ ময়কণ্ড দেবের সময় ১২৩৬ খৃঃ অঃ স্থির করেন। পূর্ব্বোক্ত আলোয়ার চতুষ্টয় ব্যতিরেকে আরও অনেক আলোয়ার ইহাদের পূর্ব্বে ও পরে হইয়া গিয়াছেন। শুনিলাম, এক খানি সংস্কৃত পুস্তক আছে, উহাতে ৬৩ জন শৈব আলোয়ারের জীবনী আছে। মাদ্রাজ বিভাগে আজ কাল যত শৈব মন্দির আছে, প্রায় অধিকাংশেই শুনা যায়, এই নীলকণ্ঠের মত প্রচলিত। প্রসিদ্ধ চিদম্বর মন্দির, মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর মন্দির ও তত্রস্থ শিবমন্দির এবং তাঞ্জোরের শিব মন্দিরে নীলকণ্ঠের মতেই পূজা পাঠ হইয়া থাকে। কাঞ্চীপুরীতে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত কামাক্ষী দেবীর মন্দির ও তত্রস্থ একাম্রনাথ ও কৈলাসনাথ শিব মন্দির প্রভৃতিতে শঙ্করের মতেই পূজা পাঠ হইয়া থাকে। উক্ত সিদ্ধান্ত মতের সহিত শঙ্করের মতের পার্থক্য থাকিলেও এতন্মতাবলম্বিগণ শঙ্করের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন ও তাঁহাকে গুরুবৎ পূজা করেন। নীলকণ্ঠ ও শঙ্করমতাবলম্বী শৈব ব্যতীত এদেশে

আর এক শ্রেণীর শৈব আছেন, তাঁহারা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহাঁদের মতের প্রতিষ্ঠাতা বাসবাচার্য্য। এ মতের সন্ন্যাসীদিগকে জঙ্গম বলা হয়। ইহাঁরাও ঠিক শঙ্করমতাবলম্বী না হইলেও শঙ্করকে গুরুপদে বরণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মতের প্রধান গ্রন্থ প্রভুলিঙ্গলীলা। ইহার মূল তামিল ভাষায় রচিত।

মাধবের শঙ্কর বিজয়ে উল্লেখ আছে যে, তাঁহার শঙ্কর বিজয় গ্রন্থ একখানি প্রাচীন শঙ্কর বিজয়ের সঙ্ক্ষিপ্তসার মাত্র। শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদ শঙ্করের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রাচীন শঙ্করবিজয় খানি উক্ত পদ্মপাদের বিরচিত। আমি উক্ত প্রাচীন শঙ্করবিজয় খানির সংগ্রহ মানসে আমার মাদ্রাজী পণ্ডিত বন্ধুগণকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, তাঁহারা অনেকেই উক্ত গ্রন্থের কথা জানেন এবং উক্ত পুস্তক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, পরন্ত এ পর্য্যন্ত কেহই উহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। আমার একজন মাদ্রাজী বন্ধু কিছু দিন আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন সুতরাং ইহার প্রাচীন তত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সী মহীশূর ও নিজাম রাজ্য প্রভৃতিতে শঙ্কর ও শঙ্কর-মতানুযায়ীদিগের স্থান গুলিতে দর্শনীয় বিষয়গুলি আমাকে একে একে প্রায় সমস্তই বলিয়া দিলেন।

এইরূপে জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহে আমার দুই দিন কাটিয়া গেল, পরদিন প্রাতে তিরুপতি দর্শন মানসে আমরা বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে রামানুজ স্বামীর জন্মস্থান ভূতপুরী বা শ্রীপেরম্বুদুর। সুতরাং এস্থানটী দর্শন করিয়া তিরুপতি দর্শন করাই সুবিধা ভাবিয়া, মাদ্রাজ হইতে ৬টী ষ্টেশন পরে ত্রিভেলোর ষ্টেশনে নামিলাম। ভূতপুরী ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ দিকে ১০ মাইল দূর, সুতরাং যাতায়াতের একটি ঝটকা ভাড়া করিয়া ভূতপুরীটী দর্শন করিয়া সন্ধ্যাকালে তিরুপতি অভিমুখী গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

কিছুপরেই আরকোনম জংসন, তথা হইতে মাদ্রাজ রায়চর লাইনের গাড়িতে উঠিলাম এবং ৭টী ষ্টেশন পরে রেণীগুণ্ঠার জংসনে আসিলাম। এইস্থান হইতে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে উঠিয়া পরবর্ত্তী তিরুপতি ইষ্ট নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। সে সময়ে গাড়ি ছিল না বলিয়া আমাদের একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। অতঃপর প্রায় রাত্রি ১২টার সময় আমরা উক্ত ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। তথায় একটী পাণ্ডার বাটীতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতে তিরুপতি দর্শনে বহির্গত হইলাম ও সন্ধ্যাকালে প্রত্যাগত হইলাম।

তিরুপতি উত্তর আর্কট ডিষ্ট্রীক্ট অন্তর্গত ও মাদ্রাজ হইতে ৮০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে দেবমন্দির প্রায় ৯ মাইল দূর। দুই মাইল পরেই পর্ব্বতোপরি উঠিতে হয়। সাতটী পর্ব্বতশৃঙ্গমধ্যে শ্রীবেঙ্কটরমণাচলম্ নামক শৃঙ্গে দেবমন্দির। ইহার অপর নাম বালাজী বা বেঙ্কটেশ্বর। বিষ্ণুর ৫টী প্রধান স্থানের মধ্যে ইহা একটী। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম হইতে এখানে বহু যাত্রীর আগমন হয়। যে শৈলে ইহা অবস্থিত, তাহা প্রায় ২৫০০ ফিট উচ্চ। শঙ্কর দিগ্বিজয়কালে এই স্থানে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময় ইহা শিবমন্দির বলিয়া সকলে জানিত। বস্তুতঃ ইহার মধ্যস্থ বিগ্রহটী একটী দণ্ডায়মান পুরুষবিশেষ। আকৃতি বা বেশ হইতে শিব কি বিষ্ণু স্থির করা যায় না। অবশ্য শঙ্কর ইহাকে শিবমূর্ত্তিই স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বহুদিন যাবৎ ইহা তন্মতাবলম্বিগণের একটী প্রধান স্থানরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। তাহার পর রামানুজস্বামীর অভ্যুদয়ে ইহা বিষ্ণু মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। শুনা যায়, রামানুজ এস্থানে আগমন করিয়া ইহা বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া বিবাদ করেন কিন্তু পুরোহিতগণ তাহা অগ্রাহ্য করে। তৎপরে তিনি বলিলেন যে, অদ্য মন্দিরটী বন্ধ করিয়া রাখা হউক, পর দিন প্রাতে বিগ্রহটি যে বেশে প্রতীয়মান হইবেন, তাহাতেই ইহা শিব কি বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থির হইবে। রামানুজীগণ বলেন যে, রামানুজ রজনীযোগে মন্দিরের জলনির্গমনের পথ দিয়া অণিমা সিদ্ধি দ্বারা মক্ষিকারূপ ধারণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তিরূপে সজ্জিত করেন। সুতরাং প্রাতে রামানুজেরই জয় হইল। এবং তদবধি ইহা বৈষ্ণবগণের একটী প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত। বলিতে কি, ইহা রামানুজের ৫টী প্রধান স্থানের মধ্যে একটী প্রধান স্থান। আজ কাল এখানে শঙ্করের কোন চিহ্নই নাই, কেবল প্রবাদ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়।

পরদিন আবার মাদ্রাজে রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজির মঠে আসিলাম। ভ্রমণের পর গৃহে পঁহুছিলে যে প্রকার স্বচ্ছন্দতা লাভ করা যায়, স্বামীজীর অকৃত্রিম যত্নে আমরা ততোধিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিলাম। ইতিমধ্যে স্বামীজীর নিকট একটী মালাবারী শূদ্র সন্ন্যাসীর আগমন হইল। শঙ্কর যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি সেই দেশের লোক। স্বামীজী আমার জন্য শঙ্করের জন্মস্থানের নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতেছিলেন; ইহাঁকে পাইয়া আমার সঙ্গে ইহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইনি পণ্ডিত ও ইংরাজিজ্ঞ। সুতরাং আমার বড়ই সুবিধা হইল। কথায় কথায় জানিলাম, ইনিও দক্ষিণ দেশের তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত। সুতরাং

আমরা এক সঙ্গেই যাত্রা করিব স্থির হইল। প্রথমেই আমরা কাঞ্চীপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তিরুপতির মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ কর্ণগোচর হইয়াছিল, সেটীরও উল্লেখ এস্থলে প্রয়োজন। অনেকে বলেন যে, ইহা কার্ত্তিকেয়ের বিগ্রহ এবং ইহা দক্ষিণ দেশে এক সময়ে কার্ত্তিকেয়ের উপাসকগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। শৈবগণ ইহাকে শিবমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে মূর্ত্তি দেখিয়া কিছুই স্থির হয় না।

মাদ্রাজের এগমোর ষ্টেশন হইতে কাঞ্চী অভিমুখে গাড়ী ছাড়ে। আমরা প্রাতের গাড়ীতে চড়িয়া চিঙ্গলপট জংসন হইয়া প্রায় ৯।১০টার সময় কাঞ্চী পঁহুছিলাম। কাঞ্চীপুরীর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক। ইহা সাতটী মোক্ষভূমির মধ্যে অন্যতম। বিদ্যা চর্চ্চা বিষয়ে উহা কাশীরই ঠিক নিম্ন স্থান অধিকার করে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত; একভাগে শিব কাঞ্চী, অপর ভাগে বিষ্ণু কাঞ্চী; ইহাদের ব্যবধান প্রায় দুই মাইল। শিব কাঞ্চীতে শিব মন্দির ও শৈবগণের প্রাধান্য এবং বিষ্ণু কাঞ্চীতে বিষ্ণু মন্দির ও বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য। শুনা যায়, পূর্ব্বে এখানে দশ সহস্র শিব লিঙ্গ ও এক সহস্র মন্দির ছিল। আজ কাল কিন্তু তাহার সাত ভাগের এক ভাগও নাই। কাশীর যে শ্রী অদ্যাপি বর্ত্তমান, তাহার তুলনায় ইহা আজ কিছুই নহে। প্রকৃত পক্ষে কাঞ্চীপুরী আজ একটী পল্লীগ্রাম মাত্র, সহর বা নগরের কোন লক্ষণই নাই। এখানকার প্রধান প্রধান মন্দির সমূহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে স্বতই উহার প্রাচীন গৌরবের কথা স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। এই সকল সহর ব্যতীত উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা এখানে নাই বলিলেই হয়। এখন সমুদয় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত।

শঙ্কর তাঁহার মতপ্রচারকালে কাঞ্চীপুরীকে একটী প্রচারকেন্দ্র করিয়াছিলেন; অদ্যাবধি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। ইতিহাস হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে শঙ্করের পূর্ব্ব হইতে কাঞ্চীপুরী শিবপ্রধান ক্ষেত্র ছিল, অবশ্য তাঁহার সময়ে যে ইহা তাহার চরমস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। রামানুজের আবির্ভাবে ইহাতে বৈষ্ণবপ্রাধান্য স্থাপিত হয়, এবং অদ্যাপি কাঞ্চীর বিষ্ণুমন্দিরেরই ঐশ্বর্য্য অধিক। রামানুজের প্রথম দার্শনিক জ্ঞান শিক্ষা বিষ্ণুকাঞ্চীতে হয়, এখানে বরদরাজের মন্দিরই এক মাত্র উল্লেখযোগ্য।

শিব কাঞ্চীর মন্দিরগুলির মধ্যে ছয়টী মাত্র উল্লেখযোগ্য। যথা একাম্রনাথ শিবমন্দির, কৈলাসনাথ শিবমন্দির, কামাক্ষী দেবীর মন্দির, বৈকুণ্ঠ পেরুমল বিষ্ণু

মন্দির, ত্রিবিক্রম বিষ্ণু মন্দির, এবং প্রবলবন্য পেরুমল নামক বিষ্ণুমন্দির। শুনা যায়, একাম্রনাথের মন্দিরটিই সর্ব্বপ্রাচীন, এবং মন্দিরটির গোপুর ও প্রাচীর প্রভৃতি এরূপ অসরল ও অসমকোণে সংস্থাপিত যে, বোধ হয় ইহারা কখনই একালে নির্ম্মিত হয় নাই। মন্দিরটির পশ্চাদ্ভাগে একটী অতি প্রকাণ্ড আম্র বৃক্ষ আছে, এরূপ আম্রবৃক্ষ সচরাচর দেখা যায় না। প্রবাদ যে, এই বৃক্ষতলে শিব চিরকাল অবস্থিতি করিতেছেন, ও ভক্তগণকে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছেন। মন্দিরটীর এখন সংস্কার হইতেছে এবং উহার প্রাচীন লক্ষণ সমূহও সুতরাং অন্তর্হিত হইতেছে। শঙ্কর এখানে আসিয়াছিলেন ও ঐ মন্দিরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরিচায়ক চিহ্ন এখন কিছুই নাই।

মন্দিরটী একটী চতুষ্কোণ উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটী অতি বৃহৎ গোপুর। গোপুর বলিলে সচরাচর ফটক বা প্রবেশদ্বার বুঝায়। কিন্তু দক্ষিণ দেশের মন্দিরের গোপুর বলিলে একটু অন্যরূপ বুঝিতে হইবে। ইহা একটী প্রবেশদ্বারোপরি ক্রমসূক্ষ্ম অতি উচ্চ চতুষ্কোণাকৃতি ১০।১৫ তলা নহবৎ খানার মত অট্টালিকা বিশেষ এবং ইহার গাত্রে অসংখ্য দেবলীলার নানাবিধ রঞ্জিত মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই সমস্ত মূর্ত্তি এতই সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত যে, দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া যায় না। প্রত্যেক তলাটী নীচের তলা অপেক্ষা পরিসরে ছোট, পরন্তু উচ্চতায় অল্প নহে। সুতরাং ইহা যত উচ্চ হইতেছে. ততই সরু হইতেছে। শীর্ষ প্রদেশে একটা রাক্ষসের বা ভূতের মুখের আকৃতি ; উহা যেন মুখ ব্যাদান করিয়া গোপুরটী মুখ হইতে বাহির করিয়া ভূতলে রাখিয়া দিয়াছে। এই মুখের পরিচয় স্বরূপ উপরের দন্তপংক্তি, ওষ্ঠ, নাসিকা,চক্ষুর্দ্বয় ও ভ্রূযুগল মাত্র বর্ত্তমান থাকে। ইহার উপর কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য এবং তদুপরি ৫।৭টী পিতলের কলস ঊর্দ্ধমুখে শোভা পাইতেছে। রাত্রিকালে এই গোপুরের সর্ব্বোচ্চতলাতে আলোক দেওয়া হয়। দক্ষিণের অধিকাংশ মন্দিরের এই প্রকারের গোপুর। এই গোপুর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে একটা উচ্চ বৃহৎ ধ্বজস্তম্ভ, পাথর দিয়া বাধান উঠান, এবং তন্মধ্যে আবার একটী উচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীর মধ্যে কামাক্ষীদেবীর মন্দির অবস্থিত। বামদিকের উঠানের কোণে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত উৎসব মণ্ডপ প্রায় শতাধিক স্তম্ভোপরি স্থাপিত। সম্মুখের উক্ত ধ্বজস্তম্ভ-টীকে বাম দিকে রাখিয়া একটু দক্ষিণ দিক্ দিয়া বক্রভাবে উঠানটী পার হইয়া,

দ্বিতীয় প্রাচীর বেষ্টিত মন্দিরের পূর্ব্বদিকে মন্দিরের প্রাচীর সংলগ্ন একটী প্রস্তর-ময় বৃহৎ গৃহের মধ্যে দক্ষিণমুখী দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই গৃহের মধ্যে আবার একটী ধ্বজস্তম্ভ রহিয়াছে। ইহা এই গৃহের ছাদ ভেদ করিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধে শোভা পাইতেছে। এই গৃহে প্রবেশ করিয়া এই স্তম্ভটীকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া এই গৃহসংলগ্ন উক্ত দ্বিতীয় প্রাচীরের পূর্ব্বমুখী একটী দ্বার দৃষ্ট হয়। এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া আবার একটী উঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এই উঠানের ভিতর প্রধান মন্দিরটী অবস্থিত এবং চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরের গায়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির বর্ত্তমান। উঠানে প্রবেশ করিয়াই ডানদিকে এক কোণে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ ও তাহার সম্মুখে একটী দালান। প্রায় ১০।১২টী ধাপের উপর উঠিয়া এই গৃহের সম্মুখস্থ একটী দালানের ভিতর দিয়া উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহটীর পরিসর যতটুকু, দালানের পরিসরও ততটুকু। বোধ হয়, ঘর দুটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৮।১০ হাতের অধিক হইবে না। দালান ও গৃহের ছাদটী ঠিক সমতল নহে, ইহা কতকটা মন্দিরের মত চূড়াবিশিষ্ট। উহাতে একটী গেরুয়া রঙ্গের পতাকা শোভা পাইতেছে।

এই গৃহে শঙ্করের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। একটী উচ্চ চতুষ্কোণ প্রস্তরের উপর যোগাসনস্থ উপদেশ মুদ্রা বিশিষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত শঙ্কর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির পাদদেশে শঙ্করের ছয়টী শিষ্যের মূর্ত্তি। ইঁহারা দণ্ডহস্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান। উক্ত চতুষ্কোণ প্রস্তর আসনের গাত্রে অদ্ধখোদিত এই ছয়টী মূর্ত্তি রহিয়াছে। শঙ্কর মূর্ত্তির গলায় দুই ছড়া মালা, কর্ণের অধোদেশ ছিদ্র করিয়া দুইটী মোটা গোল বলয়াকার কি এক পদার্থ ঝুলিতেছে। কপালে একটী বৃহৎ চন্দনের টিপ। কটিদেশে একখানি গেরুয়া বসন এবং দক্ষিণ হস্তের নিকট বৃদ্ধাঙ্গুলির মত মোটা ৩।৪ হাত একটী কঞ্চির দণ্ড। উহার গাঁইট গুলি বেশ উঁচু গোল করিয়া কাটা। দণ্ডটীর শীর্ষ প্রদেশে ৮।১০ অঙ্গুলি নীচে, একটী সরু গেরুয়া কাপড়ের খণ্ড ভাঁজ করিয়া কতকটা সূতার দ্বারা বাঁধা। দেখিলেই একটী কুঠারের লৌহ-ফলকের কথা মনে পড়ে। উক্ত সূতার দুইটী প্রান্তে দুইটী থোপনা বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। উহার আবার প্রায় ৬ অঙ্গুলি নীচে কতকটা গেরুয়া রঙ্গের সূতা জড়ান। শঙ্কর সম্প্রদায়ের সকল সন্ন্যাসীরই এইরূপ একটী একটী দণ্ড থাকে। এই মূর্ত্তির সম্মুখে আর একটী ঐরূপ অপেক্ষাকৃত ছোট পিতলের মূর্ত্তি রহিয়াছে। উহাকে উৎসব মূর্ত্তি বলা হয়। উৎসব কালে ঐ মূর্ত্তিটীর পূজা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এই মন্দিরটীকে ডানদিকে রাখিয়া প্রধান মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দিরটীর চূড়া প্রভৃতি অতি সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত। কিন্তু তলদেশে বিশেষ কোন কারুকার্য্য দেখা যায় না। এই মন্দিরে একটী দক্ষিণমুখী দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ইহার জানালা দরজা কিছুই নাই, সুতরাং ঘোর অন্ধকার, আলোক না জ্বালিলে এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। ঘরটীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় ৩০।৪০ হাত। এই ঘরে প্রবেশ করিয়া অদ্ধপথে বামদিকে ফিরিয়া, একটু অগ্রসর হইলে প্রধান মন্দিরগৃহের সম্মুখস্থ একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহে আসা যায়। এই গৃহের মধ্যস্থলে একটী এক বিঘত উচ্চ ৬।৭ অঙ্গুলি মোটা প্রস্তরের ঘেরার ভিতর ১ হাত ব্যাস পরিমিত একটী সমতল প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ডের উপরিভাগে একটী চক্র বা যন্ত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং উহার উপর এক পার্শ্বে কদলীদলাকৃতি একটী প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। পুরোহিতটী বলিলেন, এই যন্ত্রটী আদি শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত। ইহারই উপর সেই মহামায়া ব্রহ্মশক্তির উদ্দেশে পূজা হইয়া থাকে। চক্রের প্রস্তরখানিতে যে দাগগুলি রহিয়াছে, তাহা খুব অস্পষ্ট, এবং প্রস্তরখানি পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। এই গৃহের উত্তর ভাগে আর একটী ক্ষুদ্র গৃহ, এবং এই গৃহেই সেই দুর্গারূপী কামাক্ষীদেবী বিরাজিতা। গৃহটী অন্ধকূপ-বিশেষ হইলেও ঘৃতের প্রদীপ, কর্পূর আলোক, চন্দন কুসুম ও ধূপ ধূনা প্রভৃতির গন্ধে একটী দিব্য ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। কামাক্ষী দেবীর বিগ্রহটী বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। বলিতে কি, ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে যেন সর্ব্বস্ব ভুলিতে হইয়াছিল। পুরোহিতটী অতিশয় বৃদ্ধ, তিনি আমাদিগের হস্তে তুলসী কুসুম প্রভৃতি দিয়া স্বয়ং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ৫।৬ মিনিট পরে উহা আবৃত্তি শেষ করিয়া আমাদিগকে মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে বলিলেন। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, এস্থলে পূজা পাঠ শঙ্করের মতে হইয়া থাকে। পূজাপদ্ধতি প্রভৃতির জন্য তাঁহাদের একখানি হস্ত-লিখিত পুঁথি আছে। উহা শঙ্কর বিরচিত। আমি উহা দেখিতে চাহিলে তিনি অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, উহা একান্ত গোপনীয়। এই মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে লক্ষ্মীর একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে, এবং পশ্চিমদিকে সরস্বতী দেবীর একটী স্থান আছে। পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় প্রাচীরের কথা বলিয়াছি, এই সমস্ত মন্দিরই উক্ত প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। এই মন্দিরটী খুব নির্জ্জন ও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন্দির দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়, মধ্যাহ্নে ও গভীর রাত্রে বন্ধ

রাখা হয়। এই মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী বৃহৎ তড়াগ দৃষ্ট হয়, উহা সমুদায় পাথর দিয়া বাঁধান, জলও অন্যান্য প্রাচীন পুষ্করিণীর মত তত অপরিষ্কার নহে। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের পূর্ব্বভাগে একটী মণ্ডপ দৃষ্ট হয়, উহা অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত এবং অত্যন্ত প্রাচীন। উহার বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়; বোধ হইল, ইহা আজ কাল আর ব্যবহার করা হয় না। পুষ্করিণী, মণ্ডপ দুইটী, ও দ্বিতীয় প্রাচীর বেষ্টিত মূল মন্দির ব্যতিরেকে অনেকটা জমী বহির্দ্দেশের বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সমুদায় জমীটাই বেশ ভাল পাথরের টালির দ্বারা আবৃত এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কামাক্ষী দেবীর মন্দির ব্যতীত আর কোন মন্দিরে শঙ্করের কোন চিহ্ন নাই। কৈলাসনাথ মন্দিরটী শুনা যায় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর মন্দির। ইহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহার প্রস্তর সমুদায় কালবশে যেন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। খোদিত মূর্ত্তি বা শিল্প কার্য্যের রেখা সমুদায় মিলাইয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে প্রস্তর স্তূপ মাত্র বর্ত্তমান। এরূপ হীন অবস্থা হইলেও এখনও এখানে পূজা হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে অন্য কয়টী মন্দিরের কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

শঙ্কর প্রসঙ্গে কাঞ্চীর বিবরণ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুরই উল্লেখ এস্থলে উদ্দেশ্য সুতরাং অন্যান্য বিষয় প্রয়োজনীয় হইলেও বাহুল্য ভয়ে বর্ণন করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। এক্ষণে শঙ্কর সম্বন্ধে কতিপয় প্রবাদ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া ইহার বিষয় সমাপ্ত করিব। শুনা যায় শঙ্কর এস্থলে অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ বা জৈন প্রাধান্য নষ্ট করেন এবং এখানে মঠ প্রভৃতি স্থাপন করেন; এখানকার মঠটী হায়দার আলির কাঞ্চীপুর আক্রমণের সময় কুম্ভকোণমে উঠিয়া যায়। তাঁহারই সময় হইতে উহা দক্ষিণ দেশের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য প্রধান স্থানরূপে গণ্য হয়। অবশ্য তথায় শঙ্কর কর্ত্তৃক শ্রীচক্রটী স্থাপন সর্ব্ববাদিসম্মত বিষয়, কিন্তু কামাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অন্য কথাও আছে। কেহ কেহ বলেন, শঙ্কর এই কাঞ্চীপুরীতেই দেহ রক্ষা করেন, এবং তাহার সমাধিস্থানে পূর্ব্বোক্ত শঙ্কর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা হইয়া আসিতেছে। আনন্দ গিরির শঙ্কর বিজয়ে উক্ত হইয়াছে, শঙ্কর এই স্থানেই দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এখানকার পুরোহিত এরূপ কিছু বলিলেন না। এরূপ ভাবে শঙ্কর মূর্ত্তির স্থাপনা অন্যত্রও আছে। কাশী, শ্রীপর্ব্বত, শৃঙ্গেরী এবং আজকাল পুরীধামের গোবর্দ্ধন মঠেও শঙ্কর মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। কোন স্থলে শঙ্কর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বা পূজন দেখিয়া কেহ হয়ত সেই স্থানটী তাঁহার সমাধিস্থান মনে করিতে পারেন। পূর্ব্বে যে এরূপ প্রথা

ছিল, তাহা পূর্ব্বকালের কথা আলোচনা করিলে বুঝা যায়। শৃঙ্গেরীতে এ প্রথাটী আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে এস্থলে সে নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারেনা। যে হেতু তাঁহার মূর্ত্তি এখনও পর্য্যন্ত অনেক স্থানে দেখা যায়। মাধবের মতে শঙ্করের দেহাবসান কেদারনাথে হয়, চিদ্বিলাসের মতে শঙ্কর কৈলাসে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কিন্তু কেদারনাথে তাঁহার সমাধির কোন চিহ্ন নাই এবং সেস্থলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রবাদও নাই। বদরী নারায়ণের পথে আদবদরী নামক স্থানে তাঁহার একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু তথায়ও তাঁহার সমাধি সম্বন্ধে কোন প্রবাদ নাই। মোট কথা, কাঞ্চীতে শঙ্করের দেহাবসান আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ের সত্যতার উপর নির্ভর করে।

শঙ্কর কাঞ্চীপুরীকে শিব ও বিষ্ণু কাঞ্চীতে বিভক্ত করেন, ইহাও আনন্দগিরির শঙ্কর বিজয়ে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বিষ্ণুকাঞ্চীর স্থাপনা শঙ্করের নামে উক্ত হইলেও ইহার বিরুদ্ধে পৌরাণিক কথা বর্ত্তমান। বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দিরের গাত্রে উক্ত মন্দির সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ১১শ শতাব্দীতে কাঞ্চীর শাসনকর্ত্তা শৈব গোপালরাও নামক এক ব্যক্তি বিষ্ণুকাঞ্চীর বিষ্ণুমূর্ত্তি বরদরাজের কৃপায় পুত্রলাভ করায় একটী শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বরদরাজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উক্ত প্রবাদের অসত্যতা প্রমাণ করেনা। পৌরাণিক কথা এই, ইহা ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত। কাঞ্চীর শিলালেখ সমুদায় হইতে আর একটী কথা জানা যায় যে, ৪৮৯ খৃঃ অঃ চালুক্য বংশের প্রথম পুলকেশী কাঞ্চীপুরী জয় করিয়া সমুদয় সহরটী দগ্ধ এবং বৌদ্ধদিগকে সংহার করেন। ইহাতে বোধ হয়, শঙ্কর যদি উক্ত সময়ের পরের লোক হয়েন, তাহা হইলে বৌদ্ধনিগ্রহ তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই চলিত। সুতরাং তিনিই যে বৌদ্ধ নিগ্রহের প্রথম উদ্ভাবক, এ মত টিকিতে পারে না। অনেকের মতে শঙ্কর বৌদ্ধ বা জৈন নিগ্রহ আদপেই করেন বা করান নাই। হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান কালে রাজগণ কর্তৃক বৌদ্ধ নিগ্রহ ব্যাপার হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নামেই আরোপিত হইত। কাঞ্চীপুরী সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ভ্রমণের ভিতর লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কাঞ্চীপুরী পরিদর্শনে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে আমরা আবার ষ্টেশনে আসিলাম। চিঙ্গলপট ষ্টেশনে আসিয়া রামেশ্বরাভিমুখী ডাক

গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছু পরেই ডাক গাড়ী আসিল, আমরা সেই গাড়ীতে চড়িয়া রামেশ্বরের পথে রাত্রি ১২ টার সময় একবারে কুম্ভকোণমে আসিলাম। কুম্ভকোণমের পথে চিদম্বরম্ নামক একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল, চিদম্বরটী দর্শন করিব, কিন্তু নানা কারণে আমাদের চিদম্বরে নামা হইল না। যাহা হউক তথাপি চিদম্বরম্ সম্বন্ধে যাহা আমি জানিতে পারিলাম, তাহার উল্লেখ এস্থলে অপ্রয়োজনীয় হইবে না। চিদম্বরম্ সহরে ১৫।১৬ হাজার লোকের বসতি। এই নগরের মধ্যে চিদম্বরম্ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী অতি প্রাচীন। প্রবাদ এই—ইহা ব্রহ্মা নির্ম্মিত, মনুষ্য ইহার সংস্কারকর্ত্তা মাত্র। ব্রহ্মা ইহার প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু এই দেবমাহাত্ম্য অন্য ব্যক্তি দ্বারা জন সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ৫ম মনু রাজাসুখে বীতস্পৃহ হইলে তাঁহার পুত্র শ্বেতবর্ম্মাকে গৌড় প্রদেশ প্রদান করেন। কিছুদিন পরে শ্বেতবর্ম্মার কুষ্ঠব্যাধি হয়, তিনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে কাঞ্চীপুরীতে আসেন। তথায় একটী ব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাহার মুখে চিদম্বরমস্থ জনৈক ঋষির অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া তিনি চিদম্বরমে আসেন। ঋষিটীর নাম ব্যাঘ্রপথ। ইনি নিকটস্থ একটী অদৃশ্য দেবের উপাসনা করিতেন। শ্বেতবর্ম্মা ইহার শরণাগত হইলেন। তিনি ঋষির আদেশে নিকটস্থ একটী জলাশয়ে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইলেন ও তদবধি তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় হইল। ইহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় হওয়াতে ইহার নাম হিরণ্যবর্ণ হয়। এই হিরণ্যবর্ণ চক্রবর্ত্তী এই মন্দিরের শেষ সংস্কারকর্ত্তা। ইনিই জনসমাজে ইহার মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

প্রোফেসার ইষ্টউইক বলেন, ইহাতে ৫ম শতাব্দীরও চিহ্ন দেখা যায়। ভ্যালেনসিয়া ও ফারগুসন্ অনুমান করেন যে, ইহা রামেশ্বর বা তাঞ্জোরের মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন। মন্দিরটী অতি বৃহৎ, প্রায় ১২৭ বিঘা জমীর উপর। ইহার চতুষ্পার্শ্বের পথটী প্রায় ৬০ ফিট প্রশস্ত। দুটী প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা মন্দিরটী বেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরটী পাথরের, দ্বিতীয়টী ইষ্টকের। প্রথম প্রাচীরের প্রবেশ দ্বার মাত্র আছে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রাচীরে ৪টী অতি বৃহৎ গোপুর আছে। ইহাতে ৫টী হল বা সভাগৃহ আছে যথা, চিৎসভা, কনক সভা, দেবসভা, নিরথসভা, (ইহার অর্থ কি জানিতে পারি নাই) ও রাজসভা। এই চিৎসভাতেই দিগম্বর রূপী ভগবানের স্থান। ইহার সর্ব্বপ্রধান হলটী ১১০০ স্তম্ভোপরি বিরাজিত। একটী পুষ্করিণী আছে, তাহার

নাম শিবগঙ্গা। এখানে ৪টী কূপও আছে। চিদম্বরে প্রায় ৬৯টী ছত্র আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটী বৃহৎ, তাহাতে ৮।৯ শত লোক ধবে। এই মন্দিরে গণেশ ও বিষ্ণুর মূর্ত্তিও আছে।

বিখ্যাত ৫টী শিবলিঙ্গ মধ্যে চিদম্বরের আকাশলিঙ্গটী অন্যতম। এখানে লিঙ্গ নাই। দেবতাস্থানোপরি শূন্য আকাশ মাত্র বর্ত্তমান। সম্মুখের দেয়ালে একটী পরদা টাঙ্গান আছে, তদুপরি 'আকাশলিঙ্গ' এই কথাটী লেখা আছে। দর্শকের আগমনে এই পরদাটী তুলিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যাপারটী চিদম্বর-রহস্য নামে কথিত হয়।

যাঁহারা এই মন্দিরের পূজা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলে। পূর্ব্বে এস্থলে তিন সহস্র দীক্ষিতব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কথিত আছে, কোন সময়ে ব্রহ্মা কাশীধামে একটী যজ্ঞ উদ্দেশে ইহাদিগকে তথায় লইয়া যান। চিদম্বর দেবের আজ্ঞায় হিরণ্যবর্ণ ইহাদিগকে কাশীধাম হইতে পুনরায় আনয়ন করেন।* ইহাঁরা বলেন যে, ইহাঁরা সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে উৎপন্ন এবং ইহাদের সমাজ অন্য দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পৃথক্। ইহাঁদের উপজীবিকা চিদম্বরের পাণ্ডাবৃত্তি অথবা ভিক্ষাবৃত্তি। ২০ জন করিয়া ব্রাহ্মণের ২০দিনের জন্য পালা পড়ে এবং দেবোদ্দেশ্যে ভক্তগণ কর্ত্তৃক যাহা যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা ইহারা ভাগ করিয়া লন। বিবাহিত না হইলে ইহাদের পূজার অধিকার হয় না, সুতরাং ১।৬ বৎসরেই ইহাঁ-দের বিবাহ হয়। ইহাদের বেশের একটু বৈচিত্র্য আছে। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ মাথায় যেরূপ চুল রাখেন, ইহাঁরা সেরূপ রাখেন না। ইহাঁরা মালাবার দেশীয় ব্রাহ্মণগণের মত মস্তকের সম্মুখ ভাগে মাত্র কতকগুলি বড় বড় চুল স্ত্রীলোকের মতন রাখেন, এবং ঘাড় ও জুল্পী ক্ষৌরি করেন। এরূপ ভাবের চুল দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহাঁরা বোধ হয় মালাবার হইতে আসিয়া এখানে বসতি করিয়াছেন। পরন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রবাদ বা কোন প্রমাণই নাই।

আনন্দ গিরির শঙ্কর বিজয়ে উক্ত হইয়াছে, শঙ্করের জন্মস্থান চিদম্বর এবং প্রবাদ আছে যে, পরে তিনি মালাবার দেশে বাস করেন। পরন্তু চিদম্বর পুরীতে ইহার জন্মস্থানের আজ কাল কোন চিহ্ন নাই। যদিও এ প্রদেশে শঙ্করের জন্মস্থানের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন নাই এবং মালাবার দেশে যদিও অদ্যাবধি তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তথাপি চিদম্বরের উক্ত দীক্ষিত ব্রাহ্মণ কুলের সহিত শঙ্করের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা অনুসন্ধানের বিষয়। অবশ্য

আমি যতদূর জানিলাম, তাহাতে আদি শঙ্কর সম্বন্ধে এ প্রবাদের বা আনন্দ গিরির উক্তির কোন সত্যতা নাই। আমার বোধ হইল, ইহা কোন মঠাধিপতি প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের জন্ম কথা হইবে। আনন্দ গিরির শঙ্কর বিজয় যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে বোধ হয় ইহার গ্রন্থকর্ত্তা কুম্ভকোনম মঠাধিপতি কোন এক প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের সহিত আদি শঙ্করাচার্য্যের ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং এরূপ ভুল করিবার প্রথম হেতু বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য উভয় গ্রন্থকর্ত্তার বহুপূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২য়, ইহাঁদের ইতিহাস লিখিবার প্রথা ছিল না। ৩য়, এক নাম ধারী দুই ব্যক্তি কোন মতস্থাপনোদ্দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিলে কালবশে সাধারণতঃ উভয়ের পার্থক্য বিস্মৃত হইতে হয়। ৪র্থ, আনন্দ গিরির শঙ্কর বিজয়, শঙ্কর শিষ্য আনন্দ গিরি বিরচিত নহে। ইহার গ্রন্থকর্ত্তা অনন্তানন্দ গিরি নামক কোন আধুনিক ব্যক্তি। যাহাহউক আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর বিজয়ের বিচারে এখন ক্ষান্ত হওয়া প্রয়োজন, যেহেতু এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। আনন্দ গিরির মতে চিদম্বরে শঙ্করের জন্ম উল্লেখ আছে মাত্র, তথায় তাঁহার জীবনের আর কোন ঘটনা সংঘটনের কথা লিখিত নাই। অধিক কি, শঙ্কর দিগ্বিজয় কালেও এস্থানে আসিয়াছিলেন কি না তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু চিদম্বরে শঙ্করের আগমনের প্রবাদ অদ্যাপিও বর্ত্তমান এবং সম্ভবতঃ এই প্রবাদের মূল চিদ্বিলাস যতি প্রণীত শঙ্কর বিজয় বিলাস নামক গ্রন্থখানি। যাহা হউক, চিদম্বরে শঙ্কর সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা জানিতে পারিলাম না, অধিক কি অনুসন্ধানে যে কিছু জানা যাইতে পারে, তাহারও আশা বড় কম। এক্ষণে কুম্ভকোনমে শঙ্কর সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহা লিপিবদ্ধ করা যাউক।

ক্রমশঃ

খেতড়িরাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ।

(শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।)

১৮৯১ সালে স্বামীজি রাজপুতানায় আবু নামক পাহাড়ে তাঁহার একজন উকীল বন্ধুর নিকট আছেন, এমন সময় তাঁহার একজন ভক্ত খেতড়ির মহারাজের সচিব মনসী জগমোহন লালজিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। জগমোহন লাল দেখিলেন, স্বামীজি একটী কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। জগমোহন লাল একজন ইংরাজী শিক্ষিত যুবা, গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীরা সব চোর বদমায়েস, এই বিশ্বাস। নিদ্রা ভাঙ্গিলে স্বামীজি জগমোহনের সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা কহিলেন, জগমোহনের কুসংস্কার ঘুচিল, প্রবল বাসনা হইল, স্বামীজির সহিত তাঁহার প্রভুরও পরিচয় করিয়া দেন। স্বামীজির কাছে খেতড়ির মহারাজের সহিত আলাপ করিবার প্রস্তাব করিলে স্বামীজি সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "আগামী পরশ্ব যাইয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।" জগমোহন আপনার প্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে মহারাজ স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমি যাইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিব।" স্বামীজি ইহা শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া স্বয়ং তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "Swamiji what is life জীবনটা কি?" স্বামীজি উত্তর করিলেন, Life is the tendency of the unfolding and development of a being under circumstances tending to press it down. অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন আর কতকগুলি শক্তি যেন উঁহাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহকে পরাস্ত করিয়া নিজ শক্তি প্রকাশের অবিরত চেষ্টার নামই জীবন।

এইরূপ নানা প্রশ্নোত্তরে মহারাজ স্বামীজির প্রত্যুৎপন্নমতি এবং বিজ্ঞতার পরিচয় পাইলেন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তাঁহার প্রাণের মধ্যে যত প্রকার প্রশ্ন উদয় হইল, তিনি সমস্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজিও প্রীত হইয়া তাহার উত্তর দিলেন। খেতড়িরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "Swamiji, what is education ?" রাজার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে স্বামীজি উত্তর করিলেন, "Education is the nervous association of certain ideas," এই কথা বলিয়া আবার বুঝাইয়া বলিলেন, শিক্ষাটী সংস্কারে পরিণত হইয়া ধমনীগত হইলে তবে তাহাকে শিক্ষা অর্থাৎ education বলে। অগ্নির দাহিকাশক্তি যতক্ষণ আমরা উপলব্ধি না করি, ঐ জ্ঞান যতক্ষণ না আমাদের ধমনী ও মজ্জাগত হয়, ততক্ষণ আগুণের জ্ঞান জন্মায় না। ন্যায় বিজ্ঞান কতকগুলো মুখস্থ করিলেই শিক্ষা হয় না। যাহা জীবনের সঙ্গে মিশে যায়, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। পরমহংসদেবের যেমন কাঞ্চন ত্যাগ, নিদ্রাবস্থায়ও তাঁর অঙ্গে কাঞ্চন স্পর্শ করাইলে অঙ্গের বিকৃতি উপস্থিত হইত। এই প্রকার সংস্কারগত যাহা হয়, তাহাই প্রকৃত Education—শিক্ষা। রাজার প্রশ্ন স্বামীজি এই প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিয়া বুঝাইয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। রাজা পরম প্রীতি লাভ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আপন রাজ্যে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন ; স্বামীজিও তাঁহার সহিত খেতড়ি যাইতে সম্মত হইলেন। জয়পুর পর্য্যন্ত ট্রেনে এবং তথা হইতে রথে চড়িয়া প্রায় ৯০ মাইল গিয়া খেতড়ি পৌছিলেন। মহারাজ স্বামীজিকে পাইয়া পরম আহ্লাদে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "স্বামীজি মহারাজ, সত্য কাহাকে বলে, what is truth ?" স্বামীজি উত্তর করিলেন, "Truth is one absolute, man travels from truth to truth and not from error to truth—মানুষ আজ যাহা সত্য বলিয়া অবলম্বন করে, জ্ঞান বাড়্‌লে তাহা ছাড়িয়া অপর সত্য অবলম্বন করে। যেটী ত্যাগ করে, সেটী মিথ্যা নয়, যেটী নূতন ধরে, সেইটী উচ্চতর মাত্র। যাহা absolute truth, তাহার এ অবস্থায় উপলব্ধি হয় না। কিন্তু তাহার উপলব্ধি হইলে relative truth (আপেক্ষিক সত্যের জ্ঞান) সকল আর থাকে না।"

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ প্রায়ই হইত। রাজা একদিন science পড়িবার প্রস্তাব করিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে science primer সকল আনাইয়া পড়াইতে লাগিলেন ; ক্রমে একজন বিএ ফেল যুবাকে আনাইয়া মহারাজকে science পড়াই-

বার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার বিজ্ঞানের যন্ত্রাদিও আনাইতে লাগিলেন। এই সময়ে পণ্ডিত নারায়ণ দাস নামক একজন বৈয়াকরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি রাজপুতানায় ব্যাকরণের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। স্বামীজি তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার নিকট মহাভাষ্য পাঠ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় স্বামীজিকে প্রথমদিন পড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপ্‌কা মাফিক বিদ্যার্থী মিল্‌না মুস্কিল্।" পণ্ডিত মহাশয় একদিন একটু বেশী করিয়া পড়াইলেন। পর দিন তিনি স্বামীজিকে সেই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিলে স্বামীজি সমস্ত আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় কিছু আশ্চর্য্য হইয়া আরও অধিক অধিক পড়াইতে লাগিলেন। স্বামীজি কিন্তু যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বৈয়াকরণ তাহার উত্তর করিতে না পারায় স্বামীজি দিন কয়েক বাদে ভাবিলেন যে, পণ্ডিতজির নিকট প্রকৃত কিছুই শিখিতে পাইতেছেন না এবং পণ্ডিতজিও স্বামীজি আপনি প্রশ্ন তুলিয়া আপনিই মীমাংসা করিতেছেন দেখিয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনাকে শিখাইবার আর কিছু নাই।

স্বামীজি যখন কোন পুস্তক পাঠ করিতেন, তিনি পুস্তকের দিকে চাহিয়া সত্বর পাতা উলটাইয়া যাইতেন। মহারাজ তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজি, এত শীঘ্র কি প্রকারে পড়েন?" স্বামীজি বলিলেন, "বালক যখন প্রথম পড়ে, সে এক একটী অক্ষর দুবার তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিয়া তৎপরে শব্দটী উচ্চারণ করে, এসময়ে তাহার দৃষ্টি এক একটী অক্ষরের উপর থাকে। কিন্তু যখন আরও বেশী শিক্ষা করে, তখন আর অক্ষরের উপর নজর না পড়িয়া এক একটী শব্দের উপর পড়ে এবং অক্ষরের উপলব্ধি না করিয়া একেবারে শব্দের উপলব্ধি করে, যখন আরও অগ্রসর হয়, তখন একেবারে একএকটী sentence এর উপর নজর পড়ে ও তাহারই উপলব্ধি করে; এই উপলব্ধি আরও বাড়াইয়া দিলে একটী পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠার উপলব্ধি হয়। কেবল মনঃসংযম, সাধনা। আপনিও চেষ্টা করুন, আপনারও হবে।"

সৎচর্চ্চা সর্ব্বদাই হইতেছে, কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ আর একদিন প্রশ্ন করেন, "স্বামীজি মহারাজ, নিয়ম কি? what is law?"

স্বামীজি। There is no law in the external world. Law is the mode in which the mind grasps a series of phenomena—বাহ্য জগতে নিয়ম কিছুই নাই, তবে কতকগুলি ঘটনা পরম্পরার উপলব্ধি আমাদের মনে যে প্রকারে হয়, তাহারই নাম নিয়ম অথবা Law, যেমন আলোকের পর-

মাণু চক্ষের উপর প্রতিবিম্বিত হইল, চক্ষু আবার উহাব অভ্যন্তরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়ের নিকট উহাকে প্রেরণ করিল, পরে ইন্দ্রিয় মনকে, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে, বুদ্ধি অহঙ্কারকে, অহঙ্কার পুরুষকে উহা পাঠাইল, তৎপরে পুরুষের যেন আজ্ঞাক্রমে আবার সেই ক্রিয়াটী ফিরিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত আসিলে তবে বাহ্য বস্তুর বা আলোকের উপলব্ধি হয়। এই process অর্থাৎ প্রক্রিয়া একটী নিয়ম বা Law; ইহা অন্তর্জগতের নিয়ম।

মহারাজ প্রত্যহ রাত্রি দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বামীজির নিকট আসিয়া অতি সাবধানে তাঁহার পদসেবা করিতেন, পাছে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। দিবাভাগে পদসেবা স্বামীজি করিতে দিতেন না, সকলের সমক্ষে মহারাজকে পদসেবা করিতে দিলে মহারাজকে বড় হাল্‌কা করা হয় এই জন্য। মহারাজ এত সেবা করিয়াও তখন স্বামীজির পরিচয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারেন নাই। একদিন মহারাজ নিঃসন্তান বলিয়া আপন মনোবেদনা স্বামীজিকে জানাইয়া বলেন, "স্বামীজি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যে, আমার একটী পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলেই আমার নিশ্চয় পুত্র সন্তান হবে।" ব্যাকুল দেখিয়া স্বামীজি সেইমত আশীর্ব্বাদ করেন, এবং তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। এখানে তাঁহার প্রায় দুইমাস থাকা হয়।)

এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে খেতড়ির মহারাজের একটী পুত্র সন্তান জন্মায়। মহারাজের বড় আনন্দ, তাঁহার ইচ্ছা,—স্বামীজিকে আনাইয়া উৎসব করেন। এই মানসে তাঁহার প্রিয় সচিবকে ডাকিয়া কহিলেন, "জগ্‌মোহন, স্বামীজিকে না আনিতে পারিলে সমস্তই বৃথা হবে। তাঁহারই আশীর্ব্বাদে এই বংশধর জন্মিয়াছে, অতএব যাহাতে তাঁহাকে এখানে আনিতে পার, তাহার উপায় কর।" সচিব প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া একেবারে মান্দ্রাজ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জানা ছিল, স্বামীজি মান্দ্রাজে আছেন। মান্দ্রাজ সহরে যাইয়া কোন্ ঠিকানায় আছেন, জানিবার চেষ্টা করিতে করিতে সন্ধান পাইলেন যে, স্বামীজি শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য assistant accountant general এর বাটী আছেন। সচিব তথায় যাইয়া ভৃত্যদের জিজ্ঞাসিলেন, স্বামীজি কোথায়। তাহারা তাঁহাকে জানাইল যে, স্বামীজি সমুদ্রে গেছেন। জগ্‌মোহনের ভয় হইল, হয়ত স্বামীজি বিলাত যাইবার জন্য জাহাজে উঠিয়াছেন; তাহা হইলে সমস্তই বিফল হইবে। এই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক স্থানে রক্ষিত গেরুয়া কাপড়ের উপর তাঁহার নজর পড়িল; তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার

গুরুদেব সেই খানেই আছেন। মান্দ্রাজি চাকরের ভাষা জানা না থাকায় তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ হইল; স্বামীজি এবং মন্মথ বাবু একখানি গাড়ী করিয়া সমুদ্রের কিনারায় বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীজি গাড়ী হইতে নামিবামাত্র জগ্‌মোহন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জগ্‌মোহন তাঁহার প্রভুর বাসনা জানাইলে স্বামীজি কহিলেন, "জগ্‌মোহন, আমাকে বিলেত যাবার সব বন্দোবস্ত করে নিতে হচ্ছে, এখন তোমার মহারাজের কাছে যাই কেমন করে?" জগ্‌মোহন ছাড়িলেন না, বলিলেন, তাঁহাকে যাইতেই হইবে; বিলাত যাবার বন্দোবস্ত তিনিই করিয়া দিবেন, এজন্য স্বামীজিকে নিশ্চিন্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন। স্বামীজি তাঁহার মান্দ্রাজি ভক্তগণের সহিত জগ্‌মোহনের পরিচয় করিয়া দিলেন। দিনকতকের মধ্যে স্বামীজির খেতড়ি যাইবার বন্দোবস্ত হইল, মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তাঁহাকে অতি দুঃখিত অন্তরে বিদায় দিলেন। একখানি প্রথম-শ্রেণী রিজার্ভ করিয়া জগ্‌মোহন স্বামীজিকে লইয়া চলিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়াছে, খেতড়ির মহারাজের প্রাসাদে বড় ধুম। প্রাসাদের মধ্যে একটী সুসজ্জিত পুষ্করিণীতে ফল ফুল মণি মুক্তায় শোভিত একখানি নৌকায় মহারাজ বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে সঙ্গীত হইতেছে, অমাত্য-পরিবেষ্টিত রাজপুতানার রাজন্যগণ উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। আজ তিন চার দিন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, অনেক রাজা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত এবং আনন্দের স্রোত চলিতেছে—জগ্‌-মোহন স্বামীজিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সত্বর আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজি তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া উপযুক্ত আসনে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। খেতড়ির মহারাজ বিবেকানন্দের সহিত উপস্থিত অন্যান্য সকলের পরিচয় করিয়া দিলেন এবং আমেরিকায় যাইয়া চিকাগো ধর্ম্ম মহা সমিতিতে উপস্থিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল বুঝাইতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে আমেরিকায় যাইবার জন্য জাহাজে উঠিবার দিন নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মহারাজ স্বয়ং জয়পুর পর্য্যন্ত আসিয়া একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ করিয়া তাহাতে উঠাইয়া বিদায় লইলেন এবং নিজ সচিব জগ্‌মোহনকে বোম্বাই

পর্য্যন্ত যাইয়া স্বামীজির সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। আবুরোড ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার এক ভক্ত রেল কর্ম্মচারীর আবাসে সেই রাত্রি রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে স্বামীজির দুই জন গুরুভাই পীড়িত হওয়ায় স্বামীজি তাঁহাদের এই স্থান হইতে ১০ মাইল দূরে আবুপর্ব্বতে খেতড়ির গ্রীষ্মাবাসে রাখিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সংবাদ পাঠান, তাঁহাদের এক-জন যথাসময়ে আসিলেন। তিনি, জগ্‌মোহন ও ভক্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী এক সঙ্গে পুনরায় বোম্বাই যাইবার গাড়ীতে উঠিলেন।

ষ্টেশনে স্বামীজির ভক্ত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক স্বামীজির সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ টিকিট কালেক্টার আসিয়া সেই ভদ্রলোককে গাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভদ্রলোকটী তত্রাচ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সাহেবের কথা গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া সাহেব একটু গরম হইয়া রেলের আইনের দোহাই দিয়া পুনরায় তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে বলিলেন। ইনিও রেলওয়ের কর্ম্মচারী, ইঁহারও আইন জানা ছিল। ইনি বলিলেন, এমন কোন আইন নাই, যাহার দ্বারা তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য; সুতরাং দুই জনে বেশ বচসা আরম্ভ হইল। স্বামীজি তাঁহার ভক্তটীকে পুনঃ পুনঃ ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া স্বামীজি তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় গৌরাঙ্গ হঠাৎ স্বামীজিকে "তুম্ কাহে বাৎ করতে হো?" বলিয়া ধমক দিলেন। গৈরিকধারী সামান্য সন্ন্যাসী ভাবিয়া সাহেব বোধ হয় ধমকাইয়াছিলেন। রেলে কত গেরুয়া পরা সাধু যাতায়াত করেন, সাহেবদের গুঁতা গাঁতা খাইয়াও নিঃশব্দে চলিয়া যান, কাজেই গৌরাঙ্গ ইহাঁকেও তদ্রূপ একজন ভাবিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গদর্শনে আবালবৃদ্ধবনিতা কে না ভীত হয়? কে না একটু সঙ্কুচিত হয়? গৌরা-ঙ্গেরাও এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র দেশীলোকের মধ্যে এই ভাবটা দেখিয়া বুক বিশ হাত লম্বা করিয়া কালা আদমিকে মানুষ জ্ঞান আর করেন না, আর এতে মজা ও আনন্দও পান। আসুরিক ভাবের লোক, আনন্দ পাবারই কথা। যাহা হউক, সাহেব এবার যে সিংহের সঙ্গে লাগিয়াছেন, তাহা জানিতেন না। স্বামীজি চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিলেন, "What do you mean by তুম্? Can you not behave properly? You are attending 1st and 2nd class pas-sengers and you do not know manners? Can't you say আপ and

speak like a gentleman." সাহেব উত্তর করিল, "I am sorry I don't know the language well, I only wanted this man......" স্বামীজি এইবারে আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "You brute, you said you didn't know the vernacular, and now you don't know English your own language even ! Can't you say this gentleman, you beast. Give me your name and number, I am bent on reporting your behaviour to the authorities."

একটা মহা গোলমাল পড়ে গেল, অনেক লোক জড় হয়ে গেছে ; স্বামীজির দাবড়ানিতে গৌরাঙ্গজি কেঁচপ্রায়, কোন উত্তর আর দেন না, পাশ কাটাবার চেষ্টা। স্বামীজি পুনরায় কহিলেন, "I give the last alternative, either give me your name and number, or be the worst coward before the public."

সাহেবজি ঘাড় হেঁট করিয়া সরিয়া পড়িলেন ; গাড়ী ছাড়িয়া গেল। মুন্‌শিজী ও স্বামীজি একখানি ফার্ষ্ট ক্লাশ গাড়ীতে। এইবার স্বামীজি জগ্‌মোহনকে দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া আমাদের গৌরাঙ্গ সমক্ষে আত্মমর্য্যাদা অভাবের উপর বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। জগ্‌মোহন মহা অপরাধীর ন্যায় অধোবদনে শুনিতে লাগিলেন। স্বামীজি বলিলেন, "জগ্‌মোহন, হিন্দুরা কত শত সহস্র গুণে অন্য জাতি অপেক্ষা উচ্চ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট, কেবল ধর্ম্মশিক্ষার অপচারেই আপনাকে সকল অপেক্ষা হীন ভাবে, তাই জন্যে জুতোর ঠোক্কোর খেয়ে ঝেড়ে ফেলে।"

বোম্বাই আসিয়া মুন্‌শিজী সমস্ত জিনিষ পত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দুই চার দিন পরে স্বামীজিকে জাহাজে চড়াইয়া দিতে গেলেন। সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকও দুই এক জন গেলেন। স্বামীজি আপনার নির্দ্দিষ্ট একটী ফার্ষ্ট ক্লাস কেবিনে যাইয়া আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি জগ্‌মোহন কি প্রকার সাজাইয়াছেন দেখিয়া লইলেন। একজন শ্বেতাঙ্গ দ্বারে হাজির, স্বামীজির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। আহারের জন্য ঘণ্টা বাজিল, সকলে আহার করিতে গেলেন। স্বামীজি বলিলেন, "জগ্‌মোহন, আমরা যে যেমন লোক, তার সঙ্গে সেই প্রকার ব্যবহার করিনি, তাই ওরাও পেয়ে বসে ; এই যে গৌরাঙ্গটী দেখ্‌ছ, এ আমার হুকুম শুনবে বলে হাজির। এখন সব গৌরাঙ্গই এক রকম ঢোলের, কেহবা এসে এর সঙ্গে যেন মনিবের মত আপনি হুজুর করবে। তা নয়, ও গোলাম। গোলামের মত ওকে খাটিয়ে নিতে হবে, দাবে রাখ্‌তে হবে, রাস্ ভারি হতে হবে ; তোমরা

রাস হালকা করে ফেল, সেই হয় দোষ। তুমি দেখ্‌বে, আমি কেমন রাস ভারি হয়ে ওকে দাবিয়ে নেবো, বাছাধন কেঁচ হয়ে থাক্‌বে।"

জাহাজের সকল শ্বেতাঙ্গ এক টেবিলে বসে ভোজন, তাহার মাঝখানে স্বামীজি সুন্দর গেরুয়া পরা, মাথায় পাগ্‌ড়ী। জগ্‌মোহন ভাবিলেন, স্বামীজি যেন রাজশোভা ধারণ করে বসেছেন। আহারান্তে পুনরায় ঘণ্টা পড়িল। যাঁহারা বন্ধুগণকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। জগ্‌মোহন সকলের শেষে কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, অমনি জাহাজ খুলিয়া গেল। স্বামীজি ইঙ্গিতে বিদায় লইলেন, জগমোহনের চক্ষু দুইটী যতক্ষণ তাঁহার গুরুকে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ইহুদীজাতির ইতিহাস।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

রোমান রাজত্বের অবনতির পর মহম্মদ আরবরাজ্য স্থাপন করেন। মক্কা ও মেদিনার নিকটবর্ত্তী ইহুদীরা মহম্মদ ও তাঁহার অনুচরবর্গের উপর বিশেষ অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মের নানা প্রকার নিন্দা করিত এবং মহম্মদ ইহুদীধর্ম্মের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন ও জেরুসালেমের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিতেন বলিয়া বলিত, ইনি আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া পরিচয় দেন, কার্য্যে কিন্তু তিনি আমাদের ধর্ম্মের অনুকরণ করিতেছেন মাত্র। যাহা হউক, অবশেষে অত্যাচার চরম মাত্রায় উঠিল। কতকগুলি পাষণ্ড ইহুদী এক মুসলমান কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। ইহাতে সমগ্র মুসলমান সমাজ ইহুদীদিগের প্রতি চিরবিদ্বেষসম্পন্ন হয়। মহম্মদও একদিন পূর্ব্ববৎ জেরুসালেমের দিকে ফিরিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে হঠাৎ মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন। আবুবক্কর, ওমর, ওসমান ও আলি নামক মহম্মদের চারিজন অন্তরঙ্গ তাঁহার হৃদগত ভাব অবগত ছিলেন—তাঁহারাও মহম্মদের অনুসরণ করিলেন। যে দিন তিনি এইরূপ করেন, সেই দিনকে মুসলমানগণ দ্বি-কিবলা নামে অভিহিত করেন।

ওমরের অধিকারকালে খালিদ জেরুসালেম জয় করিতে যান। টাইটাস

যদিও বহুসংখ্যক ইহুদীকে জেরুসালেম হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তথাপি তথায় অনেক ইহুদী বাস করিত। খালিদ জৈতুন পর্ব্বত হইতে ক্যাটাপিল (প্রস্তরনিক্ষেপনী যন্ত্র বিশেষ) সাহায্যে বৃহদাকার প্রস্তর সকল নিক্ষেপ করিয়া পুনর্নির্ম্মিত জেরুসালেম সহরকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। তদবধি ইহুদীরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া নানাদেশে বাস করিতেছে।

ইহুদীরা পূর্ব্বে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এখন কেবল দুইটী শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—কোহেন ও লিভি। কোহেন জাতি সম্ভবতঃ মুশার ভ্রাতা এরণের (হারুণ) বংশোদ্ভব। লিভিরা ইহুদীদিগের যাজক। অবশিষ্ট দশটী শ্রেণীর কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না—সম্ভবতঃ তাহারা খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইয়াছে।

অদ্যাপি ইহুদীরা ভোজনের পূর্ব্বে পিরানের ভিতর হইতে মালার ন্যায় ১২টী ঝালর বিশিষ্ট (প্রত্যেকটীতে গাঁট দেওয়া আছে) একটী সুতা বাহির করিয়া তাহাদের প্রাচীন দ্বাদশশাখার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া পরে ভোজন করে। প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক, ইহুদীরা অপর জাতির প্রস্তুত কোনও দ্রব্যাদি আহার করে না—ইহা তাহাদের শাস্ত্রনিষিদ্ধ। লণ্ডনে যে সকল ইহুদীর বাস, তাহারাও অনেকে এই নিয়ম মানিয়া থাকে। ইহাদের সকল খাদ্য কাসের (শাস্ত্রবিহিত শুদ্ধ) হওয়া আবশ্যক।

ভগবান্ ঈশার জন্মগ্রহণের কিছু পূর্ব্বে ইহুদীরা পৃথিবীর নানাস্থানে বাণিজ্যার্থে গমন করে। এই সময়ে অনেকে স্পেনে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারা ভগবান্ ঈশার হত্যাপাপে লিপ্ত হয় নাই। ইহারা সেপার্ডি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্পেন একজাতি হইতে অপর জাতির হস্তে যাইতে লাগিল। প্রথমে উহা ফিনিকিয়ানদের হস্তে ছিল—ক্রমে রোমকদের হস্তে গেল। অবশেষে আরব সেনাপতি জেবল উল তরীথ (যাঁহার নাম হইতে জিব্রাল্টর নাম হইয়াছে) খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে স্পেনদেশ আক্রমণ করিয়া মুররাজ্য (মগ্ রবি বা পশ্চিম আরব) স্থাপন করেন। আরবরাজ্য অল্পদিনের মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—স্পেন বা আন্দুলিস (Andulasia) স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে নানাবিধ ঔষধ শিক্ষা করিয়া আসিয়া স্পেনবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল। ইহুদীরা মুরদিগের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া নানাদেশে চিকিৎসা করিতে লাগিল। এইরূপে উক্ত চিকিৎসাবিদ্যার বিস্তার হইতে

লাগিল। ইউরোপ সাক্ষাৎ ভাবে ইহুদীদিগের নিকট ও গৌণভাবে ভারতবর্ষের নিকট এই চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে ঋণী।

ইউরোপ ইহুদীদের নিকট আর একটী বিষয় শিক্ষা করে। দশমিকগণনা পূর্ব্বে একমাত্র ভারতেই প্রচলিত ছিল। ইহুদীরা চিকিৎসা বিদ্যার ন্যায় ইহাও আরবদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া ইউরোপে প্রচার করেন। সাধারণ ইংরাজী পুস্তকে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০ ইত্যাদি ক্রমে গণনাকে Arabic notation ও I, II ইত্যাদি যেমন ঘড়িতে থাকে, তাহাকে Roman notation বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশে শেষোক্তরূপ সংখ্যাগণনার প্রণালী প্রচলিত ছিল।

ইহুদীরা বহুকাল স্পেনদেশে নিরাপদে বাস করে। অবশেষে টর্কুইহামা নামে একজন খ্রীষ্টিয়ান Court of Inquisition স্থাপন করিয়া ইহুদীদিগের উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদিগকে স্পেন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। অল্পসংখ্যক ইহুদী খৃষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এখানে বাস করিতে লাগিল। বিখ্যাত রাজনৈতিক ডিস্রায়েলির পূর্ব্ব পুরুষ ইহাদের অন্যতম। তদানীন্তন তুরস্কের সুলতান আবদুল আজিজ অতি দয়ালুস্বভাব ছিলেন। তিনি বিতাড়িত নিরাশ্রয় ইহুদীদিগকে কনষ্টাণ্টি-নোপলে বাস করিতে আজ্ঞা দেন। এখনও এখানকার খাসকুই নামক পাড়াতে বহুসংখ্যক ইহুদী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইহাদের বিশেষ নাম মোসাফির (বিদেশী)। যদিও ইহারা অনেক দিন যাবৎ তুর্কিরাজধানীতে বাস করিতেছে ও তুর্কি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, কিন্তু আপনাদের ভিতর স্প্যানিশ ভাষা কহিয়া থাকে। ইহারা জেরুসালেমকে প্রধান তীর্থস্থান ও স্পেনের গেভিজ সহরকে দ্বিতীয় তীর্থস্থান বলিয়া মানিয়া থাকে।

ইংলণ্ড হইতে ইহুদীরা প্রথম এডওয়ার্ডের সময় বিতাড়িত হইয়াছিল ও ক্রম-ওয়েলের অধিকার কালে পুনরায় বাসের অনুমতি পায়। ফ্রান্সদেশ হইতেও ইহারা এক সময় বিতাড়িত হয় এবং নেপোলিয়নের সময় পুনরায় বাস করিবার অনুমতি পায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রুসের সম্রাট্ তৃতীয় আলেক্জাণ্ডার ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। সম্প্রতি রুমানিয়া প্রদেশেও এরূপ করিতেছে।

জেরুসালেমের শেষ আদমসুমারিতে জানা যায়, তথায় এখন নানাদেশীয় ইহুদীর সংখ্যা ৬০০০০, খ্রীষ্টিয়ান ৭০০০০ ও মুসলমান ৫০০০।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, নিনিভাতে বাসকালে আব্রাহাম জরথুস্ত্রের অনেক

ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রণালী কিছুকাল চলে। মুশা মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অনেক নূতন নিয়ম প্রচলিত করেন। মুশা দশ বিধি দ্বারা কতকগুলি অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয়, সে সময়ে তাহাদের মধ্যে এই সকল অসৎকার্য্য বহুপরিমাণে অনুষ্ঠিত হইত। ইহুদীরা যে মূর্ত্তিপূজা করিত, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মুশা প্রভৃতির ধর্ম্মপুস্তকে পুনর্জ্জন্মবাদ বা সন্ন্যাসাশ্রমের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। জনৈক বন্ধু এক সময় আমায় কহেন যে, মুশার গ্রন্থে না থাকিলেও তালমুদে (ইহুদীদিগের ধর্ম্মবিধানগ্রন্থ) জেরিমায়া ঐ সকল সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। জেরিমায়া ঈশার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্রাট অশোক বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষুকে প্রচারোদ্দেশে প্যালেষ্টাইনে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্রবে আসিয়াই বোধ হয় ইহুদীরা অনেকে পুনর্জ্জন্মবাদ (আল তনস্থ) অবলম্বন করিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

জীবন সংগ্রাম

ও

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন

STRUGGLE FOR EXISTENCE AND NATURAL SELECTION.

(শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল)

যখনই আমরা জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখনই দেখিতে পাই, দুঃখের সহিত ইহার চিরশত্রুতা। যেখানে জীবন, সেখানেই দুঃখরাশি, সেখানেই জীবন সংগ্রাম। জীবনের ক্রমবিকাশের সহিত দুঃখরাশিরও যেন বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। সামান্য তৃণ হইতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, এমন কি, শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত। সকলেই স্ব স্ব পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত অহরহঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এ যুদ্ধে যে প্রবল, জীবনসংগ্রামে পটু, সেই জয়লাভ করিয়া নিজের উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়, এবং যে দুর্ব্বল, সে

জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। সেই বিনষ্টজীবের স্থান তখন তদপেক্ষা অধিকতর প্রবল ও জীবনসংগ্রামে পটু জীব আসিয়া অধিকার করে এবং তাহার বংশধরেরা তাহার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব লাভ করিয়া পুনরায় জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।

এইরূপে যতই প্রাণীর বৃদ্ধি এবং খাদ্যের অভাব হয়, যতই বংশের বিস্তার এবং নানাজাতির উৎপত্তি হইতে থাকে, ততই জীবনসংগ্রাম আরও ঘোরতর হইয়া পড়ে। এই জীবনসংগ্রাম একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ প্রবল হয়, দুইটী ভিন্ন জাতির মধ্যে সেরূপ প্রবল হয় না। বংশবিস্তার প্রবৃত্তির প্রাবল্যই জীবনসংগ্রামের হেতু। কি প্রকারে বংশের বিস্তার এবং নানাজাতির উৎপত্তি হয়, এক্ষণে আমরা তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ডারুইনের মতে বংশগত ও ব্যক্তিগত বিশেষত্বের বিকাশ এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই নানাজাতির উৎপত্তির কারণ। তিনি বলেন, যে মুহূর্ত্তে কোন প্রাণীর প্রকৃতিগত ও বংশগত বিশেষত্বের বিকাশ হইতে থাকে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃতি আসিয়া সেই প্রাণীকে এবং তাহার ন্যায় আর যে সমস্ত প্রাণীতে সেই সেই বিশেষত্বের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সব প্রাণীকে তদতিরিক্ত অপর প্রাণী হইতে পৃথক্ করে এবং তাহাদিগকে লইয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন
(Natural Selection)
ও
কৃত্রিম নির্ব্বাচন।
(Artificial Selection.)

এইরূপে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং যে সব প্রাণী উক্ত বিশেষত্ব লাভ করিয়া ঐ জাতির শ্রেণীভুক্ত হইতে না পারে, প্রকৃতি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুতরাং ক্রমবিকাশের অনুকূল পরিবর্ত্তনের সংরক্ষণ এবং প্রতিকূল পরিবর্ত্তনের পরিত্যাগই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। কিন্তু কেবল যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই নানাজাতির উৎপত্তির কারণ, তাহা নহে। কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারাও নানাজাতির সৃষ্টি করা যায়। যাঁহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্, তাঁহারা কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারা নানাজাতি উদ্ভিদের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ্ লইয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের এরূপ উৎকর্ষ সাধন করেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ সমস্ত উদ্ভিদ্, যে সব উদ্ভিদ্ হইতে জন্মিয়াছে, তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং এক একটী নূতন জাতীয় উদ্ভিদ্ মধ্যে পরিগণিত হয়।

কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ প্রশস্ত, কৃত্রিম নির্ব্বাচনের কার্য্যক্ষেত্র সেরূপ প্রশস্ত নয়। প্রকৃতি, প্রাণীর বাহ্য অভ্যন্তরীণ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উপর কার্য্য করিতে সক্ষম, এমন কি, প্রাণীর অভ্যন্তরে যে সমস্ত বিশেষত্বের সামান্য বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, প্রকৃতি সেই বিশেষত্বের সামান্য বিকাশের উপরও কার্য্য করিতে সমর্থ। কিন্তু মনুষ্য, প্রাণীর প্রকৃতিগত কিংবা বংশগত বিশেষত্বের বিকাশ দর্শনযোগ্য না হইলে কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারা কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। মনুষ্য কেবল নিজের সুখের জন্য কৃত্রিম উপায়ে প্রাণিবিশেষের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত, কিন্তু প্রকৃতি কোন প্রাণিবিশেষের সুখের নিমিত্ত তাহার উৎকর্ষ সাধনে তৎপর।

মনুষ্য কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিভিন্নজাতীয় প্রাণী সকল একত্রে রাখিতে সক্ষম হয়, এবং যে প্রাণী জীবনসংগ্রামে পটু, কেবল যে তাহারই উৎকর্ষ সাধন করে, তাহা নয়, পরন্তু যে সব প্রাণী জীবন সংগ্রামে অপটু, তাহারও উৎকর্ষ সাধনে যত্ন করে। কিন্তু প্রকৃতি, যে সব প্রাণী জীবনসংগ্রামে পটু, কেবল তাহাদেরই উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে ; যাহারা জীবনসংগ্রামে অপারগ, প্রকৃতি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন
ও
যৌন নির্ব্বাচন
(Sexual Selection)

আবার যৌন নির্ব্বাচন দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। পশু পক্ষীর মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ জাতি ভাল স্ত্রী লাভ করিবে বলিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যে প্রবল, তাহারই যেমন জয়লাভ হইয়া থাকে, যৌন নির্ব্বাচনে সেরূপ হয় না। এ যুদ্ধে যে অপর অপেক্ষা মনোহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাভ করিতে পারে, সেই জয়ী হয় এবং তাহারই বংশের ক্রমে ক্রমে বিস্তার হইতে থাকে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে জীবন সংগ্রামে পরাজিত প্রাণী যেরূপ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়, যৌন নির্ব্বাচনে সেরূপ হয় না। এ যুদ্ধে যাহারা পরাজিত হয়, তাহাদের অল্প সন্তানাদি হয় মাত্র।

এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে যখনই কোন পশু বা পক্ষীতে কোন বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিকাশ লক্ষিত হয়, তখনই প্রকৃতি আসিয়া তাহাকে তদতিরিক্ত পশু পক্ষী হইতে পৃথক্ করে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে একটী নূতন জাতির সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural Selection) ও পৃথকীকরণ (Isolation)

Darwin বলেন, কেবল ব্যক্তিগত বিশেষত্বের সাহায্য লইয়া প্রকৃতি নানা জাতির সৃষ্টি করিতে সমর্থ; এবং ইহাও বলেন যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই নানা জাতির উৎপত্তির মুখ্যতম কারণ। কিন্তু Romanes (রোমানিস্) প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, কেবল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই নানা জাতির উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন একভাবের ক্রমোন্নতির (monotypic evolution) কারণ হইতে পারে, কিন্তু একজাতি হইতে ভিন্নভিন্ন জাতির উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। প্রথমে ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন ও বংশগত বিশেষত্বের বিকাশ না হইলে প্রকৃতি কি নির্ব্বাচন করিবে? সুতরাং এক ভাবের ক্রমোন্নতি (monotypic evolution) সম্বন্ধেও উক্ত দুইটী কারণ ব্যতীত কেবল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কোন জাতির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না।

তাঁহারা বলেন, পৃথকীকরণই (Isolation) বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির মুখ্যতম কারণ এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই পৃথকীকরণের একটী অংশমাত্র। মনে কর, এক স্থানে একটীমাত্র পরিবার আছে এবং সেই পরিবারের একটী ছেলে ও একটী মেয়ে। এই দুই ভাই ভগ্নী পরস্পর বিবাহ করিলে তাহাদের কখনও সন্তান হইবে না। অতএব সন্তানোৎপাদনের অসামর্থ্য প্রযুক্ত এই দুই ভাই ভগ্নী বিবাহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িল। মেয়েটী বাধ্য হইয়া অপরপরিবারভুক্ত কোন এক পুরুষকে বিবাহ করিল এবং ছেলেটী অপর পরিবারভুক্ত কোন মেয়েকে বিবাহ করিল। এইরূপে এক পরিবার হইতে দুই ভিন্ন বংশের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই দুই বংশে প্রথম পুরুষে উক্ত পরিবারগত সাদৃশ্য থাকিলেও নয় দশ পুরুষের মধ্যে এই দুই বংশ উক্ত পরিবার হইতে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া দাঁড়াইবে।

ক্রমশঃ।

যাত্রা।

(শ্রীরেবতী মোহন চৌধুরী।)

ঘাটে বাঁধা তরী, সন্ধ্যা আসিছে,
দেশেতে চল।
নগরের মাঝে জল স্রোত দেখি
কি হ'বে ফল?
তারা যে তোমার সাথী নহে কেহ,
আছে তাহাদের আপনার গেহ,
আঁধার নামিলে কেন পথ খুঁজি,
ভাবিবে বল?
ঘাটে বাঁধা তরী, সন্ধ্যা আসিছে,
ঘরেতে চল।

একে ত দুর্দ্দিন ঘন বরিষা
করহ ত্বরা।
আগে নাহি গেলে, দেখিবে পশ্চাতে
তরণী ভরা।
তরী খুলে গেছে তোমারে ছাড়িয়া,
একেলা আপনি রয়েছ পড়িয়া,
আঁধার নামিয়া আকাশ হইতে,
ঘিরেছে ধরা!
একে ত দুর্দ্দিন ঘন বরিষা,
করহ ত্বরা।

এখনো পৃথিবী আঁধারে মেঘে,
ফেলেনি ঘিরে,
এখনো শোভিছে রবির কিরণ
বিটপী শিরে,

রাখ বেচা কেনা, হিসাব নিকাশ,
মিছা আয়োজন, লাভের প্রয়াস,
যাও খেয়া ঘাটে ডাক কর্ণধারে,
আসিবে ফিরে ।
এখনো পৃথিবী আঁধারে মেঘে,
ফেলেনি ঘিরে ।

সঁপি দাও তারে যা আছে সম্বল
জনম তরে ;
যাত্রিগণ সাথে তরণী আবার
লাগিবে তীরে ।
সব যাত্রী ঠেলি কাণ্ডারী তখন,
খুঁজে দিবে নিজে তোমার আসন,
আঁধারে আবৃত ঘোর সন্দেহ,
যাইবে দূরে !
সঁপি দাও তারে যা আছে সম্বল
জনম তরে ।

এমন সুদিন পাবে নাকো ফিরে,
পরাণ দিয়ে ।
ছিঁড়ি মায়াপাশ ভীতির বন্ধন,
এস হে ধেয়ে ।
এখনও রয়েছে গগনে বেলা
মিছা বসে কেন কর ধূলিখেলা
সে দীর্ঘ পথের কর আয়োজন,
ব্যাকুল হয়ে ।
এমন সুদিন পাবেনাকো ফিরে
পরাণ দিয়ে ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভিক্ষুকগণ ক্রমাগত আবেদন নিবেদন দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে সমর্থ না হইলে সময়ে সময়ে গৃহস্থকে অভিশাপাদি দ্বারা ভয় দেখাইয়া থাকে। আমাদের আন্দোলনকারিগণেরও এক্ষণে সেই অবস্থা। ইংলণ্ডজাত দ্রব্য ততদিন ব্যবহার করিব না, যত দিন না গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন, এ প্রতিজ্ঞা কি ভিক্ষুকের ভীতিপ্রদর্শনমাত্র নহে? প্রকৃতরূপে দেশের হিত-সাধন করিতে হইলে হৃদয়বান্ সুচতুর নেতা এবং তাঁহার অধীনে দেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরি-ত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প কতকগুলি নিঃস্বার্থ আজ্ঞাবহ যুবার প্রয়োজন। যেমন টাউনহলের সভায় ধনি দারিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলে যোগদান করিলেন, তেমনি যদি এখন ধনিগণ মিলিয়া কতক গুলি যৌথ কারবার ও মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখিতে ও নিত্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন, তবেই কতকটা কায হয়। আরও কথা এই, মধ্যবিত্তগণ কি চাকরির মমতা ছাড়িয়া ছোটখাট ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না? আমাদের মাতৃভাষাকেই বা কয়জন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং নানা ভাষা হইতে অনুবাদও মৌলিক গবেষণা দ্বারা উহাকে নানা ভাব-প্রকাশিণী করিতেই বা কয়জন সচেষ্ট? দুঃখের কথা বলিব কি, যে বিষয়ে এখনও আমাদের পাশ্চাত্য জাতি হইতে বিশেষত্ব, সেই ধর্ম্মের মর্ম্মও বৈদেশিক গুরু ও বৈদেশিক ভাবের বুকনি ব্যতীত খাঁটি স্বদেশীয়ের নিকট ও স্বদেশী ভাবে কয়জন বুঝিতে ইচ্ছুক? অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বিদ্যা বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে আমাদের চিন্তা ও ভাবের অংশী করিবারই বা চেষ্টা কোথায়? যাহা হউক, দেশের উন্নতির দিকে চেষ্টা হইয়াছে, ইহাও শুভ লক্ষণ।

নব্যভারতের শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এমএ বি এল, বেদান্ত ও ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান নামক এক প্রবন্ধে 'মায়াবাদাতঙ্কের' পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের বিশ্বাস, যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে বেদান্ত প্রচার করেন, তাঁহারা সকলেই হেগেলের বেদান্তের সুখ্যাতি শুনিয়া বেদান্তে বিশ্বাসী, 'বিবেকানন্দ আমেরিকায় যশঃ লাভ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে নির্ভরই সকল দুঃখের মূল,' ও মায়াবাদ ঈশ্বরভক্তির বিরোধী। বেদান্তবাদীরা হেগেলের সব কথা জানেন না বলিয়া হেগেল হইতে ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর নিন্দাবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বেদান্তবাদীরা হেগে-লের সব কথা পাঠ করেন নাই—তাঁহারা অল্পজ্ঞানে অভিমানী। লেখক ভক্ত মানুষ, তাঁহার ঈশ্বরভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকুক, কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি স্বামীজির কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন বা শঙ্করাচার্য্যের মত সম্বন্ধেও কি তাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে? তাঁহার ছেলে না কি এক দিন তাঁহাকে বলিয়াছিল, বাবা, জীব ব্রহ্ম এক, তবে উপাসনা কেন? লেখক নিজের ছেলেকে সাবধান করুন, লেখনী ধারণ করিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া কেন?

বিজ্ঞানের কতিপয় মূল নিয়ম।

(শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।)

সকলেই বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতে দেখিয়াছেন ; কিন্তু এই দৃশ্যতঃ সামান্য সত্যটি মনীষী নিউটনের চক্ষে কি এক অপূর্ব্ব ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল ; এবং ফল পতনের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কি আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি আবিষ্কৃত হইল ! ইহাদিগের উপরই নব্য জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান স্থাপিত।

সকলেই ত বস্তুকে দুলিতে দেখেন, কিন্তু শুদ্ধ গ্যালিলিও ইহার প্রতি অন্য ভাবে আকৃষ্ট হইলেন এবং তাহার ফল স্বরূপ সমকালিক পরিদোলনের নিয়মগুলি (Isochronous Oscillation) আবিষ্কার করিলেন। কে জানে কেন ? ইহার মীমাংসা কে করে ? সকলেই একপথে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু সহসা একজন সেই পথসমাকীর্ণ ধন রত্ন দেখিতে পান এবং ধনরত্ন অন্বেষণ করিতে করিতে হয় ত ধনের খনি নয়নগোচর হয়। এইরূপে বিজ্ঞান-জগতে সকলের দ্বারা অনাদৃত ও উপেক্ষিত একটি অন্ধকারাবৃত সত্য কোন দেব-হৃদয়ের ক্ষীণ আলোকরেখায় আলোকিত হইয়া অদূরে অপূর্ব্ব সত্যের উৎস দেখাইয়া দেয়। এইরূপ পথপ্রাপ্ত দুই একটি উপেক্ষিত সত্য হইতে যাবতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন গঠিত।

একটি সত্যের নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কত কত সত্য আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞান প্রস্তুত করিতে হইলে শুদ্ধ সত্যাবিষ্কারের জন্য শুভ লগ্নের অপেক্ষা করিলে চলিবেনা। আবিষ্কৃত সত্যকে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা রূপ নিকষ প্রস্তরে কষিয়া তাহার বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই রূপে বিশুদ্ধ একটি সত্য হইতে আর একটি সত্যের আবিষ্কার হয় ; এই প্রকারে আবিষ্কারপরম্পরা সাধিত হয়।

কোন সত্যের আবিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে কতকগুলি ঘটনার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং সেই ঘটনাগুলি হইতে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কোন একটি সিদ্ধান্তের সত্যতা নিরূপণ করিতে হইলে এক শ্রেণীরই কতিপয় পরীক্ষা করিলে চলিবেনা। সেই সিদ্ধান্তের সহিত গৌণভাবে সম্বদ্ধ ঘটনাবলিরও পরীক্ষা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত এই সকল ঘটনার সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া উচিত।

কোন প্রাকৃতিক ঘটনা দর্শন বা প্রত্যক্ষ করার নাম পর্য্যবেক্ষণ এবং নিজে যখন সেই সকল ঘটনার অনুকরণ করি, তখনই তাহার নাম পরীক্ষা (Experiment)। তাহা হইলে পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর। মনে কর দেখিলাম যে, আকাশে বৃষ্টির সময় বিদ্যুৎ হইল আর Ozone (ওজোন) নামক একপ্রকার বায়ু প্রস্তুত হইল। অমনি Simen's tube এর মধ্যে তড়িৎ শক্তি (Silent electric discharge) ও অম্লজান প্রবেশ করাইয়া "ওজোন" প্রস্তুত করিলাম ; ইহার নাম পরীক্ষা।

প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনাগুলি আবার আমাদের পর্য্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধ নহে। কতকগুলি আমরা আদৌ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিনা। যে সকল শব্দ সেকেণ্ডে ৩৮০০০ অপেক্ষা অধিক কিম্বা ১৬ অপেক্ষা অল্পসংখ্যক স্পন্দন জনিত, তাহারা আমাদের শ্রুতিগোচর হয়না। যখন বোধ হইতেছে অতিশয় নিস্তব্ধ, তখন আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সহজোদ্দীপনশীল (Sensitive) শ্রবণপটহযুক্ত জীবের নিকট কত ভীষণ শব্দ হইতেছে ! আমাদের চতুর্দ্দিকে কত সহস্র সহস্র কীটাণু রহিয়াছে, যাহাদের অস্তিত্ব চর্ম্মচক্ষে দূরে থাক্, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায়না।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিলে সপ্তধা-বিভক্ত একটি বর্ণপেটক (Spectrum) নয়নগোচর হয় ; ইহার আদিতে ও অন্তে পাটল (violet) ও লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের জানা আছে যে, সূর্য্য-রশ্মি সপ্তবর্ণের মিশ্রণ নহে পরন্তু সহস্র সহস্র বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা আমাদের চক্ষুর অগোচর, অপিচ পাটল ও লোহিত বর্ণের সীমার বাহিরেও আলোকরশ্মি আছে (Ultra-violet এবং Infra-red)।

পর্য্যবেক্ষণের অনেকগুলি অন্তরায়। ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি নিবন্ধন আমাদের পর্য্যবেক্ষণ ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে। যেমন এক বস্তুর দুইটি করিয়া প্রতিকৃতি দর্শন (Double image) কিম্বা পাণ্ডুরোগ নিবন্ধন সমস্ত বস্তু পীতাভ প্রতীয়মান হওয়া।

আর একটি অন্তরায় বিজ্ঞানালোচনার বিশেষ প্রতিবন্ধক ; দর্শক বা পর্য্যবেক্ষকের ভ্রান্ত সংস্কার বা আপন মত পরিপোষণের আগ্রহ। এই আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন অনেক বৈজ্ঞানিক বিষম ভ্রমে পতিত হন। তাঁহাকে গীতোক্ত নিষ্কামভাবে দর্শন করিতে হইবে। মতবিশেষের প্রতি অন্যায় আসক্তি বা আগ্রহ একেবারে বর্জ্জন করিয়া বৈজ্ঞানিকের স্থান অধিকার করা উচিত। কিন্তু তাহা বলিয়া বৈজ্ঞানিককে আপন মতে বা সিদ্ধান্তে শিথিলযত্ন ও বিশ্বাসহীন হইতে বলিতেছিনা, এবং তাঁহাকে অন্ধের ন্যায় পরীক্ষা করিতেও বলিতেছিনা। কি ঘটা সম্ভব, তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে জানিয়া স্থির করিতে হইবে।

মিথ্যা তথ্য বা ঘটনা বিজ্ঞানের পক্ষে মহা অনিষ্টকর ; বিজ্ঞানের উহা মেরুদণ্ডে আঘাত করে। মিথ্যা ঘটনা মিথ্যা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সহস্রগুণে অপকারী ; কারণ, সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রভৃতি সমস্তই সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে। সিদ্ধান্তকে মানুষের যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়া গমন করিতে হইবে, কিন্তু যাহার উপর যুক্তি তর্ক নির্ভর করে, তাহা বিকলাঙ্গ বা মিথ্যা হইলে অনিষ্টের অবধি থাকেনা।

বৈজ্ঞানিককে আর একটি ভ্রমে পতিত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা সময়ে সময়ে ঘটনাপারম্পর্য্য (Sequence of events) হইতে কোন ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। উদাহরণ দিতেছি। কোন তালবৃক্ষে যেমন একটি কাক উপবেশন করিল, অমনি হয়ত একটি তাল বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল, এই ব্যাপার হইতে ইহা মনে করা উচিত নহে, যে কাকের উপবেশনের সহিত তালের পতনের কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে। আর একটি উদাহরণ দিতেছি। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করিতেন, চন্দ্রকিরণে শৈত্য আছে। চন্দ্র আকাশে উদিত থাকার সময় আমরা কথঞ্চিৎ শৈত্য অনুভব করি বটে, কিন্তু তাহার কারণ চন্দ্রোদয় নহে। আকাশ মেঘমুক্ত থাকিলে আমরা চন্দ্র দেখিয়া থাকি, নচেৎ নহে। কিন্তু আবার আকাশ পরিষ্কৃত হইলে পৃথিবী হইতে তাপ বিকীরণ ব্যাপার সহজসাধ্য হয় ; সুতরাং এই কারণে আমরা কথঞ্চিৎ শৈত্য অনুভব করিয়া থাকি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিজ্ঞানের পক্ষে অনেকগুলি অন্তরায় ; তন্মধ্যে যান্ত্রিক ও ঐন্দ্রিয়ক অন্তরায়ই প্রধান। এমন কোন যন্ত্র নাই, যদ্দ্বারা দুইটী অণুকে চিনিয়া রাখা যাইতে পারে।

আর একটি অন্তরায়ের কথা বলা যাইতেছে। যে সকল ঘটনা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহারা হয়ত সহস্র সহস্র বৎসর অন্তর বা তদপেক্ষা অধিক

সময় অন্তর ঘটিতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যাপার একবার প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। অতএব বৈজ্ঞানিককে কত সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে! উদাহরণ স্বরূপ মনে কর, অতিক্ষেপনী (Hyperbola) পথে পরিভ্রমণ করে, এমন ধূমকেতু অতি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। দুইশত বৎসরে এ শ্রেণীর ৬টী ভিন্ন ভিন্ন ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছে। এবং উহাদের মধ্যে যাহাকে আজ দেখিলাম, অনন্তকালেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবেনা।

পরীক্ষা করিবার সময় শুদ্ধ ঘটনার পরিবর্ত্তন বা বৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে চলিবেনা। ইহার অনুকূল প্রতিকূল অবস্থাগুলি বিশেষ ভাবে পরিদর্শন করিতে হইবে। মনে কর, উদজান ও হরিতক (Chlorine) মিশাইলাম আর লবণ-দ্রাবক প্রস্তুত হইল ; ইহা হইতে ইহা মনে করিলে চলিবেনা, সকল অবস্থায়ই ইহাদের সংযোগে লবণদ্রাবক প্রস্তুত হইবে। অন্ধকারে উভয়কে একত্র রাখিলে কোনই ক্রিয়া হইবেনা।

পরীক্ষা করিবার সময় সমস্ত অবস্থাগুলির নির্দ্ধারণ করিয়া ঘটনার ক্রমিক পরিবর্ত্তনগুলিকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এবং এক একটি অবস্থাকে সরাইয়া ঘটনাগুলির পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আবার কতকগুলি অবস্থা পরস্পর গ্রথিত ; উহাদের মধ্যে একটিকে সরাইলে আর একটিকে সরাইতে হয়। এই খানেই বৈজ্ঞানিকের মহা বিপদ। তাহা ছাড়া এমন কতকগুলি অবস্থা আছে, যাহা স্বাভাবিক ভাবে মানুষের কাছে অপরিজ্ঞেয়। আবার কতক-গুলি অবস্থা আছে, যাহাদিগকে আদৌ সরাইতে পারা যায়না, যেমন কোন দ্রব্যের গুরুত্ব (Gravity) বা জড়ত্ব (Inertia)। আরও কতকগুলি অবস্থা আছে, যাহাদের সহিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। একটি গোলাকার স্বর্ণবলয়ের যে ভার, সেই স্বর্ণবলয়কে পিটিয়া চেপ্‌টা করিলে ভারের ন্যূনাধিক্য ঘটিবেনা। তাহা হইলে বুঝা গেল, আকৃতির সহিত ভারের কোন সম্পর্ক নাই।

সমস্ত পরীক্ষা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। কল্পান্তকাল পরমায়ু হইলে সম্ভাবনা। মনে কর, অঙ্গারের উৎপত্তি :—কত কত সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর অভ্য-ন্তরীন তাপ সংযোগে অঙ্গারের উৎপত্তি। সুতরাং তাহা প্রস্তুত করা অসম্ভব। লক্ষ বৎসর ধরিয়া পলি পড়িয়া হয়ত কোন প্রস্তরের আবির্ভাব হইয়াছে; কেমন করিয়া সেইরূপ প্রস্তর প্রস্তুত করা যাইবে? এ সব ব্যাপার ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব হইতে কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া সংঘটিত হইতেছে। প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জরের (fossil) উৎপত্তিও এইরূপ। জীববিশেষের শরীরগত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে

বহুযুগের প্রয়োজন। দুই একজন মনুষ্যের জীবনে সাধিত হয় না। সুতরাং ইহার পরীক্ষা অসম্ভব।

বিজ্ঞানে আমাদের পরীক্ষার পদ্ধতি দুইপ্রকার। একপ্রকার "নেতি" বা "নাস্তি" শ্রেণীর অন্তর্গত; আর একপ্রকার "ইতি" বা "অস্তি" শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার বিষয় "ইহা নহে"; দ্বিতীয় পরীক্ষার বিষয় "ইহাই"। প্রথমোক্তটি অভাব বা নিষেধদ্যোতক, শেষোক্তটি স্বরূপব্যঞ্জক। দুই প্রকার পরীক্ষাই কোন বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারণে বিশেষ সহায়তা করে। কোন কোন ঘটনার "অস্তি" হিসাবে পরীক্ষা অসম্ভব। মনে কর, অমূর্ত্ত বা অপিণ্ডীভূত (Imponderable) ইথার (Ether); তাহা যে কি, প্রমাণ করিতে পারা যায় না। এই পদ্ধতি অনুসারে মূলকারণ বা Primeval causeএর বিষয় কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়।

পরীক্ষার দুইটি ক্রম আছে। প্রথমে গুণদ্যোতক (Qualitative) পরীক্ষা করিতে হইবে; তাহার পর মাত্রাদ্যোতক (Quantitative) পরীক্ষা। প্রথমে পরীক্ষা করিতে হইবে যে, নির্দ্দিষ্ট অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে ঘটনার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়। তাহার পর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, অবস্থাগুলি কি পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলে কি পরিমাণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পরিবর্ত্তন ও অবস্থাগুলিকে সমীকরণের সাঙ্কেতিক চিহ্নে লিখিতে হইবে। উদাহরণ দিতেছি।

যত দূরে আলোক দেখা যাইবে, ততই ইহার দীপ্তির হ্রাস নয়নগোচর হইবে। ইহা গুণদ্যোতক পরীক্ষা। কিন্তু দেখিলাম, ১হাত দূরে কোন আলোকের যে প্রকার দীপ্তি, ২ হাত দূরে তাহার $\frac{১}{৪}$ দীপ্তি, ৩ হাত দূরে $\frac{১}{৯}$ দীপ্তি। তাহা হইলে দেখা গেল যে, আলোকের দীপ্তির সহিত দূরত্বের বর্গের বিষমানুপাতিক সম্বন্ধ (Inverse ratio)। গণিতের সাঙ্কেতিক ভাষায় আ $\propto \frac{১}{(দ)^২}$ [আ = আলোকের দীপ্তি; দ = দূরত্ব]

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক:—দেখা গেল যে, উত্তাপ যদি ঠিক সমান রাখা যায়, তাহা হইলে কোন অবরুদ্ধ বায়ুর (gas) আয়তন হ্রাস করিয়া দিলে চাপের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ইহা গুণদ্যোতক পরীক্ষা। তাহার পর দেখিলাম, আয়তন যদি অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া যায়, চাপ দ্বিগুণ হইবে; আয়তন $\frac{১}{৩}$ করিলে চাপ ৩ গুণ হইবে। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, উত্তাপ একই রাখিলে, অবরুদ্ধ বায়ুর আয়তনের সহিত চাপের বিষমানুপাতিক সম্বন্ধ। গণিতের ভাষায় আ $\propto \frac{১}{চ}$ [আ = আয়তন; চ = চাপ]

আমরা যখন একটি বা দুইটি অবস্থার সহিত কোন পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি, তখন অন্যান্য অবস্থাগুলিকে একইভাবে নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে ; কেন না তাহা না হইলে নির্দ্দিষ্ট অবস্থা ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ পাওয়া যাইবে না, অন্য অবস্থা হয়ত এই সম্বন্ধের যাথার্থ্য নির্ণয়ে বিভ্রম উপস্থিত করিবে।

বলিয়াছি, বায়বীয় আয়তন ও চাপের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার সময় উত্তাপকে একই প্রকার রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কেন না যখন গ্যাসটির আয়তন সঙ্কুচিত করা গেল, তখন তাহার অণুসকলের বেগের বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়মাণ প্রবৃত্তি শক্তির (Kinetic energy) বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং উত্তাপেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং একই উত্তাপ সংরক্ষণের নিমিত্ত ঐ গ্যাসের যাহাতে তাপ বৃদ্ধি না হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

কিন্তু যদি একটি অপেক্ষা অধিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাহা হইলেও অনেক সময়ে ঘটনার পরিমাণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। তাহা উচ্চগণিতের এক আশ্চর্য্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে ; ইহার নাম Integration.

পরীক্ষার অনেকগুলি অন্তরায় ; কত অজ্ঞাত বা জ্ঞাত কারণে ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, অনেক সময় কৌশল করিয়া এই পরীক্ষায় দুইটি এক-ধর্ম্মাক্রান্ত ভ্রান্তির সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়া যায়। কোন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat) নির্ণয় করিবার সময় ইহা প্রয়োজনীয়। কাউন্ট রাম্‌-ফোর্ড (Count Rumford) বলেন যে, কোন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ পরীক্ষার সময়, ঘরের যে উত্তাপ, তাহার যত নিম্ন ডিগ্রি তাপে পরীক্ষা করা উচিত, পরী-ক্ষান্তে যেন দ্রব্যটীর উত্তাপ ঘর হইতে তত ডিগ্রি অধিক হয়। ইহা হইলে বিকী-রণ (Radiation) প্রভৃতি কারণের জন্য পরীক্ষায় ভ্রান্তি থাকে না।

কোন গবেষণা করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক দুই একটি পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হন না। অনেকগুলি পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের একটি গড় বা মাঝামাঝি সংখ্যা বাহির করেন। এই প্রকার অনেকগুলি মাঝামাঝি বা গড় সংখ্যার আবার আর একটি গড় বাহির করেন (Mean of means.)

কিন্তু এই পদ্ধতি, সকল পরীক্ষায় প্রযোজ্য নহে, কারণ যে সকল পরীক্ষায় নানা প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ভ্রান্তির কারণ থাকিতে পারে, তাহাতেই ইহা প্রযোজ্য ; কিন্তু যদি কোন পরীক্ষায় একই রূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেশী হয়, তাহা হইলে এ প্রকার গড় পড়তায় কোন ফল নাই। মনে কর, তাপমান যন্ত্র যতই পুরা-

তন, ততই ইহা প্রকৃত অপেক্ষা অধিকতর তাপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করে। এ অবস্থায় অনেকগুলি পরীক্ষার গড়পড়তা নইলে কোন সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং পরীক্ষার পূর্ব্বে অগ্রে যন্ত্রটির শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করিতে হইবে; এবং কোন শুদ্ধ যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া ইহার একটি সম্বন্ধ বাহির করিতে হইবে। ইহার নাম Calibration। যন্ত্রাগারে প্রায়ই পরীক্ষার পূর্ব্বে তাড়িতমান (Galvanometer), তাপমান (Thermometer) ও তাপমান (Barometer) প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে Calibrate করিতে হয়।

কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে, যতপ্রকার উপায় আছে, সম্ভব মত ততপ্রকার পরীক্ষা করা উচিত। মনে কর, উদজনক বায়ুতে শব্দের গতি পরীক্ষা করিতে হইবে। একই প্রকারের অনেকগুলি পরীক্ষা করিলাম। সকল পরীক্ষায় একই প্রকারের ভ্রান্তি থাকিতে পারে। ইহাদের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করিতে হইলে একেবারে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা করিতে হইবে। মনে কর, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, উদজনক বাষ্পে শব্দের বেগ ক। কিন্তু গণিতের সাহায্যে ইহাও জানা গেল যে,

$$ক = \sqrt{\frac{\text{বায়ুর স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{বায়ুর ঘনত্ব}}} = \sqrt{\frac{\text{বায়ুর চাপ} \times \dfrac{\text{একই চাপে ইহার আপেক্ষিক তাপ}}{\text{একই ভারে ইহার ''}}}{\text{বায়ুর ঘনত্ব}}}$$

ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা করিয়া বায়ুটির "একই চাপে আপেক্ষিক তাপ" ও "একই ভারে আপেক্ষিক তাপ" বাহির করিয়া, তাহাদের অনুপাত স্থির করিলাম। ইহা দ্বারা গণিতের একটি অঙ্কের সাহায্যে "ক" র শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করা গেল।

কোন পর্ব্বতের উচ্চতা নির্ণয় করিতে হইবে। ইহা Hypsometer নামক যন্ত্রের সাহায্যে কিম্বা চাপমান যন্ত্রের সাহায্যেও নির্ণয় করা যাইতে পারে, কেন না যতই ঊর্দ্ধে আরোহণ করিব, ততই বায়ুর চাপের হ্রাস দেখা যাইবে। বায়ুর চাপের সহিত উচ্চতার একটা সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধ হইতে উচ্চতা নির্ণয় করিতে পারা যায়।

তৃতীয়তঃ, ত্রিকোণমিতির সাহায্যে ইহার উচ্চতা নির্ণীত হইতে পারে।

আর একটি উদাহরণ দিতেছি ঃ—

একক পরিমাণ তাপ (one caloric) কত পরিমাণ গতিশাস্ত্রীয় কর্ম্মের (work) সমান, তাহা আমরা Rowland, Joule কিম্বা Hirn এর পরীক্ষা-দ্বারা নির্ণয় করিতে পারি। কিম্বা একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে তাড়িত ও উত্তাপ উভয়বিধ পরীক্ষার সাহায্যেও (Voltameter এবং Calorimeter) নির্ণয় করিতে পারি।

পূর্ব্বে মাত্রাদ্যোতক পরীক্ষার কথা বলা গিয়াছে। বলা গিয়াছে, আমরা যে সকল মাত্রাদ্যোতক পরীক্ষা করি, তাহাদের সাহায্যে অবস্থা ও ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে একটি অনুপাত বা সমীকরণ বাহির করিবার প্রয়াস পাই। কোন প্রকার অনুপাত না পাইলে এপ্রকার পরীক্ষায় বিশেষ ফলোদয় নাই। যেমন আবহবিদ্যা বা Meteorologyর পরীক্ষাগুলি। তবে ব্যবহারিক জীবনে ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন।

অনেক স্থলে এই সকল পরীক্ষার ফল হইতে মোটামুটি কি ঘটিবে, বলা যাইতে পারে ; কিন্তু ঘটনার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যাইবে না। সুতরাং বিজ্ঞানের হিসাবে ইহাদের মূল্য অল্প।

কোন তত্ত্বের যুক্তি ও পরীক্ষা উভয়ই ভ্রমবর্জ্জিত হইলেও সিদ্ধান্তে ভ্রান্তি থাকিতে পারে। ইহার কারণ হয়ত কোন অচিন্তনীয় আকস্মিক ঘটনা। ভ্রমের অপর কারণও আছে। আমরা প্রত্যেক ঘটনাই সমীকরণের সঙ্কেতে প্রকাশ করিয়া থাকি। সমীকরণের অঙ্গীভূত সংখ্যাগুলির মান বসাইতে গিয়া ভ্রম করিয়া বসিতে পারি। একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা হইবে।

Newton স্থির করিলেন যে, কোন বায়বীয় পদার্থে শব্দের গতি $= \sqrt{\frac{\text{স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{ঘনত্ব}}}$; ইহা অতি প্রকৃত। কিন্তু তিনি স্থির করিলেন যে, স্থিতিস্থাপকতার মান ঐ বায়বীয় পদার্থের চাপের মানের সমান। কিন্তু ইহাতে একটি ভুল হইল তাহা এই,—যে পথে শব্দ সঞ্চারিত হয়, তাহা শব্দ সঞ্চারের সময় একই উত্তাপে থাকিতে পারে না ; বায়বীয় পদার্থের আকস্মিক প্রসারণ ও আকুঞ্চন নিবন্ধন তাপের ভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তথ্যটি নিউটনের অপরিজ্ঞাত ছিল ; বাস্তবিক যদি ঐ পদার্থের উত্তাপের পরিমাণ একই রূপ রাখা যায়, তাহা

হইলে নিউটনের সিদ্ধান্ত ঠিক ; কিন্তু সত্য সত্যই উত্তাপের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই ভ্রান্তিটি লাপলাস (Laplace) প্রদর্শন করিলেন।

বৈজ্ঞানিককে পরীক্ষিত ঘটনাগুলির সাদৃশ্য হইতে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে। সদৃশ পদার্থগুলিকে একই শ্রেণীতে রাখিতে হইবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে সাদৃশ্য (Unity in variety) দেখাই বিজ্ঞানের কাজ।

এই শ্রেণীবিভাগ হইতে ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের পথ অনেকটা মুক্ত হয়। আলোক ও শব্দকে স্পন্দনজাতীয় ঘটনা বলিয়া একই শ্রেণীভুক্ত করা গেল। দেখিলাম, আলোকের "interference" ও "polarisation" আছে। উপমানের (Analogy) সাহায্যে স্থির করিলাম, শব্দেরও ইহা থাকা সম্ভব। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সত্য। সত্য সত্যই এই প্রকারে শব্দের "interference" আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মেন্দেলিয়ফের (Mendeleef) "periodic classification" কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! শ্রেণীবিভাগ হইতে কত কত মূল পদার্থের আবিষ্কারের পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আবিষ্কারের পরে দেখা গিয়াছে, তাহারা প্রকৃত। এই আবিষ্কার উপমানের সাহায্যে হইয়াছে।

কিন্তু অতি সাবধানে শ্রেণীবিভাগ করিতে হয়। ভ্রান্তির অনেকগুলি কারণ আছে। কেপ্লারের ন্যায় মহা পণ্ডিতকেও ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছিল। কেপ্লার বলিলেন, শনিগ্রহের কেবলমাত্র একটি উপগ্রহ থাকিতে পারে; কারণ ইহাকে ধরিয়া ও বৃহস্পতি ও পৃথিবীর উপগ্রহ লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী উপগ্রহ। তাঁহার ধারণা ছিল, ৬এর অধিক উপগ্রহ থাকা অসম্ভব, কারণ অধিকাংশ বস্তু ৬টি করিয়া বিদ্যমান। এই প্রকার ৭ সংখ্যা লইয়া গ্যালিলিওর সহিত আরিষ্টটেলিয (Aristotelian) দিগের মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর আর একটি উদাহরণ দিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা দেখিতে পাই যে, অনেকগুলি প্রাণী বা অনেকগুলি পদার্থ মনুষ্যের উপকারী; ইহা হইতে এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সমুদায় পদার্থই মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট। ইহা কি ভয়ানক মত!

জীবন সংগ্রাম

ও

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

Natural selection ও দৈশিক পৃথকীকরণ (Geographical selection.)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পৃথকীকরণই নানাজাতির উৎপত্তির মুখ্যতম কারণ। আরও দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত বিশেষত্বের বিকাশ হইলেও পৃথকীকরণ ব্যতীত কেবল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিতে পারে না। মনে কর, এক দ্বীপে দুই পরিবার আছে। এই দুই পবিবারের সন্তান সন্ততির মধ্যে যদি বিবাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল এক ভাবেরই ক্রমোন্নতি (Monotypic evolution) হইবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ক্রমোন্নতি (Polytypic evolution) কখনই হইবে না। যদি এই দুই পরিবারের মধ্যে এক পরিবারকে লইয়া দূরদেশে রাখিয়া আসা যায়, তাহা হইলে এই দুই পরিবার হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিভিন্নজাতির ক্রমবিকাশ (Polytypic evolution) হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বংশগত ও ব্যক্তিগত বিশেষত্বের বিকাশ ও পৃথকীকরণই নানা জাতির উৎপত্তির কারণ এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, যৌন নির্ব্বাচন, কৃত্রিম নির্ব্বাচন, দৈশিক পৃথকীকরণ (Geographical isolation), physiological selection, পৃথকীকরণের অংশ মাত্র।

এইরূপে নানাজাতির সৃষ্টির সহিত জীবনের বিকাশ হইতে থাকিলে দুঃখরাশিও যেন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং জীবনসংগ্রাম আরও ঘোরতর হইয়া পড়ে। কি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে কি প্রাণিরাজ্যে সর্ব্বত্রই জীবনসংগ্রাম, সর্ব্বত্রই অসন্তোষ, সর্ব্বত্রই ক্রন্দনধ্বনি। উদ্ভিদরাজ্যের অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি প্রাণিরাজ্যে আসিয়া আরও স্ফুটতর হইয়াছে।

আজ শত শত আশায় বুক বাঁধিয়া সংসারসাগরে সুখের সাঁতার দিতে নামিয়াছ; কাল হয়ত সেই মনোরম আশাবন্ধন শতধা ছিন্ন হইয়া যাইবে, এবং

সংসারের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে কাতর হইয়া ভগ্নহৃদয়ে বলিতে হইবে,—"অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"। আজ তুমি সবল ও সুস্থকায় সম্রাট্ হইয়া মনের আনন্দে মর্ত্তধামে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছ, ভাবিতেছ জীবন কি সুখময়! কিন্তু কাল যখন মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে, তখন আর এ সুখস্বপ্ন থাকিবে না। তখন বলিবে, "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল"। তাই বলি, মনুষ্যজীবনেই বা সুখ কই, সুখ ও শান্তি যেন কাল্পনিক কথা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। মনুষ্যজীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে বাল্যকাল হইতেই অবিরত দুঃখের সহিত সংগ্রাম চলিয়াছে। কখন এই জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, কে বলিবে? কে বলিবে, এই দুঃখরাশি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল?

জীবন যদি কেবল দুঃখময়, তাহা হইলে সে জীবনলাভে, প্রত্যেক জীবের এত চেষ্টা এত আগ্রহ কেন? কে সাধ করিয়া দুঃখভার বহন করিতে চায়? জীবন যদি কেবল দুঃখময় হইত, তাহা হইলে তাহার কখনই বিকাশ হইত না, তাহা হইলে প্রতিদিন সহস্র প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও সকলেই নিজের অমরত্ব কামনা করিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, জীবনে সুখও আছে, দুঃখও আছে, আলোও আছে, অন্ধকারও আছে, অবিচ্ছিন্ন সুখ কিংবা অবিচ্ছিন্ন দুঃখ প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। জগৎ সুখদুঃখময়, জীবনও সুখ-দুঃখে পরিপূর্ণ। এই সুখদুঃখময় জগতের সহিত জীবের অবিরত সংগ্রাম চলিয়াছে। জীব ও জগতের সংগ্রামই জীবনসংগ্রাম, জগতের সহিত জীবের সংগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জীব ও জগৎ বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিব। কারণ, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জীব ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা, তাহা প্রকাশ না করিলে, প্রত্যেকেই স্ব স্ব মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা করিয়া আমাদের অভিপ্রায় কখনই অবগত হইতে পারিবেন না।

কেহ হয়ত "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই কথা বলিয়া আমাদিগকে বলিবেন, "জগতের সহিত জীবের আবার সংগ্রাম কি বাপু? জীব ত ব্রহ্ম, নির্গুণ, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী ও সত্য, আর জগৎ ত মিথ্যা। যে নির্গুণ, নিরাকার ও সত্য, তাহার সহিত মিথ্যা জগতের কখন সংগ্রাম হইয়া থাকে?" কেহ হয়ত বলিবেন, "জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি যে, তার সঙ্গে গায়ে

পড়ে ঝগড়া কত্তে যাব? জগৎ থাকে থাকুক, তাতে আমার ক্ষতি কি, আমি ত "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং"।

আবার হয়ত কেহ বলিবেন, "জগতের সহিত সংগ্রাম! ক্ষুদ্র জীব, একবার ভাবিয়া দেখ তুমি কে! এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অংশে দাঁড়াইয়া তোমার এত আস্ফালন! ক্ষুদ্র পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, এই সৌর জগতের ন্যায় কোটি কোটি জগৎ ঐ অনন্ত নীলাম্বুরাশিতে ক্ষুদ্র জলবিম্বের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ন্যায় সহস্র সহস্র পৃথিবী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সেই মহাকালী প্রকৃতির অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছে। আর তুমি? ক্ষুদ্র মানব। এই অনন্তশক্তিসম্পন্না প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? প্রকৃতির শরণাগত হওয়া ব্যতীত তোমার আর উপায়ান্তর নাই। অথবা যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা, যিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, সেই ভগবান পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

এই সুমধুর বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন জগদীশ্বরের উপর আপনার জীবনভার অর্পণ কর, তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন।"

এক্ষণে আমরা এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন মতের সমালোচনা না করিয়া আমাদের স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

জীব বলিতে আমরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে বুঝি না, কারণ নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের ধারণার অতীত, আবার ব্রহ্ম যে কি বস্তু তাহাও আমরা জানি না, যেমন রাম, শ্যাম, যদু, মধু, সেইরূপ ব্রহ্ম আমাদের নিকট একটী নাম মাত্র, সুতরাং "জীব ব্রহ্ম" এই কথা বলিলে জীব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান কিছুই হয় না। আবার জীবকে অনন্ত চিদানন্দরূপ শিবও বলিতে পারি না, কারণ, অল্লাধিক পরিমাণে সকলেতেই আমরা দুঃখ ও অল্পজ্ঞত্ব দেখিতে পাই। সুতরাং আমরা "জীব ব্রহ্ম" এই কথা বলিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিব না। জীব বলিতে আমরা উপাধিবিশিষ্ট চেতনকেই মনে করিয়া থাকি, কিংবা যাহা নিজেকে ব্যষ্টিরূপে ভাবিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার স্বীয় পৃথক্ সত্তার জ্ঞান এবং নিজ হইতে পৃথক্ অপর বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, আমরা সচরাচর তাহাকেই জীব বলিয়া থাকি।

এক্ষণে জগৎ কি, তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইব। জগৎ বলিতে আমাদের দুই প্রকারের ধারণা জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ, যাবতীয় বস্তু এবং তাহাদের গুণ-সমষ্টিকেই জগৎ বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহা মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গ হইতে পৃথক্, তাহাকেই জগৎ বলিয়া থাকি, অর্থাৎ জগৎ বলিতে আমরা কখন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয় জগতের সমষ্টিকেই মনে করিয়া থাকি; কখন বা জগৎ শব্দে বহির্জগৎকেই বুঝিয়া থাকি। কখন স্থূলভূতসমষ্টিকে কখন স্থূলসূক্ষ্ম উভয় ভূতসমষ্টিকেই জগৎ বলি, কিংবা যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহাকেই জগৎ শব্দে অভিহিত করি।

অতএব আমরা, যাহা নিজেকে ব্যষ্টি ভাবে ভাবিয়া থাকে, তাহাকে জীব এবং যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহাকে জগৎ, এই দুই সংজ্ঞায় বিশেষিত করিয়াছি। জগৎকে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত সমষ্টি বলিলে, জীব ও জগৎসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার তখন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে জীবকে প্রাকৃতিক বিকার বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং জীব ও জগতের সংগ্রাম, প্রকৃতির এক অংশের সহিত অন্য অংশের সংগ্রাম। এক্ষণে এই ব্যষ্টিজীবের সহিত স্থূল ও সূক্ষ্মভূত সমষ্টি জগতের কি প্রকারে সংগ্রাম হয়, এবং এ সংগ্রামের নিবৃত্তিই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে, তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

জীবনী ও কাব্য আলোচনা।

যে দুইটী কবির সম্বন্ধে আজি আমি আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি, আমার বিবেচনায় তাঁহাদের স্থান বাঙ্গালা কাব্যজগতের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি অপেক্ষা অনেক উচ্চে। উভয়ের বিষয়ে একত্র এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া একভাবে অসঙ্গত হইলেও উহা একেবারে নিষ্কারণ নহে। আমি উভয়কে যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই এক ভাবের ভাবুক, এক পথের পথিক, এক উপাস্যের উপাসক, একই লক্ষ্যযুক্ত এবং একই প্রাণে অনুপ্রাণিত। বলিতে কি, তাঁহাদিগের জীবন, উদ্দেশ্য এবং কার্য্যে এতই সাদৃশ্য যে, দুই দেহে যেন একই প্রাণ বিরাজমান ছিল। উভয়েরই "কাব্যশক্তি ইহপারমার্থিক ভাব বা প্রেম পরিচালনার যন্ত্ররূপে নিয়োজিত হইয়াছিল।" প্রেম পরিচালনা শব্দে শ্রোতৃগণগুলী নিধুর টপ্পায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত ইহ জগতের ক্ষণস্থায়ী প্রেম (যাহাকে কাম আখ্যা প্রদান করিলে অসঙ্গত হয়না) বিবেচনা করিবেন না। তাঁহাদের হৃদয়ে সারস্বত প্রেমের যে শতধারা প্রবাহিত ছিল, তাহা গভীর-ভাব-সমাধি-মগ্ন যোগীর অন্তস্তল-নিহিত ঈশ-প্রেম-সুরতরঙ্গিনীর সহিতই একমাত্র তুলনীয়। বিষয়মদিরাপানোন্মত্ত অসংযত মানব সে প্রেমের অধিকারী নহে।

আরও এক কথা, সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় আজকাল লুপ্তকবির সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে প্রমাণিত হইতেছে যে, কবির আদর কালের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইবার নহে, সর্ব্বকালেই তাঁহাদের সমান আদর থাকে। সেই হিসাবে আমার আশা হয়, কবি বিহারীলাল ও কবি সুরেন্দ্রনাথেরও আদর আজকাল তত বেশী না থাকিলেও একদিন না একদিন এমন দিন আসিবে, যে দিন তাঁহাদের অতুল গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ সম্মান পাইবে। কবি-প্রতিভা মলিন হইবার নহে, কবির স্থান অতি উচ্চে, কবির কীর্ত্তি যেন চিরস্থায়ী। এ সম্বন্ধে আমি আর বেশী কি বলিব, কবিত্বসাধক কবি সুরেন্দ্রনাথই বলিয়া গিয়াছেন,—

রাশিচক্রে দ্বাদশাঙ্কে ব্যোম ঘটিকায়,
যাবৎ ঘুরিবে রবিশশী কাঁটা তায়,
যাবৎ গরজি ঘোর প্রলয় বাত্যায়,
আছাড়িয়া আকাশে না ভাঙ্গিবে ধরায়,

গ্রহরাশি নাদিয়া বিলাপি ঘোর স্বরে
যাবৎ না হবে পাত উন্মাদ সাগরে,
যাবৎ প্রকৃতি-নাড়ী কিঞ্চিৎ নড়িবে,
কবি-যশোরবি দীপ্ত তাবৎ রহিবে।

কবিকে বুঝাইতে হইলে, আপনি কবি হওয়া আবশ্যক। 'কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি'—সুতরাং আমার ন্যায় কবিত্ববিহীন লোকের চেষ্টায় যে আলোচ্য মহাকবিদ্বয়ের কবিতারসমাধুর্য্য সাধারণে যথাযথ প্রকাশিত হইবে, তাহা আশা করিতে পারি না। তবে গোষ্পদেও জল ধরে, আর তাহাতেও কোন কোন ক্ষুদ্র জীবের তৃষ্ণাও নিবারণ হয়। অথবা প্রবন্ধনিবদ্ধ তাঁহাদের অসামান্য জীবনের কয়েকটি ঘটনা ও তাঁহাদের কাব্যের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত কয়েকটি রত্ন নমুনা স্বরূপ দেখিয়া কাব্যামোদী সুধীবর্গের তাঁহাদের কাব্যসাগরে ডুবিবার ইচ্ছা হইলেও হইতে পারে।

আর একটী মাত্র কথা বলিয়া আমি প্রস্তাবনা শেষ করিব। আমাদের আলোচ্য কবিদ্বয়ের অল্পবিস্তর কবিতা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচারিত হইলেও তাঁহারা জনসমাজে আদৃত হন নাই। ইহার কারণ আমি অনুসন্ধানে যতটা জানিয়াছি, তাহাতে ইহাই বোধ হয় যে, যশোলাভ আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা পাঠক, সমালোচক বা পত্র-পত্রিকা-সম্পাদকের দ্বারস্থ হয়েন নাই। কাব্য লিখিয়া পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিব বা শিক্ষকের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষা প্রদান করিব, এ উভয়বিধ কোন উদ্দেশ্যেই তাঁহারা প্রণোদিত হয়েন নাই। সারদাপ্রেমে মগ্ন হইয়া নির্জ্জনে নিভৃতে আন্তরিক প্রেরণায় তাঁহারা আপনাপন মুরলীধ্বনি করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের সমকালবর্ত্তিগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই সে মুরলীরব শুনিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বেশ বলা যায় যে, যে কয়জন সৌভাগ্যবান্ সে মুরলীর আলাপ একবার মাত্র শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। মুঙ্গেরের পীর পাহাড়ের বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশই সুরেন্দ্রনাথের মহাকাব্য "মহিলা"র জন্মস্থান—একথা এখানে বলা যাইতে পারে। সারদাপ্রেমে মজিয়া তাঁহারা কিরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাদের নিজ নিজ রচনাই এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

বিহারীলাল ;—

"হে সারদে দাও দেখা,
বাঁচিতে পারিনা একা

কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়,
কি বলেছি অভিমানে
শুনোনা শুনোনা কাণে,
বেদনা দিওনা প্রাণে, ব্যথার সময়।"
"দেখিয়ে মিটেনা সাধ
কি জানি কি আছে স্বাদ
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভআননে,
কি এক বিমল ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি,
হাসিছে অমরাবতী নয়ন কিরণে।"
"যে কদিন আছে প্রাণ
করিব তোমার ধ্যান
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙ্গা চরণ তলে।"
"ভক্তি ভাবে এক তানে
মজেছি তোমার ধ্যানে
কমলার ধন মানে নহি অভিলাষী।"

সুরেন্দ্রনাথ ;—

দীর্ঘকাল পরে কেন এ ভাব আবার
কেন এ কটাক্ষ লালসার
কিবা না ঘটেছে প্রেমে সারদা তোমাব
বাকী কিবা রেখেছো আমার ?
ভোগ যশ আশা গেছে আছে মাত্র প্রাণ !
মধুগন্ধ কান্তিহীন কুসুম সমান !
ভুলে আছি, ভাল আছি, হৃদয় কন্দর
দগ্ধ হয়ে হয়েছে কঠিন ;
লোভের সিঞ্চনে আর গলে না অন্তর !
পরীক্ষায় হয়েছি প্রবীণ।
সুখ-দুঃখ-হীন সুখ এমন আমার !
চন্দ্রাননি ! তুমি কেন বৈরী হও তার ?
জেনেছি তোমায়, তুমি জেনেছ আমায়,

জানি তব প্রেম হলাহল ;
আমার মত্ততা নাই গোপন তোমায়,
প্রেমে কভু নাহি জানি ছল।
না বুঝে পিরিতে পড়ে, বুঝে তার পর,
বহু দুঃখে ভুগে তবে হয়ে আছি পর !
চেয়ে দেখ অঙ্গে মম, ভেবে দেখ মনে,
দেখেছিলে প্রথমে যেমন !
কালে না নিন্দিতে পারি এ পরিবর্ত্তনে,
দেহে জরা—বয়সে যৌবন !
তব প্রেম চিন্তা, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুধার,
উড়ে, পুড়ে, ধুয়ে নিলে প্রাণের সুসার !!!

সারদাপ্রেমের অধিকারী হইয়া কবি আপনাকে যে কতদূর ধনী জ্ঞান করিতেন, কবি বিহারীলালের এই কয়টি কথাই তাহার প্রমাণ :—

মরুময় ধরাতল
তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি,
ভোর হ'য়ে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার !—
তোমায়, দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার !

কবিদ্বয় কিরূপ আত্মত্যাগী হইয়া সারদাপ্রেম সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। তাঁহাদের সাধ্য বস্তু নারীজাতিকে তাঁহারা কিরূপ পক্ষে দেখিতেন, এক্ষণে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তাঁহারা নারী জাতিকে যেরূপ সম্মান করিতেন এবং যে ভাবে সেই সম্মান দেখাইয়া গিয়াছেন, সে দেবভাবের মহত্ত্ব এ পৃথিবী কি কখন বুঝিতে পারিবে ?

বিহারীলাল ;—

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী

জগতের হিতে সতত রতা,
পুণ্য তপোবন্ সরলা হরিণী,
বিজন কানন কুসুম লতা !
প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর,
করুণানিঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

সুরেন্দ্রনাথ ;—

বাক্যে গুণ কি বর্ণিব ললনা তোমার
ভাবিয়া না হৃদে পায় পার,
হেন বিজ্ঞ কেবা, যে হইবে টীকাকার
বিধির বিচিত্র কবিতার ?
তুমি লক্ষ্মী নিলয়ের,
বাণী কাব্য মানসের,
ভ্রূবিলাসী ধী মূর্ত্তি দুর্গার,
রাসরসময়ী রাধা প্রেমিক আত্মার।
সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার,
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,
কি বুঝাব ভাব রমণীর ?
মণিমন্ত্র মহৌষধি সংসার ফণীর।

আলোচ্য কবিদ্বয় নারীজাতিকে উপাসনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উভয়েই কোন বিশেষ রমণীকে নায়িকারূপে কল্পনা করেন নাই। কবি সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন ;—

কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটুস্তুতি না চাই রচিতে ;
সমুদয় নারী জাতি নায়িকা আমার

(তবে) বাঞ্ছা চিতে বিশেষ বর্ণিতে;
স্মরি চির উপকার,
দিব গীত উপহার,
শুধিবারে ধার মমতার,
মায়াকায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার।

বিহারীলাল লিখিয়াছেন ;—

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে কদিন বাঁচি তব্ গো নারী!
উদার মধুর মূরতি তোমার,
যেন প্রাণ ভরে আঁকিতে পারি।

কবিদ্বয় জগতের সমস্ত নারীকে নায়িকা কল্পনা করিয়া প্রেমে যেরূপ বিভোর হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া গেল। তাঁহাদের এই প্রেমের বস্তু—যাহাকে সমস্ত নীতিশাস্ত্র অশেষ অমঙ্গলের আকর বলিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার চিহ্নিত কিঙ্করী বলিয়া, অথবা পাপের অগ্রগামিনী দূতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই নারীজাতিকে কবিদ্বয় কি অপূর্ব্ব মহান্ উচ্চাসনে স্থাপন করিয়া আপনারা দেখিতেন ও লোককে দেখিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে।

সুরেন্দ্রনাথ ;—

বিষয় মদিরা পানে মত্ত চিত যার,
তারে কি পারিব বুঝাইতে ?—
ধাতার করুণা মর্ত্ত্যে নারী অবতার
নর হৃদি বেদনা বারিতে;
তার মনে আছে স্থির,
কামপিপাসার নীর,
নারীর কি প্রয়োজন আর ?
ভোগের পদার্থ নারী গরিমা কি তার।
হে বর্ব্বর নর! গতি কি হতো তোমার
বিহনে অঙ্গনা অবতার ?
কে গাঁথিত প্রেম-সূত্রে সমাজের হার
পিতা, মাতা, কুমারী, কুমার ?

দয়াধর্ম্ম শিখাইয়া
কোমল করিয়া হিয়া,
কে করিত সভ্যতা স্থাপনা ?
কে পুরাতো স্বর্গচ্যুত আত্মার কামনা ?
সেই দেশ সভ্য, যথা ললনা পূজিতা,
কাব্য শ্রেষ্ঠ, নারী বর্ণনায়,
সেই গৃহ, হৃদে যার নারী বিহরিতা,
পরিবার, নারী তুষ্টা যায় ;
অধ্যাত্মবিদ্যার সার,
রীতিজ্ঞান ললনার,
নারী কর্ম্ম ধর্ম্ম এ সংসারে ,
সেই ধন্য পুরুষ, আদরে নারী যারে।

বিহারী লাল ;—

হেন ধরাধাম থাকিতে সম্মুখে
সুরলোকে লোকে কেনরে ধায় !
নরে কি অমরে আছে মনোসুখে,
যদি কেহ মোরে সুধাতে চায়।—
অবশ্য বলিব নারীর মতন
সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা,
নাই যেই স্থানে নহে সে এমন ;
শচী পারিজাত কপোলকথা।
এ মর্ত্ত্য ভুবন কমল কাননে
নারী সরস্বতী বিরাজ করে !
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে,
পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে !

অস্মদ্দেশে নারীগণের অবরোধপ্রথা প্রচলিত আছে। এ প্রথা কোথা হইতে আসিল, কে আনিল বা কেন আসিল, তাহা ঐতিহাসিকগণের আলোচ্য বিষয়। কেহ কেহ বলেন,—উহা আমাদের দেশে আবহমান কাল প্রচলিত আছে ; অপর অনেকে বলেন, উহা মুসলমান রাজত্বকালে তাহাদিগের পরদানশিন্ প্রথা হইতে অনুকৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, বহু শিক্ষিত লোকে এ প্রথার

পক্ষপাতী নহেন। এ প্রথা নির্য্যাতন বা অত্যাচার বলিয়া তাঁহাদের নিকট বিবেচিত হয়। উক্ত অবরোধপ্রথা সম্বন্ধে আমাদের আলোচ্য কবিদ্বয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়েও উভয় কবিরই মত এবং সিদ্ধান্ত এক।

কবি বিহারীলাল বলিতেছেন ;—

অন্দর মহল, অন্ধ কারাগার
বাধা আছি সদা ইহার মাঝে
দাসীদের মত খাটি আনিবার
গুরুজন-মন-মতন কাজে।
পান থেকে চুণ খসিলে হঠাৎ
একেবারে আর রক্ষা নাই
হয়ে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত
কোণে ব'সে কুণো গুঁতুনি খাই।
অনায়াসে দাসী ছেড়ে চলে যায়
খামকা গঞ্জনা সহিতে নারি
অভাগীর নাই কিছুই উপায়
কেন দাসী আমি কুলের নারী!

সুরেন্দ্র নাথ বলিয়াছেন ;—

আপনার ঘর হয় কারাগার কার?
এ প্রহেলি উত্তর—হিন্দুর মহিলার।
কেন না বাহিরে যেতে অধিকার তার?
আত্মীয় পুরুষ সনে
কেন বাধা আলাপনে
কেন দোষ স্বামী সনে স্বাধীন ব্যভার?
স্বাধীন ব্যাভারে হবে স্বভাব দূষিত—
হায় হায় হেন ভ্রম অজ্ঞের উচিত।
বান্ধাজল, স্রোতজল দেখেছে যে জন,
সে জেনেছে পরীক্ষায়
আগে কে বিকার পায়,
বহু দোষ তথা, যথা বহু আবরণ ;

কে দেখে উৎসুকে তত বিমুক্ত বদন ?
প্রহার করিলে শিশু হবে সুশিক্ষিত,
সতী রবে রমণী রাখিলে আবরিত—
অঙ্কুচিত এ সকল ভ্রমের ভাণ্ডার ;
দৈত্য শির বিরাজিতা
পেটিকায় নিরোধিতা
ভাব মনে সে ললনা, আরব্য কথার,
বুঝ মর্ম্ম স্মরি তার অঙ্গুরীর হার।
হেন দৈত্য সম হয় আচরণ যার
হেন দৈত্য সম সে ভাজন বঞ্চনার।
আত্মীয় নিকটে অবগুণ্ঠন লম্বিত
পথ দিয়া চলে যারা
পরিচিত আছে তারা
সে নারীর মুখ বুক কেমন রচিত
গবাক্ষের দ্বার তার চির বিকসিত।
অজানিত অশিক্ষিত ভৃত্য হেন জন
তার সনে করে বধূ হাস্য আলাপন ;
আত্মীয়ের সম্ভাষণে বাধা শুধু তাঁর,
কোথা আছে হেন বিসদৃশ ব্যবহার।

কবিদ্বয়ের নারী উপাসনা যে একই উচ্চ আদর্শে রচিত হইয়াছিল, তাহা উপরের উদ্ধৃতাংশ সকল হইতে বেশ বুঝা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মানুষ মানুষকে কি ভয়ানক ভাবে পীড়া দিতে পারে এবং সেই পীড়ায় পীড়িত হইয়া হৃদয়বান্ লোকে কিরূপ ঝালা পালা হইয়া মনুষ্যসমাজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহারও সুস্পষ্ট ছবি উভয় কবিই একই রঙে একই তুলিকায় আঁকিয়া গিয়াছেন।

বিহারীলাল ;—

সর্ব্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন
চারিদিকে ঝালা পালা
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা !
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

লোক মাঝে দেঁতো হাসি হাসি
বিরলে নয়ন জলে ভাসি
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে
মাঠে শুয়ে দূর্ব্বা দলে
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।
শূন্যময় নির্জ্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।

কবি জনকোলাহলপরিপূর্ণ স্বার্থভরা সমাজের অঙ্গগত না থাকিয়া জনমানবহীন কোন প্রদেশে যাইবার ইচ্ছা কেমন প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম
পড়ে আছে ভগ্ন অবশেষ,
প্রবেশিতে যাহার ভিতর
ক্ষীণে প্রাণী নরে, ত্রাসে মরে,
যথায় শ্বাপদ দল
করে ঘোর কোলাহল
ঝিল্লি সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
তথা তার মাঝে বাস করি
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী
আর কারে করি ভয়?
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।

সুরেন্দ্রনাথ ;—হে শোভিতা শ্যামলা সফলা বসুমতী!
বিদরে হৃদয়, ভাবি তোমার দুর্গতি!
বনস্পতি ওষধি মধুর ফুল ফল ;
মধুময়ী স্রোতস্বতী,
মধুর ঋতুর গতি,

যত কিছু ধর তুমি মধুর সকল ;
অমঙ্গল মূল মাত্র মানব কেবল !
প্রবঞ্চনা, অনাদর, তাচ্ছিল্য, পীড়ন,
কোপদৃষ্টি, কটুবাক্য, তাড়ন, বন্ধন,
হায় হায় কবে যাবে এসব তোমার !
ভুজঙ্গে দংশিলে পরে,
হয় ত্বরা প্রাণে মরে,
না হয় ভেষজ বলে পায় প্রতিকার ;
নরে নর দংশিলে ঔষধ নাহি তার !!!
নরের পীড়নে নর কাতর যখন,
পার কি ধরণী ব্যথা হরিতে তখন ?
ফুল্ল ফুল সৌরভ বা মধুর মলয়,
যে কিছু মধুর তব,
অতি তিক্ত হয় সব,
কিছুতে শীতল নয় তাপিত হৃদয় !
চায় মৃত্যু, মৃত্যু তার আজ্ঞাকারী নয়।
হায় হায় বিচিন্তিয়া কম্পিত অন্তর !—
শ্বাপদে শ্বাপদে হেন নরে হানে শর !
নিবিড় নিশীথে আসি দস্যু বধে প্রাণ !
সৈন্যদলে পরস্পরে
রণভূমে মারে মরে !
সঙ্গোপনে ভোজনে শত্রুর বিষদান !
হা অবনী, কে অভাগা তোমার সমান !!

বাঙ্গালী বাহিরে দুর্ব্বল ও গৃহে প্রবল। বাহিরে পদাঘাত সহ্য করা এবং গৃহে আসিয়া ঝাল ঝাড়িয়া লওয়া, এই দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে কবিদ্বয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

বিহারীলাল—বাহিরে ইহারা সহিয়ে সহিয়ে,
ম্লেচ্ছ পদাঘাতে পিষিত হন ;
রাগে ফুলে ফুলে গৃহেতে আসিয়ে,
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।

হায়রে কপাল! পুরুষ সকলে,
বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি,
অমন করিয়ে কি হইবে বল,
ঠাডায়ে ভাঙিলে ঘরের হাঁড়ি?

* * *

গারদে রেখেছ দুঃখিনী সকলে,
অধীনতা বেড়ী পরায়ে পায়;
জান না কাহার সতীশাপানলে,
পুরুষের সুখ জ্বলিয়ে যায়!

সুরেন্দ্রনাথ—

বাঙ্গালী বাহিরে যায়,
কোথায় না মারি খায়!
বাঙ্গালী প্রবল মাত্র ঘরে আপনার!
সকলে প্রহারে যারে
সেই কেশে ধরে মারে,
কি লজ্জা কি অভাগা হিন্দুর মহিলার!
অন্ন না থাকুক ঘরে,
আগে গিয়া বিয়া করে,
প্রভুত্ব-লালসা-তৃপ্তি প্রয়োজন তার;
রমণী-হৃদয়ানলে,
দীর্ঘ-শ্বাস-বায়ু-বলে,
হে ভারত! দগ্ধ তুমি স্বর্ণলঙ্কাপ্রায়!—
কত সীতা কান্দে দেখ সতত তোমায়!!

উভয় কবির উদ্দিষ্ট বিষয় এবং মতের সাদৃশ্য বোধ হয় আমরা এখন অনেকটা দেখাইতে পারিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আরও একটি বিষয়ে তাঁহাদিগকে একমত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, উহা তাঁহাদের রচনা সাধারণে প্রকাশ করিবার বিশেষ ঔদাস্য ও অরুচি। নিম্নলিখিত ঘটনাদ্বয় হইতেই ঐ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে। ১২৭৭ সালে সুরেন্দ্রনাথের জনৈক আত্মীয় কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার সবিতা সুদর্শন নামক ক্ষুদ্র কাব্যখানি ছাপাইয়া দেন। ইহাতে কবির নাম মুদ্রিত ছিল বলিয়া তিনি তাঁহার বিশেষ বিরক্তির হেতু হন। মুদ্রাঙ্কনে

ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক সুরেন্দ্রনাথ তাবৎ পুস্তক আবদ্ধ করেন। কেহ এক আধখানি দেখিতে পাইয়াছিলেন মাত্র!

দ্বিতীয় ঘটনা। এক সময়ে কোন লেখক, কোনও এক বাঙ্গালা মাসিকে প্রকাশ করিবার জন্য কবি বিহারীলাল বিরচিত অপ্রকাশিত কবিতাবলীর নিমিত্ত তাঁহার দ্বারস্থ হন ও সবিশেষ অনুরোধ করেন। লেখককে কবি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া কবি তাঁহাকে বলেন, তোমা অপেক্ষা আমি আমার কবিতাকে বেশী আদর করি। আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আর কোন অনুরোধ প্রকাশ করিও না। আরও একটি কথা কবির নিকট সর্ব্বদা শুনা যাইত। তিনি বলিতেন - কবির কবিতায় প্রাণ অনেক সময়ে থাকে না, সব সময়েও আসে না সুতরাং যে প্রাণে লেখা হইয়াছে, সেই প্রাণে আর একবার না দেখিয়া কিছু প্রচার করা কবির কর্ত্তব্য নয়।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা উভয় কবির মহান্ চরিত্র তুলনায় সমালোচনার হেতু প্রদর্শনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছি; এক্ষণে তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। সংগৃহীত ঘটনাবলী বহুসাময়িক হইলেও অনাদরণীয় নহে।

ক্রমশঃ।

বুদ্ধগয়ায় বিবেকানন্দ।

(শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।)

ইংরাজী ১৮৮৬ সাল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার গৃহী ভক্তেরা লালাবাবুর কাশীপুরস্থ বাগান বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন, আর তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁহাকে তথায় রাখিয়া কায়মনোবাক্যে সেবা করিতেছেন। প্রত্যেকেই তাঁহার সেবায় দিবানিশি নিযুক্ত, ঠাকুর কিন্তু স্বামীজির সেবা গ্রহণ করিতে পারেন না। বিবেকানন্দ সেবা করিতে গেলে তাঁহাকে নিবারণ করেন, বলেন, তোর অন্য পথ। ঠাকুরের কোন কথা মানিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলে, ঠাকুর বলেন, "তোর ও পথ নয়, তুই সব দেখে শুনে বুঝেনে।" ক্রমে গুরুর কৃপায় স্বামীজি বুঝিয়াছেন,

সকল বিষয় অনুভূতি করিয়া লইতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থও হইয়াছিলেন, প্রচার কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর। ঠাকুর বলিতেন, "আপনাকে মারিতে হইলে একটীমাত্র ছুঁচের আবশ্যক, কিন্তু অপরকে মারিতে হইলে ঢাল তরোয়াল প্রভৃতি সকল প্রকার অস্ত্রের আবশ্যক।" তাই বিবেকানন্দ অস্ত্র শস্ত্র স্বরূপ বেদ বেদান্ত ও নানা শাস্ত্রাদি অভ্যাস, এবং সন্ন্যাসী গুরুভাইগণ গুরু-সেবায় অবকাশ পাইলেই তাঁহাদের লইয়া পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞদিগের বিচার প্রণালী এবং তাঁহাদের মীমাংসার সহিত প্রাচ্য প্রথার তুলনায় বিচার মহা-আগ্রহের সহিত করিতেছেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে সন্ন্যাসী গুরুভাইগণের নেতা করিয়াছেন। অতএব এইরূপ শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধনার মধ্যে ঠাকুরের সেবার সকল প্রকার বন্দোবস্তও করিতেছেন। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হইল। স্বামীজির নিজের তীব্র বৈরাগ্য যেন বুদ্ধদেবের তীব্র বৈরাগ্যের সঙ্গে মিশিয়া গেল। তাঁহার প্রাণে প্রবল বাসনা হইল, বুদ্ধদেবের সাধনা ও সিদ্ধির স্থান দেখিবেন। দিন দিন সেই বাসনা ক্রমে এমন বাড়িয়া উঠিল যে, ঐ সিদ্ধ স্থান না দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না; তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই তখন বুদ্ধদেবের সেই বাক্য—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাম্ ন হি বাসনাৎ কায়মতিশ্চলিষ্যতে॥

কিন্তু গুরুদেবের সেবা স্বহস্তে না করিলেও সমস্ত ভার যখন তাঁহারই উপর, তখন কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবেন? গুরুদেব জানিতে পারিলে অবশ্যই প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, তাহার উপর প্রায় সকল গুরুভাইদের অমত হইবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ রামকৃষ্ণ সেনাদলের তিনি নায়ক স্বরূপ। সকলেই প্রায় বিবেকানন্দের উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বাড়ী ঘর কলেজের লেখা-পড়া পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে ঠাকুরের সেবাই জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য ধ্রুব নিশ্চয় করিয়াছেন এবং কার্য্যেও সেই মত করিতেছেন; এমন সময়ে স্বামীজি অন্যত্র চলিয়া গেলে কি হইবে? এই চিন্তায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। বুদ্ধ গয়ায় যাইবার বাসনা কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধকে আরও জ্বলিয়া উঠিতেছে। ক্রমে তাঁহার চিন্তা নিবৃত্ত হইয়া আসিল, গুরুদেবের উপর অচল বিশ্বাস—তিনি দেখিলেন, যাঁহার জন্য এত চিন্তা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলকর্ত্তা ভগবান্, বিবেকানন্দ নিজেই তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছেন। স্বামীজি বুদ্ধগয়া গমনে স্থিরনিশ্চয় হইলেন।

চৈত্রমাস, একদিন বৈকাল বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় শিবানন্দ এবং অভেদানন্দকে সঙ্গে লইয়া বিবেকানন্দ বাগানের পশ্চাদ্‌ভাগের ছোটদ্বার দিয়া গোপনে বাহির হইলেন। পদব্রজে তিনজনে আলমবাজারের ঘাটে আসিয়া নৌকা করিয়া অপর পারে উঠিয়া বালি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনুসন্ধানে জানিলেন, গয়া যাইবার সুবিধা মত গাড়ী পরদিন প্রাতঃকালে পাইবেন। সেরাত্রি নিকটবর্ত্তী একটী দোকানে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই তিনটার সময় সকলকে উঠাইয়া খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া আহার করিয়া পুনরায় ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলেন। রাত্রি বারটার সময় বাঁকিপুরে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দোকানে বিশ্রাম করিয়া প্রত্যুষে গয়ার গাড়ীতে উঠিলেন। কাশীপুর বাগান ত্যাগ করিয়া অবধি বিবেকানন্দের মুখে বুদ্ধদেব, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ত্যাগ, বৈরাগ্য, সত্য লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, তাঁহার ঘোরতর কঠোর সাধনা, অবশেষে বহুজন্মদুর্ল্লভ বোধি জ্ঞান বা নির্ব্বাণ লাভ, এই সকল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা ছিল না।

বেলা এগারটার সময় গয়ায় পঁহুছিয়া স্বামীজি বলিলেন, "চল্, ফল্গুতে স্নান করা যাক্।" ষ্টেশন হইতে ফল্গু প্রায় এক মাইল পথ। ফল্গু বালুকাময়, মধ্যে অতি সংকীর্ণ স্রোত, জানুপরিমাণ জল, অতি স্নিগ্ধ নির্ম্মল। স্নান করিতে করিতে বিবেকানন্দ আবার বলিলেন, "আয়, রামচন্দ্র যেমন বালির পিণ্ডি দিয়েছিলেন, আমরাও তেমনি বালির পিণ্ডি দিই।" সকলে তাহাই করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী শিবালয়ে আসিয়া সকলে মিলিয়া ডাল রুটি রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন। একটু বিশ্রামের পর বৈকালে বুদ্ধগয়া যাত্রা করিলেন; প্রায় চারি ক্রোশ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর তথায় উপস্থিত হইলেন ও রাত্রে আহারান্তে ধরম শালায় যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যুষে বোধি মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। ললিতবিস্তর ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ স্বামীজির বিশেষরূপ পড়া ছিল। সেই সকল গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সাধনাবস্থায় তাঁহার যে রূপ প্রগাঢ় সত্যপিপাসা ইত্যাদি ভাবের উদ্রেকের কথা বিবৃত আছে, বোধি মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিবেকানন্দের স্মৃতিতে সেই সকল ভাব যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গিগণের মনে হইল, যেন তাঁহারা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক লোক; সকলেই বুদ্ধদেবের ভাবে একেবারে বিভোর হইলেন।

মন্দিরের প্রথমতলে উচ্চ প্রস্তরময় আসনের উপর বুদ্ধদেবের যে ধ্যান মূর্ত্তি স্থাপিত, তাহার সম্মুখে বিবেকানন্দ দুই গুরুভ্রাতার সঙ্গে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যানস্থ হইলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধ্যানের পর উঠিয়া আগত

মোহান্ত মহারাজের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা কহিলেন। স্বামীজির সহিত আলাপে মোহান্ত মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনারা যত দিন ইচ্ছা এখানে থাকুন। ভোজনাদি মঠে যাইয়াও করিতে পারেন বা অনুমতি হইলে এখানেও পাঠাইয়া দিতে পারি।" স্বামীজি বলিলেন, "আমরা মঠে যাইয়াই ভোজন করিয়া আসিব।" আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিন জনে বোধি মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যাহা যাহা দেখিবার আছে সমস্ত দেখিলেন। মঠ ও অন্যান্য স্থানও দেখিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন বোধিমন্দির একেবারে জনশূন্য ও নিস্তব্ধ হইল, তখন বিবেকানন্দ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া বোধি দ্রুমের নীচে প্রস্তরানির্ম্মিত আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ ধ্যানের পর হঠাৎ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া পার্শ্বস্থিত গুরুভ্রাতাকে দুই হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। গুরুভ্রাতা চমকিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময় তিনি পুনরায় গভীর ধ্যান মগ্ন দেখিয়া বিরত হইলেন।

তিন দিবস এই প্রকারে বোধি মন্দিরে বাস করিবার পরে একদিন স্বামীজি ফল্গুর পূর্ব্ব ধারে মোহান্তের যে শাখা মঠ আছে, তাহা দেখিতে যান এবং তথায় সেই রাত্রি অবস্থিতি করিয়া পরদিন পুনরায় বোধি মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন যে, পীড়িত গুরুদেবের অজ্ঞাতসারে তাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন, এজন্য কাশীপুরে সকলেই তাহাদের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিবেন। এজন্য এখন তাঁহাদের কলিকাতায় যাওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছেন। স্বামীজির যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্তর করিলেন, তবে চল, হাঁটিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক্, কত নূতন নূতন দৃশ্য দেখা হবে, নানা রকম অবস্থার ভিতর দিয়ে যাওয়া হবে, অনেক জ্ঞান জন্মাবে। কিন্তু আবার চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, পদব্রজে যাইলে অনেক বিলম্ব হইতে পারে, তাহাতে সকলের উৎকণ্ঠা আরও বাড়িবে। এ জন্য সকলে ট্রেণে করিয়াই কলিকাতা ফিরিলেন। কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হইয়া গুরুচরণে প্রণিপাত করিলেন, গুরুদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না; গুরুভ্রাতাগণও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে হরি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

সমালোচনা।

সংসার-দীপিকা। শ্রীজানকীনাথ পাড়ে বি, এ প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৵০ আনা।

জানকীবাবু নিজ পুত্রবধূ ও কন্যার শিক্ষার্থ এই বিবিধ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৪০ পৃষ্ঠার এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি একখানি উত্তম স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক। সংসারে থাকিয়া কিরূপে উত্তমরূপে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় অথচ ধার্ম্মিক হওয়া যায়, তাহা অতি সরল ভাষায় এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। অসার নাটক নভেলের পরিবর্ত্তে এইরূপ পুস্তকের সমাজে বহুল প্রচার হইলে সংসারে সুখশান্তির সীমা থাকে না। আমরা এই পুস্তকখানি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিলে সবিশেষ সুখী হইব।

অবধূত গীতা। মহর্ষি দত্তাত্রেয় প্রণীত। বাম রাম সংযমী নকুলাবধূত প্রকাশিত। প্রকাশকের নিকট টালিগঞ্জ পোঃ (কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

অদ্বৈত বেদান্তের চরমানুভূতি বিষয়ক মহর্ষি দত্তাত্রেয় প্রণীত এই গ্রন্থখানির মূল সংস্কৃত বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত করিয়া সংযমী মহাশয় বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে কি সিদ্ধ, কি সাধক, কি বিষয়ী, সকলেরই অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়, সংসার তুচ্ছ বোধ হয় ও ব্রহ্মকে করতলামলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। পুস্তকখানির চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টেই বোধ হয়, গ্রন্থখানির বাঙ্গালী সমাজে আদর হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে আমরা উদ্বোধনে জাতীয় উন্নতির উপায় সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। জাতীয় উন্নতির আদর্শ---সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ব বিষয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া। এই উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে এখনও আমাদের বহুশতাব্দীব্যাপী কঠোর সাধনার প্রয়োজন। সাময়িক উত্তেজনাও ভাল বটে, কিন্তু সেই বাঁশের আগুনকে সর্ব্বদা পাখার বাতাস দ্বারা জীবন্ত রাখিতে

হইবে। উপায়—এক দল স্বদেশ-হিত-ব্রত, সংসার-সম্বন্ধ-রহিত যুবক দলের সংগঠন। সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত মূল সত্যগুলির উপর এই সম্প্রদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক; নেতৃবর্গের আজ্ঞাবহতা, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগ ইঁহাদের মূলমন্ত্র হইবে। সনাতন ধর্ম্মের মূল সত্য গুলিতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্থান নাই। সেই মূল সত্যগুলি আপামর সাধারণে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রচারের দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ রূপে নিজেদের হস্তে গ্রহণ করা প্রধান লক্ষ্য হইবে। এতদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য জাতির ভিতর সনাতন ধর্ম্মের বিস্তার দ্বারা তাঁহাদের গুরুস্থানীয় হইয়া তাঁহাদের শিল্প বিজ্ঞানাদি সর্ব্ববিধ বিদ্যা গুরুদক্ষিণা স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের আপামর সাধারণকে ধর্ম্মের সহিত অন্ন বিস্তর এই বিদ্যার অংশী করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। এক্ষণে যেমন মধ্যে মধ্যে যুবকগণকে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার্থ এমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হইতেছে, ইহার প্রসার আরও বর্দ্ধিত করিয়া যাহাতে তাঁহারা দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেশের লোককে তাঁহাদের শিক্ষার ভাগী করিতে পারেন, যাহাতে দেশের লোক-দিগের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কল কারখানা স্থাপিত হইয়া তাঁহাদের বিদ্যাকে কাজে লাগাইতে পারা যায় এবং যাহাতে আমাদের আবশ্যকীয় সর্ব্বপ্রকার নিত্য-ব্যবহার্য্য ও বিলাসোপকরণ দ্রব্যজাত স্বদেশে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সংক্ষেপে [illegible] সাধনার [illegible] দীর্ঘকালব্যাপী ও কঠোর [illegible] সামাজিক শক্তি বা অর্থাভাবে ক্ষুণ্ণ হয় বা বিষাদাক্রান্ত না হইয়া নিষ্কাম ভাবে প্রাণপণে জাতীয় ব্রতসাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশ আলোচনা, হিন্দুশাস্ত্রচর্চ্চা ও যথাসাধ্য সর্ব্বভূতের সেবার জন্য বিগত ১৫ই আষাঢ় বরিশালে 'রামকৃষ্ণ সমিতি' স্থাপিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত উক্ত সমিতির নয়টী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

গত ১৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ডাক্তার বাবু লালবিহারী সেন গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির ১ম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাগৃহ সুন্দর পুষ্প-গুচ্ছে সুশোভিত হইয়াছিল। গৃহের উত্তর পার্শ্বে এক ফুলদামপরিশোভিত প্রকোষ্ঠে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্র এবং তাহার নিম্নস্তরে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দজীর প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হয়। সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী একটী স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপর বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক "সমিতির" নিয়মাবলী পাঠান্তে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিয়মগুলি "রামকৃষ্ণ সমিতির" নিয়মাবলীরূপে পরিগৃহীত হয়। তদনন্তর বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরীর প্রস্তাব ক্রমে এবং সত্যেশ্বর নাগ মহাশয়ের অনুমোদনে পূজ্যপাদ শরৎ বাবু সভাপতির

আসন পরিশোভিত করতঃ স্বামীজির প্রিয় কঠোপনিষৎ হইতে নচিকেতার উপাখ্যান পাঠ করেন। অতঃপর পরমহংসদেবের জীবনালোচনা করা হয়। সভাপতি মহাশয় পরমহংসদেবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, এবং আর একটী স্তোত্র পাঠান্তে তাঁহার সুললিত স্বরে একটী গান করেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে এই সভাতে ধর্ম্ম পুস্তকাদি পাঠ করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তৎপর প্রেমানন্দ দাস গুপ্ত সভাপতি মহাশয়কে এবং সত্যেশ্বর বাবু প্রভৃতি যাঁহাদিগের পরিশ্রমে ও চেষ্টা দ্বারা সভাটী গঠিত হইল, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদানের পর পরমহংসদেবের নামে জয়ধ্বনি করতঃ সভাভঙ্গ হয়। সমবেত সভ্যগণ ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সভায় প্রায় ২০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

গত ৯ম অধিবেশনের দিন কয়েকটী ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বন্ধু যোগদান করিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাগলপুরে প্লেগনিবারণোদ্দেশে সহর পরিষ্করণ কার্য্যে বেলুড়মঠ হইতে যে তিন জন ব্রহ্মচারী প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সোৎসাহে কার্য্য করিতেছেন। কয়েকটী স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে আরও লোকের প্রয়োজন। অসার হুজুকে না মাতিয়া এইরূপ যথার্থ কার্য্য করিতে দেশের লোককে, বিশেষতঃ যুবকবৃন্দকে অগ্রসর হইতে দেখিলে সুখী হইব।

বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত চলিতেছে। স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ ছাত্রগণকে পঞ্চদশী, শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, এই আশ্রমের ব্যবহারার্থ স্থানীয় জরীপ বিভাগের বালাজী ধোন্দেবা একখানি নীলকণ্ঠ টীকা সমেত সংস্কৃত মহাভারত ও সিং মুদ্দায়া নামক জনৈক স্থানীয় বিখ্যাত শিল্পী স্বামীজির একখানি সুন্দর ফটো ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট (২৫″ × ১৭″) উৎকৃষ্ট ফ্রেমে বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কার্য্যের দিন দিন প্রসার হইতেছে। বিগত জুলাই মাসে ১০২ জন সাধু ও ১৬৬ জন গরিব গৃহস্থ আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া গিয়াছেন। ৮ জন সাধুকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। আশ্রমের জমা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৩৪৲ টাকা, খরচ প্রায় ৫০৲ টাকা। দুই জন সহৃদয় বন্ধু চাল ডাল আটা প্রভৃতি দিয়া অনেক সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়।

প্রতি বৎসর আমরা এক মাস ছুটি লইয়া থাকি। এবারে ১লা চৈত্র এক পক্ষের জন্য ছুটি লওয়া হইয়াছিল। আগামী ১৫ই আশ্বিন পুনরায় এক পক্ষের জন্য ছুটি লওয়া হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

পিতামাতা ও জন্মকথা।

(শ্রীগুকদাস বর্ম্মন্)

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর নামক গ্রামে। তাঁহার কুটীরখানি গ্রামের সদর রাস্তার উপর। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র বটে, কিন্তু মহাতেজস্বী ও ত্যাগী; দিবানিশি আপনার গৃহ-দেবতা রঘুবীরের সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন। এই রঘুবীরের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক দিন খুদিরাম কোন কার্য্যবশতঃ দূরদেশে গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে রৌদ্রে ও পথশ্রমে কাতর হইয়া একটী বটবৃক্ষমূলে শয়ন করিলে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয়। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর বালকবেশে তাঁহাকে আসিয়া বলিতেছেন, "আমি এইখানে অনাহারে পড়িয়া আছি, তুমি আমায় গৃহে লইয়া গিয়া আমার সেবা কর।" এই স্বপ্ন দেখিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি ভাবিলেন, "স্থানটা একবার অন্বেষণ করিয়া দেখি, কি ব্যাপার।" অনেক অন্বেষণ করিয়াও কিছুই দেখিতে না পাইয়া পুনরায় চিন্তা করিলেন, "যদি ব্যাপারটী সত্য হয়, আমি পুনরায় নিদ্রিত হইলে পুনরায় ঠাকুর আমায় স্বপ্নে তিনি কোন্ স্থানে আছেন, ঠিক জানাইয়া দিবেন।" খুদিরাম এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যে স্থলে শুইয়া

আঁছেন, তাহার সন্নিকটে ঠাকুর মাটীর ভিতর অর্দ্ধপ্রোথিত ভাবে ঘাসে আবৃত আছেন। খুদিরাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া হস্তদ্বারা দীর্ঘ তৃণগুলি ফাঁক করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, এক কাল-ফণী ফণা বিস্তার করিয়া একটী শালগ্রাম শিলাকে ক্রোড়ে করিয়া রক্ষা করিতেছে! খুদিরাম ভীত ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের বিষয় মনে হইল, ভাবিলেন, "ভগবান্ নিজের সেবা কত্তে বল্‌ছেন, সাপকে আবার ভয় কেন?" ভয় দূর হইল। তিনি হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র কালফণী অন্তর্হিত হইল। তিনি শালগ্রাম শিলাটী উঠাইয়া অতি যত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া দ্রুতপদে নিজ গৃহে আসিলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন রঘুবীর। তদবধি খুদিরাম রঘুবীরের সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত। এত দারিদ্র্য সত্তেও তিনি আজন্ম কোন প্রকার বিষয় কর্ম্ম, ভিক্ষা বা শূদ্রের নিকট দান পরিগ্রহ করিতেন না। তাঁহার কুটীরের কিয়দ্দূরে অতি সামান্য একটুকরা ধানজমি। সেই জমিতে তিনি 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া ধান ছড়াইয়া দিতেন, এবং তাহাতেই যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাই তাঁহার সংসারের সম্বৎসরের সংস্থান। উক্ত জমিতে অজন্মা কখনও হয় নাই।

গ্রামের জমিদার লাহাদের একটী অতিথিশালা আছে। এই পথে গমন কালে সাধু সন্ন্যাসীর সেই স্থানেই বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া যাইবার সকল প্রকার ব্যবস্থা আছে। তথাপি এমন দিন নাই যে, খুদিরামের বাড়ীতে দুই এক জন অতিথি নাই। খুদিরামের পত্নী চন্দ্রাদেবী এই সকল অতিথির জন্য রন্ধন ও ইঁহাদের পরিচর্য্যা স্বহস্তে করিতেন, এজন্য প্রত্যহই তাঁহার আহার করিতে অপরাহ্ন হইয়া পড়িত। গ্রামের সদর রাস্তার উপর বাটী; অতিথিগণের সেবা করিয়া পথের ধারে দণ্ডায়মান হইয়া লোকমুখে সমস্ত গ্রামের মধ্যে দরিদ্র অভুক্ত আর কেহ আছে কি না সংবাদ লইয়া তৎপরে স্বয়ং ভোজনে বসিতেন। কখন বা সন্দেহ হইলে সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া আর কোন অভুক্তের সন্ধান না পাইলে তবে আপনি আহার করিতেন। পর্য্যটন করিয়া কোনও দরিদ্রকে পাইলে তাহাকে কিছু খাইতে না দিয়া ছাড়িতেন না। এই সকল ঘটনা আশি নব্বই বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত। কিন্তু অদ্য কালমাহাত্ম্যে এ কথাগুলি অলীক স্বপ্নবৎ মনে হয়।

খুদিরামের দুই পুত্র ও একটি মাত্র কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম রামকুমার, দ্বিতীয় রামেশ্বর এবং কন্যাটীর নাম কাত্যায়নী। নিধিরাম ও কানাই খুদিরামের দুই ভ্রাতা এবং রামশীলা তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী। রামশীলার স্বামী দেরেপুর নিবাসী ভাগবৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহাদের একমাত্র পুত্রের নাম রামচাঁদ ও একটী মাত্র কন্যার নাম শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী। হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে জন্ম হয়। খুদিরাম তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন এবং নিজ কন্যাবৎ আপনার সন্তানগণের সহিত পালন করেন। খুদিরামের প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান মারা যান এবং খুদিরাম দ্বিতীয়বার সরাটী মায়াপুরে বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নী চন্দ্রাদেবীর সন্তানগণ প্রায় সকলেই উপযুক্ত এবং হেমাঙ্গিনীকে তাঁহারা সহোদরা ভগিনীর মত ভাল বাসিতেন। রামচাঁদকেও খুদিরাম খুব ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে যাইতেন। একবার অনেক দিন ধরিয়া রামচাঁদের কোনও সংবাদ না পাইয়া সংবাদ লইবার জন্য মেদিনীপুরে যাত্রা করেন। তাঁহার গন্তব্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া একটী বেলগাছে উত্তম সম্পূর্ণ বিল্বপত্র দেখিতে পাইয়া ঐ সুচারু বিল্বদলে শিবপূজা করিবার প্রবল বাসনা জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি নিকটস্থ বাজারে যাইয়া একটী বড় চুবড়ী ও একখানি গামছা ক্রয় করিয়া আনিলেন, ও অন্বেষণ করিয়া একটী পুষ্করিণীতে সেই গামছা ও চুবড়ী ধৌত করিলেন। চুবড়ী বিল্বপত্রে পরিপূর্ণ, তদুপরি জলসিক্ত গামছাটা আচ্ছাদন। চুবড়ী শিরোপরি ধারণপূর্ব্বক দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মেদিনীপুর হইতে কামারপুকুর প্রায় কুড়ি-ক্রোশ। খুদিরাম অবিশ্রান্ত দিবানিশি চলিয়া পরদিন প্রত্যুষে গৃহে উপস্থিত হইয়া স্নানান্তে পূজায় বসিলেন এবং পূজান্তে জলযোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে বাটীর সকলে মেদিনীপুরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে মেদিনীপুরে যাইতে পারি নাই। আহারান্তে এখনই যাইব।" তিনি তৎক্ষণাৎ আহার করিয়া মেদিনীপুর পুনর্যাত্রা করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। তিনি আজীবন ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত অধিক বয়সেও কঠোর পরিশ্রমে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। অদ্যাপিও কামারপুকুরে তাঁহার তপঃপ্রভাবের কাহিনী সুপ্রাচীন

লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রামবাসী তাঁহার এত বশীভূত ছিল ও তাঁহাকে এরূপ শ্রদ্ধা করিত যে, তিনি যে তড়াগে প্রত্যহ স্নান করিতেন, তাঁহার স্নানের পূর্ব্বে কেহ সেই পুষ্করিণীর জলস্পর্শে সাহসী হইত না। আরও কথিত আছে যে, কেহ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্যও তাঁহার পদস্পর্শে সাহস করিত না। খুদিরামের আকৃতি লম্বা, শরীর সুকোমল কিন্তু কৃশ, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী উত্তমকান্তিবিশিষ্ট, অতি মিষ্টভাষী, জীবনে কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ করেন নাই।

একদিন খুদিরাম তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা কাত্যায়নীর পীড়ার সংবাদ পাইলেন; সকলে বলে উপদেবতাগ্রস্ত। খুদিরাম দেখিতে গেলেন। কন্যার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভূতই হও কি কোন উপদেবতাই হও, এখনি আমার কন্যাকে ছাড়িয়া দেও, উহাকে আর কষ্ট দিও না।" তেজস্বী ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় উপদেবতা উত্তর করিল, "আমি আপনার কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু গয়ায় যাইয়া আপনি আমায় পিণ্ড দিয়া উদ্ধার করুন।" এই বলিয়া সে আপনার নাম গোত্রাদি তাঁহাকে জানাইল। খুদিরাম গয়াধামে যাইতে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন এবং কহিলেন, "তুমি উদ্ধার হইলে আমরা কি প্রকারে জানিতে পারিব?" ভূত বলিল, সে নিকটস্থিত নিম্ববৃক্ষে যে শাখায় বাস করে, গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপদে তাহার পিণ্ড দিবামাত্র সেই শাখাটী ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং যখনি খুদিরাম গয়াধামের জন্য যাত্রা করিবেন, তৎক্ষণাৎ কাত্যায়নীকে ছাড়িয়া যাইবে। খুদিরাম বলিলেন, তিনি পরদিনই যাত্রা করিবেন। তাঁহার আত্মীয়গণ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আপনি যৌবনাবস্থায় পদব্রজে রামেশ্বর তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন সত্য কিন্তু এ বয়সে আর আপনার পদব্রজে গয়াধামে যাইবার সঙ্কল্প করা উচিত নহে।" এইরূপ নানাযুক্তিসহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া সকলে তাঁহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পরদিন প্রত্যূষে গয়া যাত্রা করিলেন। এদিকে কাত্যায়নীও সুস্থ হইলেন। গয়াধামে উপস্থিত হইয়া খুদিরাম যেদিন যে সময়ে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলেন, কথিত আছে, এখানেও ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত নিম্ববৃক্ষের শাখাটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

পিণ্ডদান করিলে গয়াধামে তিন দিবস বাস করা বিধি। খুদিরাম সেই

বিধিমত গয়াধামেই আছেন ; একদিন রজনী প্রভাত সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন, ভগবান্ নবযৌবনসম্পন্ন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হইয়া তাঁহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া, মৃদু মধুর হাসিয়া বলিতেছেন,“আমি তোমার পুত্র হইয়া জন্মাইব।” খুদিরাম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,“প্রভু, আমি দরিদ্র, তোমার সেবা কেমন করিয়া করিব ?” ভগবান্ উত্তর করিলেন, “তোমার সেজন্য চিন্তার আবশ্যক নাই।” খুদিরাম জাগ্রত হইয়া অপার চিন্তাসাগরে ভাসিতে লাগিলেন,তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। ঠিক সেই দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাহ্নে চন্দ্রাদেবী তাঁহার সুপরিচিতা দুইটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাটীর অনতিদূরে একটী শিবালয়ের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পব কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন, শিবালয়ের দিক্ হইতে একটী জ্যোতি বায়ুতে পরিণত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশিল। তিনি অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাহার সঙ্গিনীদ্বয়কে সকল কথা জানাইলেন। এই দুই সঙ্গিনীর মধ্যে একজনের নাম ধনি কামারনী, ইনি চন্দ্রাদেবীর কথা বিশ্বাস করিলেন ; অপর স্ত্রীলোকটী ভাবিলেন, বোধ হয় চন্দ্রা দেবীকে ভূতে পাইয়াছে। গয়াধাম হইতে খুদিরাম বাড়ী আসিলে চন্দ্রাদেবী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে এইকথা জানাইলেন, এবং খুদিরামও সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রাদেবীকে নিজ স্বপ্নের কথা জানাইয়া কহিলেন, “দেখ, একথা খুব গোপন রাখিও, কোন মতে প্রকাশ করিও না এবং কোন ঘটনায় ভীত হইও না।” অবতারগণের দেহ শোণিতশুক্রজনিত নয়, এপ্রবাদ সকল ধর্ম্মেই আছে, এবং জড় বিজ্ঞানের এই চরমোৎকর্ষের দিনে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়া শিষ্যদের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপই বলিয়াছিলেন। দিন দিন চন্দ্রাদেবীর গর্ভ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্ন হইতে লাগিলেন। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে ভাবিলেন, এঁর এত বয়সে গর্ভ, তাহাতে এত রূপ কোথা হইতে আসিল! হয়ত এইবারে মরিবে। এই সময়ে তিনি অনেক প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন নানা দেব দেবীর দর্শন পান,কখন দেখেন গোপাল যেন নুপুর পায় দিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে। একদিন তিনি আপন কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে সুমধুর নুপুরধ্বনি প্রবেশিল ; তিনি চমকিত হইয়া ঘরের চারিদিক্ অন্বেষণ করিলেন,কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তৎপরে দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, ঘরে কেহই নাই,অথচ সেই নুপুরধ্বনি, যেন কেহ

নূপুর পরিয়া তাঁহার অতি নিকটে নৃত্য করিতেছে বলিয়া মনে হইল। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চন্দ্রাদেবী তাঁহার স্বামীকে সমস্ত কথা জানাইলেন। খুদিরাম তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এই সকল এবং আরও অনেক ঘটনা হবে আমি জানি, ইহাতেই আরও বোধ হয়, আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। তুমি ভয় পাইও না, ভয়ের কোনও কারণ নাই।" খুদিরাম সর্ব্বদা তাঁহাকে এই প্রকার বুঝাইতেন এবং এই বিষয় কাহারও সহিত চর্চ্চা করিতে নিষেধ করিতেন। স্ত্রীস্বভাববশতঃ চন্দ্রাদেবী তথাপি তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও এই সকল বিষয়ে গল্প করিতে ছাড়িতেন না।

এইরূপে দশমাস অতীত হইলে ১৮৩৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে চন্দ্রাদেবী স্বামীকে জানাইলেন যে, তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত। খুদিরাম বলিলেন,"সে কি কথা, তুমি আগে রঘুবীরের ভোগ রাঁধ, তাঁর সেবা হোক তবে,এখন কেমন করে প্রসব হবে ?"স্বামীর কথা শিরোধার্য্য করিয়া চন্দ্রাদেবী রঘুবীরের ভোগ রাঁধিলেন, তাঁহার সেবান্তে এবং সকলের আহারান্তে বেলা প্রায় তিনটার সময় শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্ম হইল। খুদিরামের আর আনন্দের সীমা রহিল না। "আমাদের কি সৌভাগ্য, আজ গদাধর স্বয়ং আমাদের সন্তান রূপে আসিয়াছেন !" এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এ দিকে চন্দ্রাদেবী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন, মরেন নাই শুনিয়া গ্রামস্থ স্ত্রীলোকগণ উপস্থিত হইলেন এবং আসিয়া সূতিকাগারে উঁকি মারিয়া নবজাত গদাইএর মুখচন্দ্র দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত ধনি কামারনি আসিয়া জুটিয়াছে। সে প্রসূতি ও প্রসূতের সেবায় স্বেচ্ছায় নিযুক্তা। ক্রমে নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও চন্দ্রাদেবীর সন্তান হইয়াছে দেখিবার জন্য এবং চন্দ্রাদেবী বাঁচিয়া আছেন কিনা, জানিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠী পূজাতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপন আপন কার্য্যগুলি তৎপর সারিয়া লইয়া আপনাপন সন্তানদের গৃহে ফেলিয়া গদাইকে কোলে লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিতেন এবং গদাইও সকলের কোলে যাইতেন। যিনি একবার সেই সুন্দর শিশুটীকে কোলে করেন, তাঁহার আর, তাহাকে অপরের কোলে দিতে ইচ্ছা হয় না।

ক্রমশঃ

বঙ্গে অকালমৃত্যু

প্রতীকারের উপায়।

ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম বি] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বঙ্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বহুবৎসর যাবৎ, বঙ্গ, বিহার, ও উড়িষ্যায়, ভীষণ অতি-মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি, ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত, মহামারী (প্লেগ), অতীসার, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ, এই দেশ-ব্যাপ্ত অকালমৃত্যুর কারণ। ইহাদিগের কাল হস্তের পেষণে, বর্ত্তমান সময়ে অন্যূন গড় দশলক্ষ লোক প্রতি বৎসর অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। ইহা যে অতিশয়োক্তি নয়, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হইবে।

১৯০৪ সালের বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিবরণীতে দেখা যায়, এদেশে জ্বর রোগের বাৎসরিক গড় মৃত্যুসংখ্যা, (দশবৎসরের ১৮৯৪-১৯০৪) ষোল লক্ষেরও অধিক (১৬৫৯৯৩৭)। বাঙ্গলার চিকিৎসক মণ্ডলি ও স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, ম্যালেরিয়া জ্বরই ইহার অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এদেশে অজ্ঞ লোকের হস্তে, জন্ম মৃত্যু তালিকা সংগ্রহের ভার থাকাতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং এই ষোল লক্ষ মৃত্যুর কত অংশ প্রকৃত ম্যালেরিয়া সম্ভূত, জানিবার উপায় নাই। সম্প্রতি বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট সুদক্ষ ডাক্তার রজার্সকে, দিনাজপুর জেলার মৃত্যুপ্রাবল্যের কারণ নিরূপণে নিয়োগ করেন। ডাক্তার রজার্স জ্বর অভিধেয় এক সহস্র মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহার কিঞ্চিদুন তৃতীয়াংশ ম্যালেরিয়া জনিত। শ্বাস কাশ, উদরাময় প্রভৃতি বিভিন্ন পীড়া অবশিষ্ট মৃত্যুসংখ্যা পূর্ণ করিলেও ম্যালেরিয়াজীর্ণদেহে, এই সকল রোগ, সহজে প্রবেশ করিয়া অকালমৃত্যু আনয়ন করে এবং ম্যালেরিয়া এইরূপ অনেক মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ। সুতরাং ম্যালেরিয়ার মৃত্যুসংখ্যা জ্বরাভিধেয় মৃত্যুর মোটামুটি তৃতীয়াংশ গ্রহণ

করিলেও, প্রতিবৎসর বাঙ্গালা দেশে যে পাঁচলক্ষাধিক লোক কেবল এই রোগে মৃত্যু আশ্রয় করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত স্বাস্থ্যবিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের (ঐ দশ বৎসরের) বাৎসরিক গড় মৃত্যু সংখ্যা ১৮২০০০ ও ২২৮০০। এই উভয় ব্যাধি বিশেষলক্ষণাক্রান্ত এবং অপরাপর পীড়া হইতে ইহাদিগকে সহজে পৃথক্ করিতে পারা যায় বলিয়া, ইহাদিগের সম্বন্ধে প্রকাশিত মৃত্যু-সংখ্যা অনেকটা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অতীসার ও আমাশয় রোগে মৃত্যুসংখ্যা প্রতিবৎসর বিবরণীতে যেরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা যে ঐ রোগের প্রকৃত মৃত্যুর অতি সামান্য অংশ, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাক্তার রজার্সের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সকল মৃত্যু জ্বরজনিত বলিয়া বিবরণীতে উল্লিখিত, তাহারও ষষ্ঠাংশের কারণ, অতীসার ও আমাশয় রোগ। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে, মোট মৃত্যুসংখ্যার দশমাংশ হইতে ষষ্ঠাংশ এই রোগ সম্ভূত। যে সকল কারণে এই সকল স্থানে, ঐ রোগ উৎপন্ন ও বিস্তৃত হয়, বাঙ্গালার অপরাপর অংশেও তাহারা বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। সুতরাং বাঙ্গালায় উপরোক্ত রোগের মৃত্যুসংখ্যা, মোট মৃত্যুর দশমাংশ গ্রহণ করিলে প্রায় সার্দ্ধ দুই লক্ষ হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, বাঙ্গালার জেল সমূহে এবং কলিকাতা ও অপরাপর নগরে মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা দশ হইতে পোনর, যক্ষ্মারোগ-জনিত। ডাক্তার রজার্স, ম্যালেরিয়া পীড়িত দিনাজপুর জেলার সহস্র জরাভিহিত মৃত্যুর মধ্যে শতাধিক মৃত্যু অর্থাৎ মোট মৃত্যুর দশমাংশ যক্ষ্মাঘটিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত বঙ্গে এই দুর্দ্দমনীয় রোগের মৃত্যুসংখ্যা, মোট মৃত্যুর বিশ ভাগের একভাগ ধরিলে, প্রতিবৎসর যে অন্যূন লক্ষাধিক লোক এই পীড়ায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহা অতিরিক্ত বিবেচনা করিবার কারণ নাই। হায়, টাইফয়েডজ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, সূতিকাজ্বর, ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ও তজ্জনিত মৃত্যুসংখ্যা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহারাও যে বঙ্গে অকালমৃত্যু বৃদ্ধি করিবার প্রবল সহায়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গদেশে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বাৎসরিক গড় মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণানুযায়ী নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ম্যালেরিয়াদি সংক্রামক রোগে বাৎসরিক গড় দশ বৎসরের (১৮৯৪-১৯০৩) মৃত্যুর তালিকা।

ম্যালেরিয়া জ্বর	৫৫০০০০
ওলাউঠা	১৮২০০০
বসন্ত	২২৮০০
অতীসার ও আমাশয়	২৪০০০০
যক্ষ্মা ও অপরাপর সংক্রামক রোগ	১০০০০০
মোট	১০৯৪৮০০

স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত সভ্যদেশসমূহে এই সকল সংক্রামক ব্যাধি ক্রমশঃ হীনবল হইয়াছে, অনেক স্থলে কোন কোন মহারোগ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বঙ্গে এতাদৃশ মৃত্যুপ্রাবল্য সত্ত্বেও বুঝি ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যাপ্ত হয় নাই! যাহার উপদ্রবে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অর্দ্ধ পৃথিবী মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, সেই জনপদধ্বংসকর মহামারী বঙ্গে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে প্রবলাকার ধারণ করিতেছে। বিগত পাঁচ বৎসরে অন্যূন তিনলক্ষ লোক এই মহামারীর আক্রমণে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। ইহার নররুধিরপিপাসা পরিতৃপ্তির কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মহামারীর গত পাঁচ বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯০০	৩৮৪১২
১৯০১	৭৮৬২৯
১৯০২	৩২৯৬৭
১৯০৩	৬৫৬৮০
১৯০৪	৭৫৪৩৬

যদি মহানগরী কলিকাতার সহিত, উভয় পার্শ্বস্থ জনপদসকল, অথবা সমগ্র হুগলি জেলা, কোন দৈবনিগ্রহে হঠাৎ মনুষ্যশূন্য হয়, তাহা হইলে যে ভীষণ মৃত্যুব্যাপার উপস্থিত হইবে, তাহার সহিত, ম্যালেরিয়াদি সংক্রামক রোগের ক্রীড়াভূমি হইয়া বঙ্গদেশ প্রতিবৎসর যে নরজীবন অকালে বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহার তুলনা হইতে পারে! ঈদৃশ মৃত্যুকাণ্ডেই যদি এই সকল মহারোগজনিত দারুণ অনিষ্টের নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলেও বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ আশাশূন্য হইত না। কিন্তু যখন দেখা

যায়, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায়, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক প্রশমিত হইলেও, শতকরা পঞ্চাশজন অধিবাসী, স্ফীতোদর, প্লীহাগ্রস্ত, রক্তহীন-পাণ্ডুবর্ণ দেহ, জীর্ণকায়, জীবনভার কষ্টে বহন করিতেছে ; যখন দেখা যায়, মুরসিদাবাদ, রাজসাহী, হুগলি, যশোহর, দিনাজপুর, নদীয়া, পূর্ণিয়া ও রংপুর জেলার অনেক গ্রামে, চতুর্থাংশ মাত্র লোক কথঞ্চিৎ সুস্থদেহ, এবং পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক বয়স্ক শতকরা পাঁচছয় জন মাত্র বর্ত্তমান আছে ; যখন দেখা যায়, বঙ্গের সমস্ত নবজাত সন্তানের পঞ্চমাংশ হইতে তৃতীয়াংশ এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতে ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে, তখন বুঝিতে পারা যায়, বঙ্গের জাতীয় জীবনের পরিণাম কি বিভীষিকাপূর্ণ !

আমরা দেখিলাম, বর্ত্তমান বঙ্গে কি কি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব এবং কিরূপ অকালমৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতা সমগ্র বঙ্গভূমিকে অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—এই অকালমৃত্যু কি নিবারিত হইতে পারে ? এই সকল সংক্রামক রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি কি, সকল প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায়, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অধীন ? মানুষ চেষ্টা করিলে কি এই কার্য্যকারণচক্রের নিম্নে পেষিত না হইয়া আপনাকে সুস্থ ও সুখী রাখিতে পারে ?

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান উত্তর করেন,—এই সকল সংক্রামক রোগ বহুকাল ধরিয়া বিভিন্ন দেশে প্রজাকুল নির্ম্মূল করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে সেই সকল স্থানে ইহারা বিষহীন সর্পবৎ অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না। অনেক সংক্রামক ব্যাধি সেই সকল দেশ হইতে এক্ষণে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, অনেকের পূর্ব্বতেজ ক্ষীণতর এবং ভবিষ্যতে যে ইহারাও নিবারিত হইবে, তাহারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যে সকল কারণে ইউরোপ, আসিয়া ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই মহাকল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং তদ্দেশীয় লোকেরা মারীভয় ও অকালমৃত্যুর আবর্ত্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতেছে, তাহা যে কেবল বাঙ্গালার ভাগ্যে বিপরীত ফল প্রসব করিবে, তাহা কি সম্ভবপর ? ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, মহামারী প্রভৃতি সংক্রামক রোগ কি কারণে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং কি উপায়ে নিবারিত হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে, রোম সাম্রাজ্যের আধিপত্য ইংলণ্ড হইতে অপসৃত হইলে, উত্তরসমুদ্রচর, নীলচক্ষু, দীর্ঘকেশ, মহাবল, জলদস্যু-দলের ভুজবলে ইংলণ্ড অধিকৃত ও ইংরাজ জাতির অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, ইংলণ্ডের সহস্র বৎসরের স্বাস্থ্য ইতিহাস, দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ের মর্ম্মভেদী কাহিনী। তৎ-কালের রাজশক্তি, স্বদেশ ও বিদেশে, অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত। প্রজা-কুল সতত ভ্রাম্যমান, সুতরাং সমাজ বিশৃঙ্খল, দেশ শান্তিশূন্য, কাহারও ধন ও জীবন নিরাপদ ছিল না। সৎপ্রবৃত্তির অভাববশতঃ সাধারণ লোক আলস্যপরায়ণ, কৃষিকার্য্যে অমনোযোগী, ক্ষেত্র সকল অসম্পূর্ণ ভাবে কৃষ্ট। অনাবৃষ্টি বা অন্যরূপ আপৎ উপস্থিত হইয়া এক বৎসরের শস্য নষ্ট হইলে, দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। প্রজাশক্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন, শারীরিক শৌচ কাহাকে বলে জানেনা—নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যপীড়িত, ঔদরিক ও অমিতাচারী। বাস-স্থান কদর্য্য কুটীর, বায়ু ও আলোক প্রবেশ রহিত ; গৃহপ্রাচীর মৃত্তিকানির্ম্মিত ; শয্যা তৃণাচ্ছাদিত আবর্জ্জনাপূর্ণ আর্দ্র ভূমিতল। পরিধেয় মেষচর্ম্ম দিবারাত্র গাত্র পরিত্যাগ করিত না। আহার স্বাস্থ্যের অনুপযোগী ও অপ্রচুর; মাংসই প্রধান খাদ্য, উগ্রমদিরাই প্রধান পানীয়! দেশের বার আনা অধি-বাসী প্রবল ভূস্বামীর ক্রীতদাস। ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য ঐতিহাসিক লিখিয়া-ছেন, ৬৭৯ হইতে ১৩২২ সালের মধ্যে, দ্বাচত্বারিংশৎবার দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও তৎসহচর মারীভয়, ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিল। গলিত কুষ্ঠ, স্কাভি, উপ-দংশ, বর্ম্মব্যাধি, ম্যালেরিয়া, বাত রোগ প্রভৃতি সাধারণ পীড়া বলিয়া গণ্য হইত। অবশেষে ১৩৪৯ সালে, সেই চিরভীতিকর মহামারী কালামড়ক (Black death) আবির্ভূত হইয়া সহস্র বৎসরের স্বাস্থ্যহানিরূপ মহাপাতকের প্রায়-শ্চিত্ত স্বরূপ অগণন মৃতদেহে দেশ পূর্ণ করিয়া তামসীযুগের অবসান করিয়া-ছিল। এই সকল মারীভয় দেবকোপসম্ভূত বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে সাধারণের বিশ্বাস ছিল। ইহাদের আবির্ভাব কালে ভূমিকম্প, ধূমকেতুর উদয়, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ দৈবদুর্ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। ঐশীক্রোধ প্রশমনের নিমিত্ত, ধর্ম্মযাজকগণ, মহোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতির বিধান করিতেন। কিন্তু সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে রোগ বিস্তারের প্রবল কারণ, সংক্রামকতা দ্বারা মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তর আশ্রয় করিয়া যে মারীভয় বহুবিস্তৃতি লাভ করে,

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের এই সত্য বহুকাল তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সর্ব্বগ্রাসী মহামারীর উৎপীড়নে, তৎকালিক চিন্তাশীলের মানসপথে উদয় হইতে লাগিল। ইহার ফল স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, এই কালে কোন কোন স্থানে মহামারীপীড়াক্রান্ত রোগীকে পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গ্রাম ও নগরাদি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও লোক সাধারণ ঘোর কদাচারী ও অশুচি থাকাতে মহামারী নিবারণের চেষ্টার কোন সুফল দৃষ্ট হয় নাই।

পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা কতকাংশে উন্নত হইলেও, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। দুর্ব্বলের পীড়ন ও বলবানের যথেচ্ছাচার, এই কালের প্রবল সামাজিক দোষ। কেবল ডাকাইতি অপরাধে প্রতিবৎসর দুই সহস্রেরও অধিক লোকের প্রাণদণ্ড হইত। সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যেই ভূরি ভূরি আসুরিক প্রকৃতি বিদ্যমান। প্রভু ভৃত্যকে কশাঘাতে নিজ আজ্ঞা পালন করাইতেন, স্বামী স্ত্রীকে তাড়না দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন, যষ্টি অবলম্বনে শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন। কারাগার সকল অপরাধিপূর্ণ এবং পাপ, আবর্জ্জনা ও রোগের আবাসভূমি ছিল। যাঁহারা ভদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও কর্কশস্বভাব ও অশিক্ষিত। অপরিমিত সুরা পান সামাজিকতার প্রধান অঙ্গ। দেশে এরূপ দারিদ্র্যকষ্ট যে, পঞ্চমাংশ লোক দরিদ্রভাণ্ডার হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একালের সাধারণ লোকের বিশ্বাস—সমস্ত অমঙ্গল, সকল দুর্ঘটনা নিশাচরী ডাকিনীদের কর্ম্ম। যদি হঠাৎ কেহ রোগাক্রান্ত হইত বা কোন মৃত্যু উপস্থিত হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহা ডাকিনীর দৃষ্টিতে উৎপন্ন; অকস্মাৎ ঝটিকা উত্থিত হইলে, ভয়ত্রস্ত কৃষক অনুভব করিত, সে নিশীথবিহারিণী ডাকিনীর বিকটস্বর শ্রবণ করিতেছে! কত শত দরিদ্রা শীর্ণকায়া বৃদ্ধা ডাকিনীবোধে হত হইয়াছে, তাহা কে গণনা করে! এ যুগেও সাধারণ লোকের ভিতর শারীরিক শৌচের অতিশয় অভাব ছিল। নগরের রাজপথে মল ও আবর্জ্জনাস্তূপ; ধনীর অট্টালিকা ও দরিদ্রের কুটীর সমভাবে স্বাস্থ্যহীনতার নিকেতন। যদিও গলিতকুষ্ঠ ও ঘর্ম্মব্যাধি এই সময়ে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিল কিন্তু মহামারী, টাইফাস্, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডিফ্‌থেরিয়া, ম্যালেরিয়া, অতিসার প্রভৃতি রোগের উপদ্রবের কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। দেশ অরণ্য ও

জলাভূমি সমাচ্ছাদিত সুতরাং ভূমির জল নির্গমন সুগম না থাকাতে ম্যালেরিয়া জ্বর অত্যন্ত প্রবল ও অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ হইত। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স ও ক্রমওয়েল এই ম্যালেরিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা পঞ্চান্ন লক্ষ ছিল এবং প্রতি সহস্র জীবিতের মধ্যে লণ্ডন নগরে প্রতিবৎসর আশি জন মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডে মারীভয় উৎপাদক রোগ সকলের উৎপত্তি ও নিবারণোপায় নির্দ্ধারণ বা কোনরূপ স্বাস্থ্য বিধি প্রবর্ত্তন দ্বারা প্রজাবর্গের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ কোন চেষ্টা আরব্ধ হয় নাই অথচ বসন্ত,স্কার্ভি,টাইফাস ও ম্যালেরিয়া রোগ ব্যতীত অপরাপর সংক্রামক ব্যাধির উপদ্রব এই শতাব্দীর প্রাক্কালেই সম্পূর্ণ মন্দীভূত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, বহুশত বৎসর ধরিয়া ইউরোপের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ রোম পরিচালিত পৌরোহিত্য শক্তির কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। কি রাজশক্তি, কি প্রজাশক্তি ইহার নিকট সকলেই জোড়হস্ত। কি সামাজিক আচার, কি ধর্ম্মবিশ্বাস, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি বিজ্ঞান আলোচনা, পুরোহিত কুলের মতবিরোধী হইলেই তাহা পাষণ্ডধর্ম্মদূষিত। পাষণ্ডীর প্রায়শ্চিত্ত কারাদণ্ড বা অগ্নিদাহ, বা ততোধিক ভয়ঙ্কর ধর্ম্মচ্যুতি।

যে দিন উইটেনবর্গ নগরে, পোপপ্রেরিত ধর্ম্মচ্যুতি আজ্ঞা, মার্টিন লুথার নিজ হস্তে, সর্ব্বসমক্ষে অগ্নিদগ্ধ করেন, সেইদিন হইতে ইউরোপে ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বাধীনতা স্থাপিত হইয়া,নূতন শক্তির ক্রীড়া আরম্ভ হয়। যে বিজ্ঞান ও শিল্প বলে, আজ ইংলণ্ড, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা সম্পন্ন,তাহা এই মহাশক্তি প্রসাদে। যদিও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক ও সংস্কারের প্রবর্ত্তন দ্বারা ইংলণ্ডের সহস্র বৎসরের কালনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল কিন্তু চিরাগত কদাচার, অজ্ঞান ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের আধিপত্য সমাজশরীর হইতে সহজে অপসৃত হয় নাই। একদিকে পুরোহিতকুল সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অভিনব শিল্পের অনুষ্ঠান পাষণ্ডী সম্ভূত বলিয়া অভিশপ্ত করিতেন, অপরদিকে অজ্ঞ লোকেরা এসকল সয়তানের কার্য্য এবং অনুষ্ঠাতৃগণ সয়তানের অনুচর বিশ্বাস করিয়া প্রতিকূলাচরণে দণ্ডায়মান হইত। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সহিত যেমন এই

সকল প্রতিবন্ধক দূর হইতে লাগিল, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে ইংরাজ সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, রাজা ও ভূস্বামিবর্গ বা প্রভুকুল এবং প্রজাবর্গ বা ক্রীতদাস কুল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে আর এক তৃতীয়শ্রেণী সমাজে মস্তকোত্তোলন করিতে আরম্ভ করে। ইহারা কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপারে অনুরক্ত বৈশ্যকুল। বৈজ্ঞানিক নূতন চিন্তায় ও শিল্প বাণিজ্যের নূতন পন্থায়, দেশে যে পরিমাণে ধনাগম হইতে আরম্ভ হইল, সেই পরিমাণে দরিদ্রতার লাঘব হইয়া বৈশ্য ও শ্রমজীবিদলের বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতির সূত্রপাত হইল। দারিদ্র্য মোচন হওয়াতে, আহার, পরিচ্ছদ, আবাসস্থান, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নতি হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে,অবস্থাপন্ন লোকের ভিতর পর্য্যুষিত মাংসের পরিবর্ত্তে সদ্যোহত পশুমাংস, উগ্রমদিরার পরিবর্ত্তে চা ও কফি, রাই ও যবের পরিবর্ত্তে গমের রুটীর প্রচলন হয়। আলু, কপি, আঙ্গুর প্রভৃতি নবপ্রচলিত নানাবিধ ফল মূল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন পাত্রে পরিবেষিত হইত। পশুচর্ম্ম বা স্থূল রোমজ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শন ও তুলার প্রস্তুত পরিচ্ছদ এবং দেহের পরিচ্ছন্নতা ও পরিধেয়ের নির্ম্মলতা সম্পাদনার্থ সাবানের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপে দেখা যাইতেছে, কেবল দরিদ্রতা মোচন হওয়াতে, পর্য্যাপ্ত ও পুষ্টিকর আহার সংগ্রহ, শৌচাচার অবলম্বন, ও সংক্রামক রোগের প্রধান সহায় সংকীর্ণ স্থানে বহুলোক সঙ্গ নিবারণ স্বভাবতঃই সহজে ঘটিয়াছিল এবং সমাজ এইরূপে স্বাস্থ্যপরায়ণ হওয়াতে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব খর্ব্ব হইয়াছিল।

এই শতাব্দীতে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার প্রভৃতি বিষয়ে প্রথম অনুশীলন আরম্ভ হয়। বসন্তবীজের টীকাদ্বারা বসন্ত রোগ নিবারণ প্রথাও প্রথমে এই শতাব্দীতে ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহারই শেষভাগে জন হাউয়ার্ড, কাপ্তেন কুক ও এডওয়ার্ড জেনার—ইংলণ্ডের তিনজন অমর সন্তান—টাইফাস জ্বর, স্কার্ভি ও বসন্ত রোগের নিবারণোপায় সর্ব্বসাধারণের করগত করিয়া, জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল স্বাস্থ্যোন্নতিকর অনুষ্ঠান এ শতাব্দীতে বিশেষ ফল প্রসব করিতে পারে নাই এবং মারীভয় উৎপাদক অপরাপর সংক্রামক রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের

অভাবে তাহাদিগের নিবারণের জন্য কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। তথাপি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের সহিত তুলনায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান কালে, উন্নতিশীল শিল্প ও বাণিজ্য প্রসাদে, সামাজিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি বশতঃ ইংলণ্ডের মৃত্যুসংখ্যা অর্দ্ধাংশ হ্রাস হইয়াছিল, এবং যদিও ইউরোপ, আসিয়া ও আমেরিকার জলে ও স্থলে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া অবিরত লোকক্ষয় ঘটিযাছিল কিন্তু ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা এই শতবর্ষে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে, ইংলণ্ডে যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই আমূল পরিবর্ত্তনের কারণ, কলকারখানার সৃষ্টি। ইহার ফল দেশে অগণন অর্থাগম, অভূতপূর্ব্ব লোকবৃদ্ধি ও বিবিধ শিল্প ও ব্যবসায়ের জন্মভূমি জনাকীর্ণ নগর সকলের আবির্ভাব। কিন্তু তৎসঙ্গে ধূম ও ধূলিকলুষিত বায়ু, মলদুষিত জল, দরিদ্র শ্রমজীবিকুলের জনতাপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর আবাসস্থান ও রোগমূল আবর্জ্জনারাশি নগরাদি সমাচ্ছাদিত করিল। দেশের সৌভাগ্য বশতঃ পূর্ব্বশতাব্দীর মারীভয় জনক রোগবীজ সকল এই মহা কদাচার ক্ষেত্রে উপ্ত হয় নাই। তথাপি হাম, বসন্ত, যক্ষ্মা, টাইফয়েডজ্বর, অতীসার, ডিফথেরিয়া প্রভৃতি রোগে প্রতি বৎসর দুইলক্ষাধিক অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতে লাগিল। দেশের অগণন শিল্পশালা, বহুবিস্তৃত বাণিজ্যব্যাপার, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য যাহাদের শারীরিক ও মানসিক চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের জীবন যে মূল্যবান্ জাতীয় সম্পত্তি এবং রোগ ও স্বাস্থ্যহানির ন্যায় যে সমাজের প্রবলতর শত্রু আর নাই, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই, স্বাস্থ্যবিদ্‌গণের মধ্যে স্বাস্থ্য উন্নতি কল্পে এবং সংক্রামক রোগের উৎপত্তি, বিস্তার ও নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই অনুশীলনের ফল—ইংলণ্ডের নগরে নগরে অগণন অর্থব্যয়ে স্বাস্থ্যকর পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান। আবাস স্থানের প্রশস্ততা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন দ্বারা বায়ুর নির্ম্মলতা সাধন, পরিষ্কৃত প্রচুর পানীয় জল প্রজাবর্গের দ্বারে দ্বারে আনয়ন. আলোক ও বায়ু সঞ্চারিত গৃহ ও শিল্পশালাদি নির্ম্মাণ, জল নির্গমন সুগম করিয়া ভূমির আর্দ্রতা নিবারণ, মল ও আবর্জ্জনা রাশি সত্বর স্থানান্তরিত করিবার উপায় অবলম্বন, সাধারণ ব্যাধি ও সংক্রামক রোগের চিকিৎসা উদ্দেশে উপযোগী রোগিনিবাস প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি শৌচাচারের প্রবর্ত্তন দ্বারা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর

জটিল স্বাস্থ্যসমস্যা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শৌচাচার—শৌচাচার,—শৌচাচার আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূল মন্ত্র। ক্রমশঃ।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বুধনন্দন রাজর্ষি পুরূরবা যখন তাঁহার এই অমরাবতীকল্প পুরীর মণিহর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অনস্তমিত নবীন হিমাংশুর স্নিগ্ধ কিরণজালে অমানিশার ঘোর অন্ধকারেও ইহাকে দিব্য জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত করিতেন, এবং চন্দ্রিকাপায়ী চকোরগণ যখন পালে পালে আসিয়া মহানন্দে তাঁহার প্রমোদবন কলরবে পূর্ণ করিত, তখন এই প্রতিষ্ঠান নগরের শোভায় সপ্তভুবন মুগ্ধ হইত। ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় স্বর্গচ্যুতা দেববালা উর্ব্বশী যখন পুরূরবার অঙ্কশায়িনী হইয়া এই প্রতিষ্ঠান নগরে স্বর্গীয় বিলাস বিনোদের পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন, আবার প্রিয়াবিয়োগক্লিষ্ট প্রেমোন্মত্ত রাজর্ষি যখন দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ সেই প্রিয়ার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখন না জানি এই প্রয়াগে প্রবৃত্তির কি চূড়ান্ত লীলাই অভিনীত হইয়াছিল! প্রবৃত্তি নিবৃত্তির চরম লীলাস্থল, প্রয়াগের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ রূপে এজগতে প্রচারিত হইবে বলিয়াই বুঝি রাজর্ষি পুরূরবা এই পুণ্যধাম প্রয়াগে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য ও সুখ উপভোগ করিয়া ত্রিদিববাসিগণেরও ঈর্ষার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি পুরূরবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন প্রয়াগমাহাত্ম্যে এক দিন এই ধরাধামই স্বর্গধামে পরিণত হইয়াছিল।

আবার যখন নির্ধূম পাবক সদৃশ সুদীপ্তকায়, বহুশিষ্যগণে পরিবৃত মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ তাঁহার সুরম্য পবিত্র আশ্রমে মহাকঠোর তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন, এবং ধর্ম্মজগতের অশ্রুতপূর্ব্ব মহান্ সত্যগুলি জগতে প্রচার করিয়া জীবের পরম কল্যাণ সাধনে তৎপর ছিলেন, যখন জটাবল্কলধারী সানুজ শ্রীরাম জানকী সদ্যঃপ্রাপ্ত সুবিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবরের বিচিত্র পর্ণকুটীরে বন্যফলমূলাশী হইয়া পরম সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তখন না জানি, এই প্রয়াগধাম কি প্রশান্তভাব

ধারণ করিয়াছিল। না জানি, নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী মনীষিগণ তখন এই প্রয়াগে কি পরম শান্তিই লাভ করিতেন! আবার যখন রামানুজ ভরত, সপরিজন অযোধ্যাবাসিগণকে লইয়া অপ্রতিমবীর্য্য মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, সত্যসঙ্কল্প মহর্ষির ইচ্ছায় যখন নিমেষের ভিতর এই পবিত্র ভূমিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অপার ঐশ্বর্য্যরাশির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং মুনিবরের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া যখন অযোধ্যাবাসিগণকে অতিমাত্র বিস্মিত হইতে হইয়াছিল, তখন এই প্রয়াগ মাহাত্ম্যের বিচিত্রতা সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

কান্যকুব্জাধিপতি, শিলাদিত্যরাজ হর্ষবর্দ্ধন "মহামোক্ষ" নামক পাঞ্চবার্ষিকী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যখন তাঁহার পাঁচবৎসরের সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার কেবল জনসাধারণের অভাব মোচনার্থে এই পুণ্যধাম প্রয়াগে নিঃশেষিত করিতেন, তখন জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমানভাবে এই অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন প্রয়াগ মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইতে হইত। পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধজগতেও প্রয়াগমাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাহা বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শিলাদিত্যরাজ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগকেই তাঁহার সেই অলৌকিক মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্তক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যে তিনি যে কয়েকবার সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রয়াগেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক, মহাত্মা হিয়ান্ সাং শিলাদিত্যরাজের বিশেষ অনুরোধে এক বৎসর স্বয়ং এই প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া সেই অদ্ভুত মহাযজ্ঞ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার আমূল বিবরণ তিনি স্বীয় অমূল্য ভ্রমণবৃত্তান্তগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা সকলে সেই অপূর্ব্ব মহাযজ্ঞের কথা জানিতে পারিতেছি। শিলাদিত্যরাজ হর্ষবর্দ্ধন, যেরূপ মুক্তহস্তে তাঁহার অপরিমিত ধনরাশি এই প্রয়াগে দান করিতেন, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সেরূপ অসাধারণ ও অলৌকিক দান বোধ করি ভারতের এই মহাতীর্থ প্রয়াগেই সম্ভবে। মহাত্মা হিয়ান্ সাং লিখিয়াছেন যে, কেবল সমরসংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ভিন্ন রাজভাণ্ডারে আর কোনও ঐশ্বর্য্যই অবশিষ্ট থাকিত না; এমন কি, রাজকীয় পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত জনসাধারণের

হিতার্থে অর্পিত হইত। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন ৫।৬বার এই প্রয়াগেই সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় অসীম দানশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ধন্য রাজা হর্ষবর্দ্ধন। কেবল অসংখ্য পশু মনুষ্যের কষ্ট নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে হৃষ্ট করিবার জন্যই বুঝি তুমি জন্মিয়াছিলে এবং এই লুপ্ত-গৌরব ও হতমান ভারতের অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার জন্যই বুঝি সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ডভার লইয়া জগতে তাহার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছিলে!

মহাত্মা হিয়ান্ সাং-এর অলৌকিক ত্যাগ, অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে আজ সমগ্র সভ্যজগৎ ভারতের সেই অদ্ভুত মহাযজ্ঞের কথা জানিতে পারিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিয়াছে। নিতান্ত স্বার্থপর পাশ্চাত্য-গৌরবাভিমানী ব্যক্তি না হইলে আর ভারতের এই গৌরব-দৃপ্ত সত্য ঘটনার অপলাপ করিতে কেহ সাহসী হইবেন না। এইরূপ কত শত হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজা মহারাজগণের বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যে এই অলৌকিক সুমহান্ পবিত্রক্ষেত্র জগতে আপন মহিমায় অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে! এই ঘোর দৈন্যদশাপ্রাপ্ত ভারত এখনও প্রয়াগের সেই অচিন্ত্যদানমাহাত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! এখনও এই প্রয়াগে প্রতিদিন যে, কত শত, সহস্র সহস্র দান ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার তুলনা আর কোথাও আছে কি না বলিতে পারি না। প্রয়াগের দানমাহাত্ম্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। গঙ্গাযমুনারূপ দুই মহাশক্তির সম্মিলন হইতেই প্রয়াগের এই অলৌকিকত্ব ও বিচিত্রতা; এবং ইহাই এই সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রের অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন হওয়ার একমাত্র কারণ।

সমগ্র ভারতের আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা দেখিব যে, প্রকৃতই এই প্রয়াগমাহাত্ম্যের বিচিত্রতা ও পবিত্রতা কিরূপে সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যখন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল, তখন বৈদিকধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় সাধন করিয়া সর্ব্বাগ্রেই যে মহাপুরুষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই অসাধারণপ্রতিভাসম্পন্ন সুবিখ্যাত কুমারিল ভট্ট, স্বকার্য্যসাধন করিয়া অন্তে এই সুমহৎ পবিত্রক্ষেত্রে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে তুষানল করিয়া স্বদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বহুবৌদ্ধবিনাশজনিত মনস্তাপে ভট্ট অবশেষে এই প্রয়াগধামে আসিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

শত দেশ থাকিতে তিনি কি কেবল অপূর্ব্ব গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়াই এইখানে আসিয়া দেহত্যাগ করেন নাই? মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মকাণ্ড ভট্টের শেষ, এবং মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানকাণ্ড ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রথম প্রকাশ, যেন এই প্রয়াগধামেই হইয়াছিল। এই পবিত্র ধাম হইতেই ভট্টের পরামর্শানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া প্রথমেই তাঁহার প্রধান শিষ্য, কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ মণ্ডন মিশ্রের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পুনরুদ্ধারকর্ত্তা কুমারিল ভট্ট, যেমন একদিন এই প্রয়াগেই সাক্ষাৎ জ্ঞানাগ্নি স্বরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে লয় পাইয়া পরা নিবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রবল প্রবৃত্তি পরায়ণ, মণ্ডন মিশ্রের সমুদয় যুক্তিজালও সেই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। যে জ্ঞানরূপ মহাসূর্য্যের দিব্যালোকে একদিন ভারতের ঘোর অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল, উষাগমে নিশাপগমের ন্যায় যে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উদয়ে এক দিন শত শত ভ্রান্ত মত নিরস্ত হইয়া এই সুবিশাল ভারতাকাশ চিরশান্তিপ্রদ অনন্ত জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়াছিল, সেই মহাসূর্য্যের শুভ অরুণোদয় বুঝি এই মহাক্ষেত্রেই হইয়াছিল। কুমারিল ভট্টের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মকাণ্ডের শেষ, এবং জ্ঞানকাণ্ডের আরম্ভ হইল বলিতে হইবে। ভারতের এই মহাগৌরবাস্পদ স্মরণীয় ঘটনাটির সহিত যেন গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম ক্ষেত্রের কি এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রবৃত্তির হেতুভূতা যমুনা, যেমন আপন অপূর্ব্ব লীলা সমাপন করিয়া অন্তে নিবৃত্তিরূপা, শাম্ভবী ভাগীরথী গর্ভে চিরবিলীনা হইয়া রহিয়াছেন; সেইরূপ প্রবৃত্তির হেতুভূত কর্ম্মকাণ্ডও যেন এইখানেই অগাধজ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রে লয় পাইল।

প্রয়াগমাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে আমরা দেখিতে পাই যে, এই পরম মহাক্ষেত্রে উপ্তবীজ হইতেই অচিরকাল মধ্যে উৎপন্ন মহাবেদান্ত মহীরুহে ভারত আচ্ছন্ন হইয়াছিল। যে সুবিশাল অনন্ত বিস্তীর্ণ মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়া, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের একমাত্র আশ্রয়; যে বেদান্ত ডিণ্ডিমের মহাবিজয়নির্ঘোষে আজ সমগ্র জগৎ প্রতিধ্বনিত, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিলে মনে হয়, বুঝি তাহা প্রথমেই এই প্রয়াগে বাজিয়া উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধারি কুমারিল ভট্ট, যেমন আত্ম অপরাধ স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইয়াছে মনে করিয়াই এই মহাবিচিত্র তীর্থে আসিয়া দেহ-

ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বহুপ্রাচীন কাল হইতেই এই মহাসঙ্গমে হিন্দুমাত্রেরই মৃত্যু বাঞ্ছনীয় ছিল। যে স্থানের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিতে করিতে প্রাচীন ভারতের মহাগৌরবাস্পদ, অগণ্য, অদ্ভুত ঘটনাবলী আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়; সেই অপার মহিমাময় সুপবিত্র ক্ষেত্রে মৃত্যু-কামনা করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ প্রকৃত হৃদয়বত্তারই পরিচয় দিয়াছিলেন। বহুপ্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহা দৃষ্ট হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রয়াগে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করার প্রথা এ দেশে প্রচলিত ছিল। স্বেচ্ছায় মৃত ব্যক্তিগণের বিপুল অস্থিরাশি, হিয়ান্ সাং স্বয়ং এইখানে দেখিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুর এই আত্মবিসর্জ্জন ব্যাপারকে অনেকেই বর্ব্বরোচিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা হিন্দুর এই অমানুষিক আচরণে যে, কি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না, বা তাহা জানিবার জন্য কোন চেষ্টাও করেন না। শাস্ত্রোক্ত প্রয়াগমাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—"যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ" এইরূপ শতশত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচনদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মোক্ষধাম প্রয়াগে প্রাণত্যাগ করিতে প্রাচীন হিন্দুগণ কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না।

যে আর্য্যশাস্ত্রের প্রতিপত্রে আত্মঘাতীর মহানিরয়গামী হইবার কথা পরিদৃষ্ট হয়, সেই শাস্ত্রেই আবার স্থানবিশেষে আত্মবিসর্জ্জন জীবের সদ্গতিবিধায়ক বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থবোধক শাস্ত্রীয় বিধিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়াই আত্মজ্ঞান-প্রবণ প্রাচীন আর্য্যজাতির আচরণে অনেকেই দোষ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যশিক্ষা-লোকপ্রাপ্ত জনসাধারণের ধারণা এই যে, ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক হিন্দুর কতকগুলি বর্ব্বরোচিত আচার ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায়, সভ্যতালোকে ভারতের চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়াছে, এবং আমাদের মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের পরকীয় ধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা এবং তাহাতে অযথা দোষারোপ করিবার দুরাগ্রহে, আজকাল আর্য্যসন্তানগণের মধ্যেও অনেকে মনে করেন যে, বঙ্গরমণীগণের প্রাণ-পুত্তলিকাসম শিশুসন্তানগণকে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বিসর্জ্জন; ভক্ত হিন্দুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হওন; সতীর পতির সহিত এক চিতায় শয়ন এবং তীর্থবিশেষে দেহত্যাগ প্রভৃতি

প্রথাগুলি, নিতান্ত নৃশংস ও বর্ব্বরজনোচিত কার্য্য! বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গগুণে স্বজাতীয় আচার ব্যবহার ও সংস্কার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও পরকীয় আচার ব্যবহারাদির অভিজ্ঞতায় পরিপক্কতা লাভ করিয়া যাঁহারা স্বজাতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে কতদূর আত্মঘাতী হন, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারেন না। জন্ম, মৃত্যু, পাপ, পুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতে করিতে যে প্রাচীন আর্য্য মনীষিগণ প্রাণপণ যত্ন করিয়া তাহার চরম মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যে, আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপের প্রশ্রয়দাতা হইবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানের মূলই যে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য সকলের নাই বলিয়াই এইরূপ ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

পরকীয় রাজ্যাধিকার এবং স্বরাজ্য সংরক্ষণ প্রয়াসে যে সকল মহা-পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী মহারথিগণ, অসংখ্য নরশোণিতে এই ধরা কলুষিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই জাতীয় জীবন দান করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু শান্তিপ্রিয় প্রাচীন হিন্দুগণ ধর্ম্মের জন্য স্ব স্ব পুত্র, কলত্র, বিত্ত এবং অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্য জাতির যে অক্ষয় জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহার অক্ষুণ্ণ প্রভাব আজিও সমগ্র সভ্যজগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। আমরা যতই দুর্ব্বল, যতই নিঃস্ব ও পরাধীন হই না কেন, আমরা ইহা অকপটচিত্তে বলিতে পারি যে, সেই অসামান্যপ্রভাবসম্পন্ন আত্মজ্ঞানী আর্য্য মহর্ষিগণের প্রদত্ত অমৃতের আমরা অধিকারী। কোনও প্রাচীন সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতির ভাগ্যে এ সুযোগ ঘটে নাই। শত সহস্র কৌশল ও অসিচালনায় যে সকল প্রাচীন সুসভ্য জাতি, পৃথিবীর মধ্যে অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব আজ অনন্ত কালসমুদ্রে বিলুপ্ত। অচিন্ত্যমহিমামণ্ডিত আর্য্য মহর্ষিগণের অনুকম্পায় এবং তাঁহাদের অসাধারণ ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বলে, সুদীর্ঘকালাবধি লাঞ্ছিত ও পরপদানত হইয়াও আমরা আজিও জীবিত রহিয়াছি। আমা-দের জাতীয় জীবনের মর্ম্মস্থান আজিও কেহ স্পর্শ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গরমণীগণ যে, কি ঐশ্বরিক মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাণাধিক শিশু সন্তানগণকে মোক্ষদায়িনী গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন, কি আধ্যাত্মিক ভাবে তদ্গতচিত্ত হইয়া যে হিন্দুগন, বিশ্বম্ভর দেবের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হইয়া অবলীলাক্রমে আত্মবিসর্জ্জন করিতেন এবং কি অলৌকিক পাতি-

ব্রতা ধর্ম্মের প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া আর্য্য সতীলক্ষ্মীগণ, মৃত পতির সহিত এক চিতায় শয়ন করিয়া পতিসহগামিনী হইতেন, তাহা নির্ণয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি জানি, এক বৎসর ৺গঙ্গোত্রির পথে জনৈক সাধু ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ দর্শনে বিহ্বল হইয়া এক লম্ফেই সেই উদ্দাম স্রোতে নিপাতিত হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সাধুর অন্তঃকরণে যে কি স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সাধুর দুর্গতি হইল, বা সদ্গতি হইল, তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিবে? তবে আমরা ইহা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, যদি তিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারেই পতিতপাবনী ভাগীরথীতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রকৃত হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, তাঁহার মৃত্যুতে মৃত্যুই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি ক্ষণভঙ্গুর দেহের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ যে, অতি সহজে মরিয়াই অমর হইতে জানেন, জগতে এই মহাসত্য প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতে প্রায়োপবেশন ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি করিয়া দেহপাত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশীদিনের কথা নহে, শ্রীকেদারশৈলোপরিস্থিত মহাপথে যে, কত সাধু দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই! পার্ব্বত্য প্রদেশে এমন অনেক "ভৃগুপতন" আছে, যে সকল স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। এই ভারতবর্ষময় অনেক সাধুর "জীবৎ সমাধি" স্তম্ভ সমুদয়, আজও ভারতের স্বেচ্ছামৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এমন কত সাধুমহাপুরুষ যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মৃত্তিকাগর্ভে জীবন্ত চির সমাধিস্থ হইতেন, তাহা বলা যায় না। এইরূপে কোনও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভৌতিক দেহের মমতা ত্যাগ করার স্বভাব হিন্দুর অনেক দিন হইতেই আছে। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের কঠোর শাসন সত্বেও ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুর এই স্বেচ্ছামৃত্যু লোপ পায় নাই। এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ অনাহারে প্রায়োপবেশন করিয়া দেহত্যাগ করেন। পতিব্রতা রমণীকে এখনো কেহ আট্কাইয়া রাখিতে পারেন না। সতী স্বীয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াও পতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পতিসহগামিনী হন।

আর্য্যজাতির এই আবহমানকালাচরিত প্রথার মূল উৎপত্তি স্থান যে কোথায়, তাহা যদি কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আর ইহা বলিতে পারিবেন না যে, হিন্দুর ইচ্ছামৃত্যু বর্ব্বরোচিত কার্য্য। অবশ্য যাহারা কোন উচ্চভাব বা আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইয়া, কেবল কোন সাংসারিক কষ্ট বা মনোবেদনায় দেহপাত করে, তাহারা আত্মহা বলিয়া আর্য্য সমাজে পিণ্ডোদকবর্জিত হইয়া রহিয়াছে।

যে হিন্দু অতিথি সৎকারের জন্য প্রাণাধিক পুত্রসন্তানকে অম্লানবদনে স্বহস্তে বলি প্রদান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন; যে নিঃস্ব হিন্দু গৃহস্থ একদিন সপরিবারে অতিথি সৎকার করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য অকাতরে সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনশনে থাকিয়া মৃত্যুপণ করিতেন; সেই মৃত্যুঞ্জয়, নির্ভীক, হিন্দুসমাজপ্রচলিত সহমরণাদি আচরণ গুলিতে যে কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব, কি জ্বলন্ত বিশ্বাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং মৃত্যুতে নির্ভীকতা নিহিত আছে, তাহা আত্মজ্ঞানবিহীন ঐহিকসুখাসক্ত জনগণের কখনই বোধগম্য হইতে পারে না। মৃত্যুভয়কাতর অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে প্রকৃত হিন্দুর আচরণ সম্পূর্ণ বর্ব্বরোচিত কার্য্য বলিয়াই মনে হইবে। যে সকল আচরণের জন্য, হিন্দুকে তাঁহারা অতি অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া মনে করেন, সেইগুলিই তাহার মহান্ চরিত্রের পরিচায়ক। প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে নিঃশেষাঘবিনাশিনী ভাগীরথী মা গঙ্গা যে কি, তাহার মর্ম্ম অপর সাধারণে কি বুঝিবে? মহা মহা জ্ঞানী, ভক্ত, ভাবুক ও কবিগণ যে গঙ্গামাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ঐহিক পারত্রিক সুখে অনাসক্তচিত্ত প্রাচীন ভারতীয় সুধীবৃন্দ, নগণ্য তুচ্ছ জীব শরীর ধারণ করিয়াও যে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বিমল তটে নিবাস আকাঙ্ক্ষা করিতেন, যে গঙ্গাহিল্লোলের মধুময়ী বিপুল গীতি হিন্দুর হৃদয়তন্ত্রীতে আজিও বাজিয়া উঠে, যাঁহার দর্শন, স্পর্শন ও অবগাহনে, হিন্দু পাপ, তাপ ও মোহ বিমুক্ত হন, অনার্য্য অহিন্দুগণের পক্ষে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। যাঁহার মাহাত্ম্যকথায় প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সমুদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, শতবীণাঝঙ্কারিত মনোহারী ভাষায় "শম্ভোরম্ভময়ী মূর্ত্তি' বলিয়া মহাকবি কালিদাস যাঁহার দিব্য মহিমা জগতে প্রচার করিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখে যাঁহার "ব্রহ্মবারি" নাম শুনিয়াছি এবং যাঁহার অনন্ত পুণ্যময় সলিলে হিন্দু আজন্ম মরিতে বাঞ্ছা করেন, সেই স্বর্গারোহণ-

বৈজয়ন্তী জাহ্নবীকোলে প্রাচীন হিন্দুগণ যে, কি ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্ব স্ব শিশুসন্তানগণকে অর্পণ করিতেন, তাহা কি আধুনিক সভ্যতাভিমানী জড়বাদিগণ অমনি সহজেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন? আপন আপন ক্রোড় হইতে প্রাণপ্রিয় শিশুসন্তানগণকে মোক্ষদায়িনী মা গঙ্গার ক্রোড়ে দিয়া হিন্দুরমণীগণ শিশুপুত্রের ভাবী বিপদ্ আপদ্ হইতে নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহারা দিব্যচক্ষে যেন মা গঙ্গার ক্রোড়ে অর্পিত শিশুপুত্রগণের চিন্ময়বপু দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন এবং সেই জন্যই বুঝি তাঁহারা শোক মোহে আচ্ছন্ন হইতেন না। হিন্দু রমণীগণের অসীম ও অগাধ বিশ্বাসের পরিমাণ কে করিবে? পতিতপাবনী, ভাগীরথী মা গঙ্গাকে সামান্যা নদী বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে হিন্দুর এরূপ অলৌকিক আত্মসমর্পণ, বর্ব্বরোচিত কার্য্য বলিয়াই মনে হইবে কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে "সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গামাহাত্ম্য" তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। এখনও "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া প্রত্যহ কত শত সহস্র সহস্র হিন্দু যে মা গঙ্গার ক্রোড়ে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, তাহা বলা যায়না।

স্ব স্ব অভীষ্টদেবের অর্চ্চনায়, এ সংসারে হিন্দুর অদেয় বস্তু কিছুই নাই। ভগবৎপ্রীত্যর্থে প্রাচীন হিন্দুনরনারীগণ যে অমানুষিক ত্যাগের জলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। অলৌকিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বলে হিন্দুরমণীগণ যে সকল অদ্ভুত ও অমানুষিক মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হয়। বঙ্গরমণীগণ আপন আপন শিশু সন্তানগণকে পূতসলিলা ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হিন্দুর স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য আত্মত্যাগের যে চরম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যে তাঁহাদের অপত্যস্নেহের অভাববশতঃ নহে, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। যদি প্রকৃতই তাঁহারা অপত্যস্নেহের অভাববশতঃ কেবল অজ্ঞানসম্ভূত কুসংস্কারের প্রভাবেই নিতান্ত বর্ব্বরের ন্যায় পুত্রঘাতিনী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর এই অল্প কালের মধ্যে সেই সকল কঠোরহৃদয়া বঙ্গ রমণীগণ সুসভ্য সমাজের আদর্শস্থানীয়া ও দয়া ধর্ম্ম ও স্নেহ মমতার আধার স্বরূপা হইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে সুখ ও শান্তি বিতরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। অতি প্রাচীন সুসভ্য আর্য্য-সমাজ প্রচলিত আচার ব্যবহারের সম্যক্ পর্য্যালোচনা

করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কেবল ধর্ম্মের জন্য অসাধ্য সাধন করিতে আর্য্যগণ কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না। সন্তানের অপঘাত মৃত্যু হইবে ও স্বয়ং পুত্রঘাতিনী হইবেন, মনে করিলে আর্য্য-রমণীগণ কখনই সেরূপ স্বহস্তে নিজ শিশুগণের বধ সাধন করিতে সক্ষম হইতেন না।

ভক্ত বিশ্বাসী হিন্দুর চক্ষে যে, কি ভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা অবিশ্বাসী ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণ কি বুঝিবে? কোন দেব-প্রতিমা, তীর্থ বা অন্য যে কোন স্থানবিশেষেই হউক না কেন, ভক্ত হিন্দু-গণ যদি তাহাতে ভগবৎসত্তা অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বতঃই সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার এই অকিঞ্চিৎকর দেহের প্রতি তীব্র অনাস্থা জন্মায় এবং সেই শুভক্ষণে যদি তাঁহার দেহপাত হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। আবালবৃদ্ধবনিতা হিন্দুমাত্রেই জানেন যে, আত্মার বিনাশ নাই। সে জন্য আত্মজ্ঞানপ্রবণ আর্য্যজাতি, পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় সভ্যজাতির প্রকৃত অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই মৃত্যুভয়-রহিত হইয়াছিলেন। যে আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট জাতির পক্ষে মৃত্যু অতি অকিঞ্চিৎ-কর, সর্প-নির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায় অতি সহজেই যে জাতি দেহান্তর গ্রহণে সমর্থ, সেই আত্মবিজ্ঞানসম্পন্ন আর্য্যবংশধরগণের পক্ষে স্বীয় অভীষ্ট-দেবের আরাধনায়, যজ্ঞে, জীবসেবায়, কোন মহৎকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে, তীর্থে বা ঐশ্বরিক ভাবোদ্দীপক প্রাকৃতিক দৃশ্যে, তদ্গতপ্রাণ হইয়া আত্মসমর্পণ করা যে, নিতান্ত স্বাভাবিক, ভারতেতিহাসের প্রতি পত্রে আমরা তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

মুসলমান রাজত্বকালে এই ভারতে যে, প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যমহিলা-গণ, জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা কি আর্য্যজাতির মৃত্যুভয়রাহিত্যের এক বিশিষ্ট প্রমাণ নহে? যে জাতির অতি কোমলপ্রাণ নারীসমাজেও এরূপ মৃত্যুঞ্জয় ভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেই সুমহৎ জাতির অপূর্ব্ব চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা আধুনিক সভ্যতাভিমানী, দেহাত্মবাদী, বিমূঢ়-চিত্ত ব্যক্তিগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর্য্য-চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহারা ভারতে কেবল নিতান্ত বর্ব্বরোচিত আচার সমূহেরই ছড়াছড়ি দেখিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই বুঝি তাঁহারা বিভীষিকাগ্রস্তের ন্যায় হইয়া, আর্য্য জাতির বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাদের

কঠোর শাসনে অত্যাচার মূলক বীভৎস দুই একটী লোকাচার, নিষিদ্ধ হইলেও হিন্দুর স্বেচ্ছা-মৃত্যু আজিও লোপ পায় নাই। আত্মজ্ঞানরূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত আর্য্যজাতি, আজিও মৃত্যুভয়রহিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিকে° সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। স্বতসর্বস্ব আর্য্য জাতি আজি জগতে জন্ম মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য প্রচার করিয়া বহুতর সুসভ্য জাতিকে উন্নত করিতেছেন। নিঃস্ব ভারত আজিও আপন অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডারের অনুপম রত্নসমূহ অকাতরে বিতরণ করিয়া স্বীয় অসীম উদারতার পরিচয় দিতেছেন। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটীশ শাসনের প্রভাবে সহমরণ অপারগ বিধবার প্রতি বল-প্রয়োগ ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরাচরণ, নিষিদ্ধ হইয়া আমাদের দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু পতিব্রতা আর্য্যরমণীর সংকল্পিত কার্য্যে বাধা দিতে আজিও কেহ সমর্থ হয় নাই।

বিদেশীয়গণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে ভারতীয় আর্য্যসমাজ যখন অতি-শয় হীনদশা প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাতে নানাপ্রকার কুসংস্কার আসিয়া দেখা দিল। অধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে বল-প্রয়োগ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। সেই জন্যই বুঝি হিন্দুসমাজে কিছুদিন অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে সতীদাহ করিবার দুরাগ্রহ প্রকাশ পাইয়া-ছিল। সেই দুরাগ্রহের জন্যই অতি প্রাচীন সুসভ্য হিন্দুসমাজকে আজ অনেকেই অতিশয় ঘৃণিত ও হেয় বলিয়া পরিচিত করিতে উদ্যত।

কোনও আত্ম-জ্ঞান-বিহীন জাতিই হিন্দুর ন্যায় ঐশ্বরিক ভাবে মত্ত হইয়া অনায়াসে দেহপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা হিয়ান্ সাং যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন তো ভারত, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহা না হইলে কি আর বহুপ্রাচীন সুসভ্য চীনদেশ হইতে অমানুষিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া তিনি এই ভারতে ছুটিয়া আসিতেন? মহাত্মা হিয়ান্ সাং যখন ৺প্রয়াগধামে দেহপাত করিবার প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত দেখিয়া গিয়া-ছিলেন, তখন কি ভারতীয় আর্য্যসমাজ তবে এতই ঘৃণিত ছিল, আর এই অত্যল্পকাল মধ্যেই বিজাতীয় শিক্ষালোক প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ব্বরসমাজ একেবারে সুসভ্য হইয়া উঠিল?

হতভাগ্য ভারতে এখন আর ঘরে ঘরে হিন্দুর সেই সহমরণ নাই, এখন আর দেহাদিভাবশূন্য হিন্দুর স্বীয় অভীষ্টদেবের সম্মুখে কথায় কথায়

অকপট আত্মনিবেদন নাই, এখন আর চিন্ময়ী গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গমের অপরূপ লহরী দর্শনে, বিভোর হইয়া কাহারও আত্মবিসর্জ্জন করিবার উপায় নাই, সত্য ; কিন্তু প্রকৃত আত্মহত্যার হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে। পারিবারিক বিবাদ কলহে বা অন্য কোনও অকিঞ্চিৎকর কারণে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নরনারীগণ, এক্ষণে যেমন কথায় কথায় উদ্বন্ধনে ও অন্যান্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া সাংসারিক ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তখনকার লোক বোধ করি এত মূঢ় ছিলেন না।

সে যাহা হউক, ঘটনাবৈচিত্র্যে প্রয়াগভূমি যে, আমাদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কত অদ্ভুত ও লোকাতীত ঘটনাই যে, প্রয়াগরাজের দর্শনে আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাহা এই প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এখনও এই বিচিত্র ভূমির চমৎকারিতা সমানভাবেই আছে। প্রয়াগের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের সহিত তুলনা করিলে যদিচ ইহার বর্ত্তমান অবস্থার হীনতা প্রকাশ পাইবে, তথাপি তীর্থমাহাত্ম্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এখনও প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিবেন যে, এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-লহরীর কি অসীম শক্তি, এবং সেই মহাশক্তির প্রভাবে আবহমানকালাবধি এই বিচিত্রক্ষেত্রে কত অদ্ভুত, লোকপাবন মহৎকার্য্য সমুদয় অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে শুভমুহূর্ত্তে এই পবিত্রভূমি গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-লহরীতে পরিপ্লাবিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই এই অপূর্ব্বক্ষেত্র অনন্তশক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে এবং সেই অবধি অসংখ্য অদ্ভুত, বিচিত্র ও অলৌকিক কীর্ত্তি সমূহের আধার ভূমি হইয়া পুণ্যধাম প্রয়াগ আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম হওয়াতেই প্রয়াগ ভূমির এত বিচিত্রতা, এত শক্তি, এত মহত্ত্ব! এখনও প্রয়াগে প্রত্যহ কত দান ও ব্রত অনুষ্ঠিত হইতেছে যে, তাহারই ইয়ত্তা হয় না। প্রয়াগের এই বিচিত্রতার মুখ্য কারণই গঙ্গা ও যমুনার একত্র সম্মিলন। অপরা-বিদ্যারূপিণী শ্রীযমুনা, যেন পরা-বিদ্যারূপিণী ভাগীরথীর সলিলে মিলিতা হইয়াছেন ; প্রবৃত্তিরূপা যমুনা আপন লীলা শেষ করিয়া যেন নিবৃত্তিরূপা ভাগীরথীর শান্তিবারিতে নিমগ্না হইয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলাসঙ্গিনী যমুনা দর্শনে যেমন আসন্নমুক্ত পুরুষের হৃদয়েও সেই অনুপমা, মধুময়ী ভগবল্লীলারসমাধুরী পান করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, তেমনি অনন্তসলিলা ভাগীরথী দর্শনেও জীবের সকল বাসনার নিবৃত্তি হয়। গতিদায়িনী ভাগী-

রথী যেমন জীবের মোক্ষদায়িনী হইয়া স্বীয় অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য আজিও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, শেষের সেই দিন স্মরণ করাইয়া যেমন জীব সমূহের বৈরাগ্য সাধন করিতেছেন কালিন্দী যমুনাও তেমনি শ্রীভগবানের সেই অপূর্ব্ব ব্রজলীলার কথা স্মরণ করাইয়া মুক্তপুরুষগণকেও যেন এই মর্ত্ত্যে আহ্বান করিতেছেন; মহাবৈরাগ্যবান্ পুরুষের হৃদয়েও যেন পুনরায় সেই ভগবল্লীলা দর্শন করিবার বাসনা জাগরূক করিয়া দিতেছেন।

বিচিত্র-স্বভাব-সম্পন্না গঙ্গা ও যমুনার মাহাত্ম্য প্রভাবেই প্রয়াগরাজ অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও ভোগ এবং অপূর্ব্ব বিবেক, বৈরাগ্য ও ত্যাগের লীলাভূমি হইয়া হতভাগ্য ভারতের অপার মহিমায় এখনও সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। যমুনা যেন স্বীয় অনন্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার প্রয়াগের বিচিত্র কূলে ঢালিয়া রাখিয়াছেন এবং স্বকার্য্য সাধন করিয়া বহুকালের পর জাহ্নবীসঙ্গিনী হইয়া এ জগতে নিবৃত্তির জয়ঘোষণা করিতে করিতে অপূর্ব্ব গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

ক্রমশঃ

আগমনী।

ওহে ধরাধর, মম বাক্য ধর হও অগ্রসর আনিতে নন্দিনী।
কণ্ঠাগত প্রাণ বিনে উমাধন হেরে সে বদন যুড়া'ব হে প্রাণী॥
শরতের শশী হেরিয়ে নয়নে,
শারদারে সদা পড়ে মোর মনে ;
কতক্ষণে আসি শুনা'বে শ্রবণে
(তার) আধ আধ বিধু মুখে 'মা' 'মা' বাণী॥
গিরি সে গিরিশে কহিবে আসিতে,
হরগৌরী চক্ষে বাসনা হেরিতে,
দ্বিতীয় কৈলাস হবে এ গিরিতে,
ঈশান বামেতে বসিবে ঈশানী॥

গা তোল গো রাণি, কেন পাগলিনী,
অই যে এলো তোর দুঃখহরা তারা।
লয়ে কার্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী,
সঙ্গে পশুপতি, দেখ ভবদারা॥
দুর্গমে পড়িয়ে, যে ডাকে তোর মেয়ে,
রাখে গো অভয়ে, অই অভয়ে,—
ওযে সকল দুঃখহারিণী, কাল-বারিণী,
ভুবনমোহিনী, পরাৎপরা॥
এমন মেয়ে কোথায় ছিল, তোর গর্ভে এলো,
ভুবন কর্লে আলো, অই নন্দিনী,—
কত যোগী জটাধারী, দণ্ডী ব্রহ্মচারী,
ভাঙ্গড় ভিখারী, চিন্তে চিন্তামণি,
ওযে দেয় না কারে ধরা, হরের মনোহরা,
কখন সাকারা, কভু নিরাকারা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

রাণী ত্যজ ত্যজ ত্যজ ধরাসন।
গত নিশা অবসানে দেখেছি স্বপন॥

অদ্য উমা সন্ধ্যাকালে,
আসিবেন বিল্বমূলে,
কল্য তুমি কোরো কোলে
জীবনের জীবন॥

সাজিয়ে রাখ বরণডালা,
আসিবেন সর্ব্বমঙ্গলা,
পাবে দুঃখার্ণবের ভেলা,
সঙ্গে ত্রিলোচন॥

আন্‌তে ভব ভবানীরে,
লক্ষ্মী থাকৃ ধরা কোরে,
পূর্ণ কুম্ভ রাখ দ্বারে
মঙ্গল কারণ॥

৺ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রম বিদ্যালয় হইতে কাঙ্গাড়া উপত্যকায় ভূমিকম্প-পীড়িতগণের সাহায্যকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। তাহা এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

———

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ উক্ত আশ্রমের একটী ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন সংস্কার হইয়া গিয়াছে। বালকটীর পিতৃবিয়োগ হইবার কয়েকমাস পরেই সে আশ্রমভুক্ত হয়, সেই জন্য উপনয়নের কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহার সপিণ্ড-করণাদিও করাইতে হয়। এতদুপলক্ষে বিগত ২৭শে শ্রাবণ আশ্রম স্কুলের সমুদয় ছাত্র, শিক্ষক ও কয়েক জন বন্ধু বান্ধবকে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

———

অল্প দিন হইল, নিউইয়র্কে এক সভা হয়, তাহাতে প্রায় ২৫০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ ভারতকে কিছু শিখাইতে পারে কি না, ইহাই আলোচ্য বিষয় ছিল। সভায় অনেকেই বলেন, ভারতবাসী জীবনের সমুদয় সমস্যাগুলিকে যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখেন, পাশ্চাত্য-দেশবাসী সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভারতীয় আচার্য্যগণ এখানে যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার প্রভাবেই যে আমেরিকায় নানাবিধ প্রাচ্য-ভাবাপন্ন নব নব নামধারী সম্প্রদায় সকলের অভ্যুত্থান হইতেছে, তাহাও অনেকে স্বীকার করেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি আমেরিকানেরা ভারতবাসীর যথার্থ কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে যেন তাহারা ভারতে খ্রীষ্টিয়ান মিসনরি প্রেরণ না করিয়া কার্য্যদক্ষ, বুদ্ধিমান্, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রাপ্ত এমন লোক সকল প্রেরণ করেন, যাঁহারা ভারতবাসীকে তাহাদের বর্ত্তমান সমস্যায় শিল্পবিজ্ঞানাদি শিখাইয়া সাহায্য করিতে পারেন। ভারত ও পাশ্চাত্যদেশ ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানশিক্ষার আদান প্রদান না করিলে কাহারই কল্যাণ নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিবেকানন্দ অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহার নানা বক্তৃতায় এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন—আমেরিকাবাসিগণ এক্ষণে কিছু কিছু বুঝিতেছেন, কিন্তু আমাদের মোহনিদ্রা কেন ভাঙ্গিতেছে না বলিতে পারি না। যতই আন্দোলন হউক, আত্মসম্মানজ্ঞান প্রবলরূপে জাগরিত

হইয়া আমাদিগকে যতদিন না যথার্থ উন্নত করিবে, ততদিন অধিকার লাভের প্রত্যাশা আল্নাস্কারের দিবাস্বপ্নের ন্যায়। স্বামীজি কোন পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড আমরা ধর্ম্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়, এ দুর্দ্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভাসমিতি দ্বারা উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। * * এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয়, ইউরোপ বিজয়, আমেরিকা বিজয়, তাহাতেই দেশের কল্যাণ।"

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীজি ৺রাধাকান্ত দেবের বাটিতে কলিকাতাবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তরে বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে ও কলিকাতার যুবকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার দু একটি এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"বাঙ্গালী জাতিকে লোকে ভাবুক, কল্পনাপ্রিয় ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকে—কথা অতি সত্য। তাহারা এই বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করে। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নহে, হৃদয়বান্ লোকই দৈববাণী শুনিতে পায়। বুদ্ধি আমাদিগকে অধিকদূর অগ্রসর করিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাঙ্গালী দ্বারাই এই মহাব্রত সাধিত হইবে।"

"হে কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, তোমাদের মাতৃভূমির জন্য জীবন বলি দিতে হইবে। যুবকগণের দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইবে। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমি এই বঙ্গদেশেই প্রবল উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান্। হে কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দ! হৃদয়ে এই উৎসাহাগ্নি জ্বালিয়া জাগরিত হও। ভাবিও না, তোমরা নিঃস্ব, ভাবিও না, তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছে, টাকায় মানুষ করে? জগতের যত কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহবলে হইয়াছে। * * আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ, আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এরূপ [illegible] নাই।"

উদ্বোধনের ৭ম নিয়মানুসারে
১৫ই আশ্বিন উদ্বোধন বন্ধ থাকাতে ১লা কার্ত্তিক
১৭শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল

আমি কে ?

—*—

আমি কে জানি না বলিতে পারি না
কেন বা এসেছি জগতীতলে।
কি খেলা খেলিব কি কাজ সাধিব
কা'রে সুধাইব কে দিবে বোলে॥
আছি মায়া ঘোরে ঘুমের অঘোরে
কে ভাঙ্গিবে ঘুম জানিতে চাই।
আশার নেশায় ঘুরে মরি হায়
বাসনার বশে নিয়ত ধাই॥
এ কেমন খেলা প্রমোদের মেলা
কাহার এ লীলা বুঝিতে নারি।
আমি কা'র বশে কোথা' যাই ভেসে
কি আশার আশে ঘুরিয়ে মরি॥
জানিনা'ক হায়! কে মোরে ঘুরায়
কেন নিয়ে যায় কিসের তরে।
আকুল হৃদয়ে যেতেছি ছুটিয়ে
কেন ব্যাকুলতা, কে বলে মোরে॥
আমি বা কাহার কে আছে আমার
কেন বা সংসার ভাবিগো তাই।
আপন আপন করি সর্ব্বক্ষণ
আপনার জন কেহ ত নাই॥

এই যে সুন্দর জন মনোহর
বিমল মধুর আলোক ভরা।
নিতি নীলাকাশে রবি শশী হাসে
সুজলা সুফলা শোভিতা ধরা॥
কাহার আদেশে এ জগত হাসে
কাহার নিয়মে চালিত হয়।
আমি বা কি আশে এসেছি এ বাসে
কেন এ জীবন যাতনা সয়॥
জড়া'তে জীবন চাহে অনুক্ষণ
মরম বেদন জানা'ব কা'রে।
কেন বা এ জ্বালা হৃদয়ের মলা
কেন গো বিষাদে নয়ন ঝরে॥
মিছে ভালবাসা শুধু কাঁদা হাসা
জীবনের সুখ খুঁজিতে গিয়ে।
সারাটি জনম করিয়ে রোদন
কেটে যায় দিন জ্বালাযে হিয়ে॥
একি মিছে খেলা দু'দিনের মেলা
কেটে যায় বেলা নেশার ঘোরে।
এ নেশা ভাঙ্গেনা ভাঙ্গিতে চাহে না
কা'র প্রবঞ্চনা কে বলে মোরে?
খেলিতে এসেছি খেলাতে ভেসেছি
জানি না কোথায় খেলার শেষ।
শুধু মিছে কাজে এসে ধরা মাঝে
মাতিয়া সংসার খেলিনু বেশ॥

শ্রীউষাপ্রমোদিনী বসু।

অদ্বৈতবাদ।

(শ্রীআশুতোষ দেব এম, এ।)

কিরূপে ভগবান্‌কে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহারিক ভিত্তি হইতে ন্যায়বৈশেষিকে এবং সাংখ্যপাতঞ্জলে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সর্ব্বভূত ভগবানে কিরূপে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাই পারমার্থিক ভিত্তি হইতে আলোচিত হইবে।

আমরা প্রথমে ব্রহ্ম সম্বন্ধে, তৎপরে জীব সম্বন্ধে এবং অবশেষে জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমে ব্রহ্মের স্বরূপ ও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তৎপরে জীবের স্বরূপ ও ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এবং অবশেষে জগতের স্বরূপ, অর্থাৎ বাস্তবিক জগৎ আছে কি নাই?—জগৎ সত্য না মিথ্যা?—এই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

এখানে বলাই বাহুল্য যে, অদ্বৈতবাদ যে মুখ্য বাদ এবং বেদান্ত দর্শন যে সকল দর্শনের শ্রেষ্ঠ, তাহা সকল আস্তিক দর্শনই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দেহাত্মবাদী জীব, অদ্বৈতবাদকে সহজে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই, ঋষিগণ ব্যবহারিক সত্যের আলোচনা করিয়া জীবকে পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। জীব সূক্ষ্মের ধারণা করিতে অধিকারী হইলে পারমার্থিক সত্যের আলোচনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পারমার্থিক তত্ত্বের আলোচনা করিলে কিরূপে জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জ্ঞান জন্মে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১। পরব্রহ্ম।

উপনিষদে ব্রহ্মের দুইটী ভাব দেখান হইয়াছে,—একটী নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প বা নির্গুণ ভাব এবং অপরটী সবিশেষ, সবিকল্প বা সগুণ ভাব। এই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে,—"দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে" (বৃহদারণ্যক, ২।৩।১) অর্থাৎ ব্রহ্মের দুইটী রূপ। "এতদ্ বৈ সত্যকাম পরং অপরঞ্চ ব্রহ্ম" (প্রশ্ন, ৫।২) অর্থাৎ হে সত্যকাম! এই পর ও অপর ব্রহ্ম।

এই দুই ভাব প্রতিপাদনের জন্য উপনিষদ্ দুই প্রকার ভাবের কথা বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্ম-বিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ, ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষ-

লিঙ্গাঃ। অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে দুই প্রকার শ্রুতি দৃষ্ট হয়। এক সবিশেষ লিঙ্গ শ্রুতি, যেমন তিনি সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস। অন্য নির্ব্বিশেষ শ্রুতি, যেমন তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন দীর্ঘও নহেন।

যে ভাবের দ্বারা তাঁহাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত, লক্ষণে লক্ষিত, চিহ্নে চিহ্নিত, গুণে প্রকাশিত করা যায়না, সেই ভাবকে নির্ব্বিশেষ ভাব বলে। এই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"—(তৈত্তিরীয়, ২।৪।১) অর্থাৎ যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন নিবর্ত্তিত হইয়া আইসে। "নেতি নেতি", অর্থাৎ "তিনি ইহা নহেন" এই মাত্র বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। "স এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃহদারণ্যক.৪।৪।২২), অর্থাৎ তাঁহার এইমাত্র পরিচয় যে,"তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন।" যেমন, তাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখ নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে; তিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন; তিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত,আত্মপ্রত্যয়মাত্রসিদ্ধ,প্রপঞ্চাতীত, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। তিনি নিরুপাধি, অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ উপাধিশূন্য। এই জন্য তাঁহাকে বলা হইয়াছে যে,—'একমেবাদ্বিতীয়ং"। অর্থাৎ তিনিই আছেন, তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—"নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম",—ব্রহ্ম নির্দ্দোষভাবে সম। অর্থাৎ তিনি, বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগত—এই ত্রিবিধ ভেদ বর্জ্জিত। ভিন্ন জাতীয় দুই পদার্থে যে ভেদ, তাহাই বিজাতীয় ভেদ; যেমন পশুতে ও মানুষে ভেদ। ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অন্য জাতীয় পদার্থ নাই, তখন ব্রহ্ম যে বিজাতীয় ভেদ বর্জ্জিত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এক জাতীয় দুই ব্যক্তিতে যে ভেদ, তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ; যেমন রাম ও শ্যামে ভেদ। ব্রহ্ম যখন অদ্বিতীয়, সমকক্ষহীন, তখন তাঁহাতে স্বজাতীয় ভেদের সম্ভাবনা কোথায়? একই ব্যক্তিগত যে প্রভেদ, তাহার নাম স্বগতভেদ; যেমন একই বৃক্ষে পত্র, শাখা, ফুল, ফল ইত্যাদির ভেদ। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ সম, সর্ব্বাংশে, সর্ব্বাবয়বে এক, তখন তাঁহাতে স্বগত ভেদেরই বা অবকাশ কোথায়? এই জন্যই লিখিত হইয়াছে যে,—"ন সন্, ন চাসন্, শিব এব

কেবলঃ”—অর্থাৎ, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, এক ও অদ্বিতীয় শিব। গীতা বলিয়াছেন যে,—“অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে,”—অর্থাৎ, পর ব্রহ্মের আরম্ভ নাই; তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন। এই জন্য ভাগবত বলিয়াছেন যে,—

“ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥”

(শ্রুত্যধ্যায়)

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, নির্গুণ, সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন; তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে সগুণ বাক্য সকল প্রযুক্ত হইতে পারে? এখানে ব্রহ্মকে সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, তিনি চিৎও নহেন, জড়ও নহেন; তিনি সুখও নহেন, দুঃখও নহেন। তাহাকে চিৎ বলা যায়না; কারণ চিৎ যাহা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানও তাহা। পরব্রহ্ম যখন “একমেবাদ্বিতীয়ং” যখন তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন তাঁহার জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? বিষয় না থাকিলে, তিনি বিষয়ী হইবেন কি লইয়া? সেই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে,—

“তদা কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।”

(বৃহদারণ্যক)

অর্থাৎ যে অবস্থায় সমস্ত একাকার, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে? পরব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানেন, একথা বলাও সঙ্গত নহে। কারণ,—

“একএব আত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বেন চ উভয়থা ভবতীতি চেৎ ন। যুগপৎ অনংশত্বাৎ, ন হি নিরবয়বস্য যুগপৎ জ্ঞেয়জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ॥” (তৈত্তিরীয় ১।১২ শঙ্করভাষ্য)

অর্থাৎ আত্মা নিজে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা উভয়ই এইরূপ হইতে পারেন না। যাহা নিরংশ অর্থাৎ অবয়বহীন, তাহা এক সঙ্গে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উভয়ই হইতে পারেনা। এই জন্য যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, “যশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ”—ব্রহ্ম চেতন হইয়াও পাষাণ।

ব্রহ্মকে,—“অণোরণীয়ান্” অর্থাৎ তিনি অণু হইতেও অণু অথচ মহান্ হইতেও মহান্, বলা হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহাকে অসীম ও অনন্তও বলা যায় না। ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে,—

"বেদ্যং সর্প! পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখম্ অসুখঞ্চ যৎ"।

(মহাভারত, বন, ১৮০।২২)

অর্থাৎ, হে সর্প! যিনি দুঃখও নহেন, সুখও নহেন, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম জানিবে।

সুতরাং আমরা অবগত হইলাম যে, পরব্রহ্ম সত্য নহেন, অসত্য নহেন ; বিজ্ঞান নহেন, অবিজ্ঞানও নহেন ; আনন্দ নহেন, নিরানন্দ নহেন ; সান্ত নহেন, অনন্তও নহেন ; সুখও নহেন, দুঃখও নহেন। সেইজন্য নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহাকে স্তব করা হইয়াছে,—

"নমস্তে সত্যরূপায় নমস্তেঽসত্যরূপিণে"
নমস্তে বোধরূপায় নমস্তেঽবোধরূপিণে
নমস্তে সুখরূপায় নমস্তেঽসুখরূপিণে ॥

(সূতসংহিতা-৩-৩৩, ৩৪)

অর্থাৎ তুমি সত্য স্বরূপ, তুমি অসত্য স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার, তুমি জ্ঞানস্বরূপ, তুমি অজ্ঞানস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ; তুমি সুখ স্বরূপ, তুমি অসুখস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। অর্থাৎ পরব্রহ্ম সৎ, অসৎ, চিৎ, জড়, সুখ, দুঃখ—এ সকলের সমন্বয়ে অনির্ব্বচনীয় বস্তুরূপে বিরাজ করিতেছেন। এইজন্য যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির সমন্বয় হইয়া থাকে। দেশ, কাল ও নিমিত্ত যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈত কি, আর অদ্বৈতই বা কি? ফলতঃ তিনি দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন ; জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন ; সৎও নহেন, অসৎও নহেন ; ক্ষুব্ধও নহেন, প্রশান্তও নহেন। ব্রহ্মে সকল দ্বৈতের অবসান হয় বলিয়া পরব্রহ্মে সমস্ত বিরুদ্ধ লক্ষণের, সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, তবে এইমাত্র বলা যায় যে, 'অস্তি' অর্থাৎ তিনি অস্তিত্বস্বরূপ। তাহার অতিরিক্ত কিছু বলাও যায় না, জানাও যায় না। এইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে,—

"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"

(কঠ, ৬।১২।)

অর্থাৎ "অস্তি এই মাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না।

———

২। সগুণ ব্রহ্ম।

কিন্তু ঐরূপ নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, ভেদরহিত ব্রহ্মের দ্বারা জগৎ রচনা হয় না বলিয়া, ঋষিগণ ব্রহ্মের আর একটী বিভাবের কল্পনা করিয়াছেন, সেটী সবিশেষ সগুণ ভাব, যথা,—

"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্ তদেষা অভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্॥ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি। তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের পরম প্রাপ্তি হয়। তদ্বিষয়ে এইরূপ উক্তি আছে,—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। যিনি পরম আকাশে গুহাহিত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার সহিত সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ দেখেন। সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যিনি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন, যাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে, তিনি জগৎকারণ ব্রহ্ম। নিরুপাধিক ব্রহ্ম যখন মায়া উপাধি স্বীকার করিয়া সোপাধিক হন, তখনই তাঁহা হইতে তত্ত্বসৃষ্টি আবির্ভূত হয়। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"

(কঠ—২।৫।১৫।)

অর্থাৎ তিনি প্রকাশিত হইলে সকল বিষয় প্রকাশিত হয়, তাঁহারই প্রকাশে সকল বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন যে,——

"অদৃষ্টো দ্রষ্টাঃ অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষত আত্মান্তর্য্যামী অমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং।" (৩।৭।৮)

তিনি অদৃষ্ট হইলেও দর্শন করেন, তিনি অশ্রুত হইলেও শ্রবণ করিয়া থাকেন, অচিন্ত্য হইলেও তিনি চিন্তা করিয়া থাকেন, অজ্ঞাত হইলেও তিনি বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন আর কেহ দর্শক, শ্রাবক, অথবা জ্ঞাতা নহেন। তিনি আত্মা, অন্তর্যামী, অবিনাশী। ইঁহা ভিন্ন অপর সকল ধ্বংশ হইয়া থাকে। ইঁহাকেই সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। ইঁহারা সম্বন্ধে শ্রুতি

বলিয়াছেন যে, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রবিশৎ"—অর্থাৎ তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে প্রত্যগাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।" (৩—২—২৪) অর্থাৎ, সংরাধন কালে তিনি দৃষ্ট হন, শ্রুতি স্মৃতি ইহার প্রমাণ। ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নাম সংরাধন। ব্রহ্মের এই যে সবিশেষ ভাব, ইহা সংরাধনে দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য নহে;—কেবল মাত্র সমাধিলভ্য। এই সমাধি দ্বিবিধ,—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধাতা ও ধ্যেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে; কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমস্ত ভেদবুদ্ধি, সমস্ত দ্বৈত দর্শন তিরোহিত হয়। তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, বিষয়ী ও বিষয় একাকার হইয়া বিলুপ্ত হয়।

"শ্রুতি এই সগুণ ব্রহ্মের ভাব নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন যথা;—

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।"।—মাণ্ডুক্য। ৩৬।

অর্থাৎ ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ, ইনি ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান।

ইনি দুই প্রকার লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন, যথা—তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ—এই প্রকার যে লক্ষণ, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণ বলে। তটস্থ লক্ষণ অন্য প্রকার, যেমন "তজ্জলানেতি,' অর্থাৎ তাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই ইহা স্থিত রহিয়াছে এবং তাঁহাতেই ইহা লয় পাইবে। এই লক্ষণ প্রকাশ করিতে গিয়া বেদান্ত বলিয়াছেন যে,—"জন্মাদ্যস্য যতঃ", অর্থাৎ যে ব্রহ্ম হইতে জন্মাদি হয়।

শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটী ভাব লক্ষ্য করিয়া উভয় লিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

(শ্বেতাশ্বতর)

অর্থাৎ তিনি, (১) একদেব, অর্থাৎ অদ্বিতীয় দ্যোতন স্বভাব (২) সর্ব্বভূতগূঢ়, অর্থাৎ সকল প্রাণীতে সংবৃত, (৩) সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা (৪) কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিকৃত বিচিত্র কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, (৫) সর্ব্বভূতাধিবাস, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বভূতে বাস করিতেছেন, (৬) সাক্ষী (৭) চেতয়িতা, (৮) কেবল অর্থাৎ নিরুপাধিক এবং (৯) নিগুর্ণ। এই নয়টী বিশেষণ দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব, নিমিত্তকারণত্ব এবং অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, কিরূপ ব্রহ্ম বেদান্তের লক্ষ্য ?—ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—

"অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্।"

(ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করভাষ্য ৩।২।১১)

অর্থাৎ অতএব উভয় লিঙ্গ নির্দ্দেশ থাকিলেও, সমস্ত বিশেষরহিত নির্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, তদ্বিপরীত সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম নহেন।

কিন্তু মনুষ্য এই নির্গুণ ব্রহ্মে একেবারে উপনীত হইতে পারে না বলিয়া শ্রুতি সগুণ ব্রহ্মের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রুতি এই সগুণ ব্রহ্মকেই হিরণ্য-গর্ভ, বিরাট পুরুষ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন, ত্রিগুণাধিষ্ঠিত চিচ্ছক্তিই সগুণ ব্রহ্ম। গীতা নিম্নোক্ত প্রকারে ইঁহার যোগৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) আমি জীবগণে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহি। অর্থাৎ আমি জগতের নিমিত্ত কারণ। (২) জীবগণ আমাতে অবস্থিত থাকিয়াও আমাতে অবস্থিত নহে। জীবগণ আমার সহিত অসংশ্লিষ্ট অথচ আমি জগদাধার। (৩) আমি সকল বস্তুর সংহার করিতেছি অথচ ঐ সমস্ত বস্তুই বিনাশের পর আমার সহিত সম্মিলিত হইতেছে। (৪) আমিই সৎ; মনুষ্য যাহা ধারণ করিতে পারে, তাহা আমার মায়া মাত্র, তাহা আমার সত্তার প্রতিবিম্ব মাত্র। (৫) আমিই সম্পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার গুণ আমাতে সমভাবে সম্মিলিত আছে। (৬) আমি ইচ্ছাবশতঃ সৃজন করি না, আমি আমার স্বভাব বশতঃ সৃজন করি। আমি একই কালে কর্ত্তা ও উদাসীন।

গীতা আমাদিগকে ইহা বুঝাইয়াছেন যে, ঈশ্বর স্রষ্টা হইয়াও অস্রষ্টা, পাতা হইয়াও অপাতা, সংহর্ত্তা হইয়াও অসংহর্ত্তা, ধাতা হইয়াও অধাতা, কর্ত্তা

হইয়াও উদাসীন। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে, তিনি, স্রষ্টা, পাতা প্রভৃতি কিরূপে হইয়া থাকেন? শ্রুতি বলিয়াছেন্ যে, তিনি মায়া দ্বারা জগৎ রচনা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নগণ্য একটী জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া, অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন দেবাদি এবং সামান্য একটী পরমাণু হইতে বহুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী পর্য্যন্ত, কেহই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট নহে। সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। এই সুবিশাল বিশ্বরাজ্যের একটী অতি সামান্য পদার্থও যখন বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই, তখন চিন্ময়ী গঙ্গা ও প্রেমময়ী যমুনারও যে, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাহা নিশ্চয় সুতরাং গঙ্গা ও যমুনা মাহাত্ম্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাস না দিলে প্রকৃত উত্তরাখণ্ড মাহাত্ম্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এই জন্যই আমাকে বাধ্য হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করিয়া হিন্দুর তীর্থগুলি যে, কত পবিত্র ও মহৎ এবং তাহাদের ঐশী শক্তিতে হিন্দু হৃদয় যে, কি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃত চরিত্রমাহাত্ম্য যে সকলের বোধগম্য নহে এবং বিদেশী ও বিজাতীয় ধর্ম্মযাজকগণ আত্মজ্ঞানপরায়ণ, অসীমশ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্য্য চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই যে সর্ব্বসমক্ষে তাহার বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করেন, সুতরাং তাহা যে একান্ত অমূলক, তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পৃথিবীর আদিম অধিবাসী, বেদবিৎ আর্য্যগণ যে, কোন কালেই বর্ব্বর ছিলেন না এবং তাঁহাদের কোন আচার ব্যবহারই যে, বর্ব্বরজনোচিত ছিল না, বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্নরূপ হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ইহাও আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহা হউক, এক্ষণে তীর্থরাজ প্রয়াগের ভোগমোক্ষদ দেবদুর্লভ পবিত্ররেণু, শিরে ধারণ করিয়া শ্রীকেদারনাথের পথমধ্যস্থ সেই মন্দাকিনী ও কালীগঙ্গা সঙ্গম স্থল হইতে অগ্রসর হইয়া দেখা যাউক, ৺কেদারনাথ কেমন।

পূর্ব্বাহ্নেই সুপবিত্র দেবনদীসঙ্গমে অবগাহন করিয়া আমি তথা হইতে গৌরীকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগীনারায়ণের পর শ্রীকেদারনাথের নিয়ে স্বমাহাত্ম্য প্রভাবে গৌরীকুণ্ড বিশেষ প্রসিদ্ধ। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতেই ভক্ত যাত্রিগণের মন, গৌরীকুণ্ড দর্শনাভিলাষে উৎফুল্ল হয় এবং তথায় পঁহুছিবার জন্য চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হয়। তাহার প্রধান কারণ এই যে, গৌরীকুণ্ডে পঁহুছিতে পারিলেই মনে হয়, যেন শ্রীকেদারনাথে গিয়া পঁহুছিলাম এবং গৌরীকুণ্ডের তপ্ত ধারার কথা শুনিয়া তাহাতে স্নান করিবার জন্য স্বভাবতঃই শীতকাতর যাত্রিগণের ইচ্ছা বলবতী হয়। কেদারের নিদারুণশীতসহনাক্ষম যাত্রিগণের পক্ষে গৌরীকুণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ যে নিতান্তই সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গৌরীকুণ্ডাভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, গিরিরাজের অভিনব অত্যুজ্জ্বল বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে হইল, যেন তিনি স্তরে স্তরে নানা বিচিত্র বেশে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন; যতই উপরে উঠি ও চতুর্দ্দিকে অবলোকন করি, মনে হয় যেন একে একে হিমগিরির বহিরাবরণগুলি ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতেছি। অপূর্ব্ব কেদাররাজ্যে গিরিরাজের নিত্যই নব নব, বিচিত্র সাজসজ্জা এবং তাহার অধিকতর উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার মন প্রাণ যে, কিরূপ মুগ্ধ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। যে কেদারনাথের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অপার সৌন্দর্য্য রাশিরই ইয়ত্তা হয় না, না জানি সেই কেদার কেমন, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় আমি গৌরীকুণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অতি বিচিত্র, ঘন, নিবিড়, অরণ্যানী সমাচ্ছাদিত, তুষারাচ্ছন্ন, উত্তুঙ্গগিরিশ্রেণীপরিবেষ্টিত, নাতিপ্রশস্ত ভূখণ্ডে, সুপবিত্র গৌরীকুণ্ড প্রতিষ্ঠিত। মন্দাকিনীর বিমল সলিলে গৌরীকুণ্ড সদা সুষিক্ত এবং উচ্ছ্বলিতা প্রবাহিনীর সুশীতল শীকরে সদা স্নাত। গৌরীকুণ্ডের মন্দিরে জগন্মাতা গৌরীর এক দিব্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তাহার পাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবল বেগ-

বর্ত্তী মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইয়াছেন। গৌরীকুণ্ডের সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিতা মন্দাকিনী, যেন জগজ্জননীর মন্দির সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কিছু শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন। অন্যান্য স্থানে মন্দাকিনীর যে ভৈরব গর্জ্জন শ্রুত হইয়াছিল, তাহা যেন এইখানে মহামায়ার স্তুতিগানে পরিণত হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুমধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। তাহার পর একটী উষ্ণপ্রস্রবণধারায় উত্তপ্ত এই দেবদুর্লভ পরম রমণীয় গৌরীকুণ্ড, বহুদূরদেশাগত ভক্ত যাত্রিগণের পক্ষে অধিকতর সুখপ্রদ হইয়া রহিয়াছে ও কেদারের নিদারুণ শীতসহনক্ষম করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়কে সবল করিতেছে। এই তপ্ত ধারার উষ্ণজল কৃত্রিম উপায়ে প্রবাহিত হইয়া অবিরাম ঝর্ঝর শব্দে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত কুণ্ডে নিপতিত হইতেছে। এই কুণ্ডকে গৌরীকুণ্ড বলে। উক্ত জলপ্রবাহ কুণ্ডে অবরুদ্ধ না হইয়া একেবারে স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনীর তুষারবিগলিত, অতি শীতল জলরাশিতে মিলিত হইয়াছে। এই উষ্ণ প্রস্রবণ গন্ধক মিশ্রিত হওয়ায় ইহাতে কয়েকবার স্নান করিলে সকল প্রকার চর্ম্মরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়। ৺কেদারনাথের পথে আর কোথাও এরূপ উষ্ণ প্রস্রবণ দেখি নাই। চির-হিমানীর মর্ম্মভেদী শীত বাতে কাতর যাত্রিগণ এই তপ্ত ধারায় স্নান করিয়া বড়ই আরাম বোধ করেন। এই তপ্ত ধারায় স্নান করিয়া তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য কেদারের অসহ্য শীত-কষ্ট বিস্মৃত হন।

আমি গৌরীকুণ্ডে পঁহুছিয়াই দেখিলাম যে, স্থানটী নানাদেশীয় যাত্রি-সমাগমে পরিপূর্ণ; যাত্রিগণের কোলাহল ও দেবনদী মন্দাকিনীর কলনাদ উভয়ে মিলিত হইয়া এক প্রকার অপূর্ব্বধ্বনির সৃষ্টি করিতেছে। ৺কেদার-নাথের পথে অগস্ত্য মুনি, গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগী-নারায়ণের পর, এমন স্বভাব-সুন্দর, জনমানবপূর্ণ চটী, এবং সুপ্রশস্ত, পরম রমণীয় স্থান আর একটিও দেখি নাই। এইখানে কয়েকখানি দোকান আছে, তাহাতে যাত্রি-গণের আবশ্যকীয় প্রায় সকল প্রকার আহার্য্য সামগ্রীই পাওয়া যায়, বাসোপযোগী ঘরেরও অপ্রতুল নাই। ৺কেদারনাথের পথে এই গৌরী-কুণ্ডই শেষ প্রান্তবর্ত্তী স্থান; ইহার উপরে এক বাবা কেদারনাথের মন্দির ব্যতীত আর এমন স্থায়ী ঘরবাড়ী ও মন্দিরাদি কোথাও নাই; এমন কি, অত্যন্ত তুষারপাতনিবন্ধন শীতকালে এই গৌরীকুণ্ডেও কেহ থাকিতে পারে না। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল গ্রাম আছে, শীতকালে তাহাতেই সকলে বাস করিতে সমর্থ হয়।

গৌরীকুণ্ড সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট নহে। হিমালয়ের অন্যান্য স্থান সমূহের ন্যায় কেবল মাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যই গৌরীকুণ্ড প্রসিদ্ধ নহে। অতীতের যে অপূর্ব্ব ও মহাপবিত্র স্মৃতি, ইহা আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়া দেয় এবং যে সকল বিচিত্র ঘটনাবলীর সহিত এই গৌরীকুণ্ড ও শ্রীকেদারশৈল বিজড়িত, এ স্থলে তাহাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর যাবৎ উত্তরাখণ্ডের অতিশয় নিভৃত ও দুর্গম স্থান সমূহ দর্শন করিয়া আমি যতদূর বুঝিয়াছি ও লোকমুখে শুনিয়াছি, তাহাতে এক্ষণে আমি ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, হর-পার্ব্বতীর যাবতীয় লীলাই এই কেদার রাজ্যে সুনিষ্পন্ন হইযাছিল। হর-পার্ব্বতীর লীলামাহাত্ম্যে এই অদ্ভুত কেদার রাজ্য পরিপূর্ণ এবং সেই জন্যই বুঝি ইহার এত বিচিত্রতা ও মহত্ব। সমুদয় উত্তরাখণ্ডের মধ্যে যতগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, তাহাদের সহিত তুলনায় প্রকৃত প্রস্তাবেই মনে হইবে, যেন এই কেদার রাজ্য, বাবার খাস্ মহল এবং সেই জন্যই বুঝি ইহার এত প্রভাব ও এত গৌরব।

সে যাহা হউক্, এক্ষণে এই গৌরীকুণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, যে, কিজন্য ইহার মাহাত্ম্য অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার সুরম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কমনীয় ভাব দর্শনে স্বতঃই ইহাকে সর্ব্বতোভাবে তপস্যার অনুকূল স্থান বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং গৌরী এই সুপবিত্র মহাক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই তাঁহারই নামে এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ হইযা রহিয়াছে। যে স্থানের দর্শন মাত্রেই আমাদের মন প্রাণ বিমুগ্ধ হয়, বলিতে পারি না, সেই সুমহৎ পবিত্র স্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থান সমূহের প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয়টীর প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে আরও কত অদ্ভুত ব্যাপারই আমরা দেখিতে পাই। আদ্যাশক্তি মহামায়া যেন যথার্থই বিরলে বসিয়া আপনি আপনার সেই মহা কঠোর তপস্যার জন্য এই দেবদুর্লভ স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তপস্যার যাবতীয় অনুকূল পদার্থ সমূহের দ্বারা ইহাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। গিরিরাজনন্দিনী উমা না কি এই পরম রমণীয় মহানিভৃত স্থানেই সুদুষ্কর তপোনুষ্ঠান করিয়া সদাশিব ভোলানাথের মনোহরণ করিয়াছিলেন। মা জগদম্বা যে, এই খানেই জগৎপিতা জগদীশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া দেবগণের আশা পূর্ণ করিযা বিশ্ববাসিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই

কেদার শৈলেই যে, ভূতভাবন ভোলানাথ মহা তপস্যায় মগ্ন হইয়া জগজ্জননী পার্ব্বতীর সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, কেদারের সুরম্য, মহান্ ও অপার বিভব ও দৃশ্য দেখিলে ইহাকে দ্বিতীয় কৈলাস বলিয়াই বোধ হয় এবং গিরিরাজের অমরাবতী-কল্প পুরী, পার্ব্বতীর জন্মস্থানও এই কেদার শৈলের নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, মনে হয় যেন অতি সহজেই ভগবতী গৌরীর সহিত মিলিত হইবার জন্য জগৎপিতা সদাশিব, কৈলাস হইতে জগন্মাতার জন্মভূমি রূপ মহা পবিত্র ক্ষেত্রের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়াই এই খানে আসিয়া তপোনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন * অথবা শ্বশুর বাড়ীর মমতায় আকৃষ্ট হইয়াই বুঝি বাবা, আমাদের মামার বাড়ীর এত কাছাকাছী আসিয়াই ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহার পর হরকোপানলে মদন ভস্ম হইবার পর মা জগদম্বা ভগ্নমনোরথ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং গুরুজনের আজ্ঞানুসারে দেবাদিদেব মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গী হইবার মানসে পুনরায় তিনি যে, গৌরীশিখর নামক স্থানে ঘোরতর তপস্যায় রত হইয়াছিলেন, এই গৌরীকুণ্ডই যে, সেই সুপবিত্র তপোভূম, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে গৌরীশিখরের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয়। এই গৌরীকুণ্ডই যে, সেই গৌরীশিখর, তাহার প্রমাণ স্বরূপ স্বয়ং বাবা কেদারনাথই অদূরে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং বিশ্বজননী ভগবতীর নিজ পদ্মহস্তে রোপিত ও বর্দ্ধিত এবং মায়ের হৃদিপীযূষধারায় পরিপুষ্ট অপূর্ব্ব অমর লতাকুঞ্জ ও বৃক্ষরাজি, এখনো এই মর্ত্ত্যধামকে স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে। সমুদয় উত্তরাখণ্ড মাহাত্ম্যই কেদারখণ্ডের অন্তর্গত সুতরাং সে জন্য আর প্রমাণান্তরের কোন আবশ্যক দেখি না। জগন্মাতা গৌরী, এই খানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার এত মাহাত্ম্য

* গিরিরাজ হিমালয়ের হিমনগরী ও হিমপ্রাসাদ, বদরীনারায়ণের পাহাড়ী অধিবাসীরা যে স্থানকে পার্ব্বতীর জন্মস্থান বলিয়া আমাকে দেখাইয়াছিল, এবং যাহা আমি ৬বদরীনারায়ণ হইতে তিব্বত যাইবার পথে দেখিয়াছি, তাহা শ্রীকেদার শৈলের নিকটবর্ত্তী স্থানেই অবস্থিত। শ্রীকেদার হইতে তুষাররাশি ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ হইলে তথায় পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হয় না। তিব্বত যাত্রার পথে আমি সেই অপূর্ব্ব নগরীর বিষয় যথাসাধ্য বর্ণন করিব।

এবং সেই জন্যই তাঁহার নামানুসারে এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র হিমালয় ও উত্তরাখণ্ডের মহিমা এবং তাহার রমণীয়তা ও পবিত্রতা অতুলনীয়া হইলেও প্রাকৃতিক শোভা, সম্পদ্ ও গাম্ভীর্য্যে শ্রীকেদারনাথ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। হরপার্ব্বতীর লীলাস্থল, এই অপূর্ব্ব কেদার রাজ্য, যেন যথার্থই বিধাতার বিশেষ বিধানে সৃষ্ট হইয়াছিল। বিধাতার কলা কৌশল এবং তাঁহার অনন্তরত্নভাণ্ডার, নিঃশেষিত হইয়াই যেন এই অনুপম কেদাররাজ্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহাহউক্, এই খানেই একদিন বিশ্বজননী পার্ব্বতী, অতি কঠোর অলৌকিক তপস্যায় মহাকাল রুদ্রেরও বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন, এই খানেই একদিন পার্ব্বতী সতীর সর্ব্ব-লোকবিস্ময়কর তপস্যায়, মহাযোগী ভোলানাথেরও মন টলিয়াছিল; এইখানেই একদিন চন্দ্রমৌলি সদাশিব, তপোনুষ্ঠানরতা, জগজ্জননী গৌরীর অপূর্ব্ব কান্তি দর্শনে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মচারিবেশে এই খানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, আদ্যাশক্তি মহামায়ার মনোভাব জ্ঞাত হই-বার জন্য, শিবনিন্দা করিয়া পরিশেষে তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া-ছিলেন। এই খানেই একদিন সেই অপূর্ব্ব হরগৌরীসম্মিলন হইয়াছিল। হরপার্ব্বতীর তপোভূম এবং তাঁহাদের মহামিলনক্ষেত্রের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য-কথা, বিস্তারিত লিখিবার সাধ আমার নাই। তবে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার বশ-বর্ত্তী হইয়া এবং আমার মনোবেগ সম্বরণ করিতে না পারিযাই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যথাসাধ্য তাহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলিতে পারি না, আমি সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

এই গৌরীকুণ্ড হইতে শ্রীকেদারনাথ পর্য্যন্ত ভূভাগ যে, কত অসংখ্য অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক দৃশ্যে পরিপূর্ণ, তাহা আর আমি কি বলিব। আমার সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইলেও সেই অপূর্ব্ব চিত্রের কিঞ্চিৎ মাত্রও আমার এই অকিঞ্চিৎকর লেখনী দ্বারা পরিস্ফুট হইবে না।

গৌরীকুণ্ডের ন্যায় অনুপম প্রভাব সম্পন্ন পরম রমণীয় স্থানে একরাত্রি মাত্র বাস করিয়া আমি কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না, অথচ বাবা কেদারনাথের পদপ্রান্তে পঁহুছিবার জন্য আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। সুতরাং তৎপরদিবস প্রাতঃকালে আমি গৌরীকুণ্ড হইতে ৺কেদার-নাথাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার সহিত সেই ফলাহারী, উদাসী মহা-পুরুষও ছিলেন। পথে আমরা বরাবরই অগ্র পশ্চাৎ হইয়া আসিতেছি;

কেবল যেখানে রাত্রি বাস করিতাম, সেই খানেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষরূপে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইত।

গৌরীকুণ্ড হইতে বাবা কেদারনাথের মন্দির প্রায় ছয় ক্রোশ উপরে; ক্রমাগত একটানা চড়াই, পর্ব্বতগাত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া, ওঠা নামা করিতে করিতে বেশ বুঝিলাম যে, ক্রমশঃ উপরেই উঠিতেছি। শীতের প্রাবল্য,গৌরী-কুণ্ড হইতেই বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল, তাহার পর যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম ও বাবার সুবিশাল বিশ্ব মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগি-লাম, সেই নিদারুণ শীতের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু জীবনে যাহা কখনো দেখি নাই, বা কখনো দেখিব বলিয়া ভাবিতেও পারি নাই, তাহাই চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলাম। প্রকৃতির যে জীবন্ত ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাইলাম, তাহাতে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সকল দুঃখই আমি এককালীন বিস্মৃত হইলাম।

আহা, কিবা সে ঘন, নিবিড়, বিচিত্র, চারু বিটপী এবং স্তরে স্তরে সুসজ্জিত নব কিশলয় বেষ্টিত, পুষ্পভারাবনত, বিবিধ লতাবিতানাচ্ছন্ন, উটজ শ্রেণী; কিবা সে বিকচ কুসুম রাশি সমুত্থিত, মনোজ্ঞ সুরভি এবং পুষ্পরাগানুরঞ্জিত মত্ত অলিকুলের মধুর গুঞ্জন; কিবা সে বনকুসুমামোদিত প্রভঞ্জনের মৃদু মন্দ নিঃস্বন, আর কিবা সে অসংখ্য বিচিত্রাঙ্গ বিহগকুলের কাকলী কূজিত সঙ্গীতলহরী; কিবা সে অক্লান্তমুখরা রজতোপমা শুভ্রা ঋজু কুটিলরেখাকারা, দ্রবময়ী, মনোহারী নির্ঝরিণী এবং অনর্গল তাহার হর হর আকাশবাণী; কিবা সে স্খলিত বনকুসুমাস্তরণশায়িনী বিচিত্ররূপা, বিবিধ বল্লী এবং মণিকাঞ্চনবিগলিত বিরাট্ কায়, তুহিন-রাশিমণ্ডিত অপূর্ব্ব গিরিশ্রেণী! সহস্র বদন হইলেও আমার এমন সাধ্য নাই বা আমার এমন ভাষা নাই যে, বিধাতার সেই শিল্পচাতুরী এবং প্রকৃতির সেই বিশ্ববিমোহিনী শ্রী ও মাধুরীর বিষয় কিছুমাত্র বর্ণনা করিতে পারি।

ক্রমশঃ।

কবিবর ৺ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

জীবনী ও কাব্য আলোচনা।

জীবনী ও গ্রন্থ পরিচয়।

বিহারীলাল।

জন্ম—কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺দীননাথ চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নে কবির বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। সংস্কৃতে কবি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাল্মীকির রামায়ণ, কালিদাসের কাব্যসমূহ, ভবভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণের গ্রন্থাদি কবি বিশেষ সমাদরে পাঠ করিতেন। এমন কি, ঐ সকল কাব্যের উৎকৃষ্ট অংশ গুলি তাঁহার মুখাগ্রে বর্ত্তমান ছিল। ইংরাজী পাঠেও তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল, আপন গৃহে ইংরাজী ভাষার সমধিক চর্চ্চা করিতেন। এই চর্চ্চার ফলে সেক্ষপিয়র, মিল্‌টন্, শেলি, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ইংরাজ কবির রচনাসমূহও কবি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

বাসস্থান—কলিকাতার নিমতলা নিকটস্থ জোড়াবাগান পল্লীতে কবির জীবনকাল অতিবাহিত হয়। এখনও কবির পুত্রগণ ঐ স্থানেই বাস করিতেছেন। কবির পুত্র পাঁচটি, তন্মধ্যে দুইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুজ্জ্বল রত্নবিশেষ।

চরিত্র—কবি, জীবনে বড় শুচি, সচ্চরিত্র ও পবিত্রহৃদয় বলিয়া সাধারণে বিদিত ছিলেন।

মানসম্ভ্রম—কবির কবি পদটীই সংসারে একমাত্র সম্ভ্রমের বিষয় ছিল। তৎপ্রভাবেই তিনি বাঙ্গালার বহুতর গণ্যমান্য লেখকের সম্মানিত বন্ধু ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনস্বিগণের নিকট প্রকৃত কবি বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। বঙ্গের অনেক প্রবীণ ও উদীয়মান কবির তিনিই প্রকৃতপক্ষে গুরু ছিলেন। প্রথিতনামা

কবি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের অনুগামী শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু বাঙ্গালা পাঠকের মধ্যে কয়জন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরুর অনুসন্ধান করিয়াছেন?

মৃত্যু—গত ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ১টা ৪৫ মিনিটের সময়ে ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কবি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন।

এই স্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু লিখিত সমীরণ পত্রে প্রকাশিত "কবিবর বিহারীলাল" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বিহারীলাল রচিত যে কয়েকখানি কাব্য বঙ্গীয় কাব্যভাণ্ডারে রক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বন্ধুবিয়োগ, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। বিহারীলালের বন্ধুবিয়োগ ১২৬৬ সালে রচিত হয় ও ১২৭৭ সালে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্র কাব্য বিহারী-লালের "পূর্ণচন্দ্র" "কৈলাস" "বিজয়" "রামচন্দ্র" নামে চারিটি বন্ধুর তিরোধান ও প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগ উপলক্ষে লিখিত হয়।

২। তাঁহার "সঙ্গীত শতক" পকেট এডিশনে ১৮৫ টী ক্ষুদ্র পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইয়া প্রচারিত হয়। আমার নিকটে যে গ্রন্থখানি আছে, তাহাতে টাইটেল পেজ না থাকায় প্রকাশের কাল নিরূপণ হইল না। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে ১০০টী মাত্র সঙ্গীত আছে। ৺রাজনারায়ণ বসুর বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়িনী বক্তৃতায় এক স্থানে আমরা সঙ্গীতশতক গ্রন্থের সাদরোল্লেখ দেখিতে পাই।

৩। "বঙ্গসুন্দরী"—নামক মহাকাব্যের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হই-য়াছে। ১২৭৪।৭৬ সালের "অবোধবন্ধু" নামক অধুনা লুপ্ত মাসিক পত্রে উহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত ৭৬ সালেই উহা পুন-র্ব্বার পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ সালে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অষ্টম সর্গের প্রথম গীতটি নূতন সন্নিবেশিত হয়। পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সুবিখ্যাত এডুকেশন গেজেটে বঙ্গসুন্দরীর একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রকাশ করেন।

৪। "সারদা মঙ্গল"—১২৭৭ সালে সারদা মঙ্গলের রচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ১২৮১ সালের 'আর্য্যদর্শন' পত্রে তদ-

বস্থাতেই উহা প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ সালে সারদামঙ্গল পূর্ণ কলেবর প্রাপ্ত হয়। সুকবি রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পাদিত সাধনায় বিহারীলাল শীর্ষক স্বলিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, আজ ২০ বৎসর হইল, সারদামঙ্গল আর্য্যদর্শন পত্রে এবং ১৬ বৎসর হইল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভারতী' পত্রিকায় কেবল একটি মাত্র সমালোচনা ইহাকে সাদর সম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে সারদামঙ্গল এই ষোড়শ বৎসর অনাদৃত ভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ—নিম্নে সুরেন্দ্রনাথের একটী অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া যাইতেছে। ইহা সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক জনৈক বন্ধু ও শিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত,ও তাঁহার মহাকাব্য "মহিলার" পুরোভাগে সন্নিবেশিত, সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে গৃহীত।

জন্ম—সুরেন্দ্রনাথ ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গুন বুধবারে ভূমিষ্ঠ হয়েন, পিতার নাম ৺ প্রসন্ন নাথ মজুমদার।

বংশ বিবরণ—যে বংশে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গাঁই সংজ্ঞা অনুসারে সে বংশের উপাধি কুশারি। কুশারি ব্রাহ্মণেরা বল্লাল সেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা পান নাই।

জন্মভূমি—যশোহর বিভাগের ভৈরব নদের তটবর্ত্তী জগন্নাথপুর সুরেন্দ্রনাথের জন্মভূমি।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ স্থলে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা কলিকাতাবাসী বলিয়া রাজধানীর সভ্যতায় সভ্য হইয়া যশোহর জেলার তথাকথিত অসভ্য লোকদিগকে ঘৃণা করি ও তাঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে যশুরে বাঙ্গাল আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু অদ্য আমি যশোহর প্রদেশকে ও যশোহরবাসিগণকে বহু সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যশোহর বিভাগ হইতেই আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালার দুই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি পাইয়াছি। সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত—

"যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাখ্য তীরে
জন্মভূমি"

শিক্ষা—বাটীর নিকটে বিদ্যালয় না থাকায় বাল্যে রীতিমত শিক্ষালাভ

হয নাই। গৃহশিক্ষার ফলে ৮।৯ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ পরিষ্কার অক্ষরে চিঠি পত্র লিখিতেন ও জনৈক প্রতিবেশী আত্মীয়ের নিকট পার্শী পড়িতেন। ১২৫৫ সালে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে Free church institution এ ও পরে Oriental Seminary তে পূর্ণ তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনা কালে সুরেন্দ্রনাথ Hare school এর প্রতিষ্ঠিত ছাত্র। দুই বৎসর এখানে তিনি অধ্যয়ন করেন। এই পাঁচ বৎসর মাত্র তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষা হইলেও তিনি গৃহে নিয়ত স্বাধীন চর্চ্চা দ্বারা গভীর জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতেন। এই জ্ঞান কেবল পুস্তকগত নহে, তিনি অনুসন্ধান শক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া অন্ধ বিশ্বাসকে সংস্কারস্থ করিতেন না। তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ শুনা যাইত, "শুধু গ্রন্থ দেখিয়া লাভ কি? সংসার দর্শন কর, অন্যবিধ সংস্কার উদয হইবে।" তাঁহার ইংরাজী জ্ঞান সম্বন্ধে এই টুকু বলিলেই চলিবে যে, তিনি Presidency college এর উচ্চ শ্রেণীয কতিপয় ছাত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাতনামা ভূম্যধিকারী ৺প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তাঁহার বিদ্যাবত্তা দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দার পরিগ্রহ—সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে ১২৬৫ সালে পরিণীত হযেন, কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার এই প্রথমা স্ত্রী পরলোকগতা হন। ১২৬৭ হইতে ১২৬৯ পর্য্যন্ত কোনও অসৎ বন্ধুর সহিত অযথা ঘনিষ্ঠতায় সুরেন্দ্রনাথের পূত চরিত্র কলঙ্কিত হইযাছিল। এই ৬৯ সালেই তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া জনমের মত সে মসীলেখ বিদূরিত করেন। ইহাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান।

প্রতিভা—সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা নানাদিক্‌প্রসারিণী ছিল। বিবিধ ইংরাজি দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ, ইতিবৃত্ত প্রণয়ন, নাটক রচনা ও কাব্য প্রভৃতি নানা বিষযে তিনি হস্তক্ষেপ করেন।

ধর্ম্ম জীবন—কাব্য হইতেই সুরেন্দ্রনাথকে আমরা অন্তর্জ্জগতের কবি ও অদ্বিতীয় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিযা চিনিয়াছি। তাঁহার শেষ রচনাসমূহ তাঁহার নিজ জীবনের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয। বস্তুতঃ তিনি কবি ও সাধক ছিলেন। গভীর ইংরাজি শিক্ষা তাঁহাকে অনুকরণপ্রিয়. বা দেশপ্রচলিত রীতি নীতিতে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলে নাই। তিনি পবিত্র হিন্দুর আচার ব্যবহার সকল যথাযথ মান্য করিয়া চলিতেন।

তিনি কবিসেব্য চৈতন্যের সেবা করিতেন, এবং সংসার চিন্ময় জ্ঞানে অন্তর্ব-হির্জগতে একতা রক্ষা করিতেন। দয়া, ধৈর্য্য, বিনয়, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ তাঁহার মহাচরিতে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইত।

বন্ধুলাভ।—কলিকাতায় তাঁহার অনেক বিদ্যামোদী বন্ধুলাভ হয়। তিনি সকলেরই প্রিয়সখা, জ্ঞানগুরু, ও সম্ভ্রমভাজন ছিলেন।

স্বাস্থ্য।—বহুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় তাঁহার অনেকবার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। দুইবার অপস্মার রোগে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মৃত্যু।—১২৮৫ সালের ৩রা বৈশাখ ৪০ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ ইহ-লোক পরিত্যাগ করেন। সেইদিন বাঙ্গালা কাব্যের যে দুর্দ্দিন গিয়াছে, তাহা সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীপাঠকেরা ভিন্ন অপর কেহই বুঝিতে পারিবেন না।

সুরেন্দ্রনাথের সুধাসিক্ত লেখনী প্রথমেই ঈশ্বরের মহিমাগীত গাহিয়া প্রকৃতির ঋতুপর্য্যায় বর্ণন করে; ইহার নাম 'ষড়্‌ঋতুবর্ণনা'। ইহা কোনও বন্ধু কর্ত্তৃক মৃজাপুর বিশ্বাস কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এখন আর ইহা পাওয়া যায় না।

সুরেন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক ও লৌকিক সন্দর্ভ—'বিশ্বরহস্য', 'মঙ্গল ঊষা'য় প্রকাশিত 'যশোমন্দির' (Pope's Temple of fame); বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত 'প্রতিভা', 'কবিপ্রশংসা', 'শ্মশান'; মহাভারতের 'কিরাতার্জ্জুনীয়', পোপের 'ইলাইসা এবিলার্ড', গোল্ড স্মীথের 'ট্রাভেলার', মুরের 'আইরিস্ মেলাডি'র কতকগুলি স্তবক; নলিনীতে প্রকাশিত 'কি করি অবশ আমি স্রোতে তৃণপ্রায়', 'স্বজনি লো,' 'মৃত্যুচিন্তা', 'চিন্তা' 'খদ্যোতিকা', 'ঊষা', 'পরি-শ্রম ও তাহার উপকারিতা', 'আলস্য ও তাহার অপকারিতা', 'ভারতে ব্রিটীশ শাসন পরিদর্শন,' 'শাসন প্রথা' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও কবিতা সমূহের মধ্যে কতক কতক পাওয়া যায়, আর কতকগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১২৭৪ সালের শেষভাগে সুরাপানের অশুভকারিতা সম্বন্ধে 'নবোন্নতি' নামে আখ্যায়িকা ও 'মাদক মঙ্গল' নামে রূপক কাব্যের সৃষ্টি হয়। তৎপরে কবিবর 'গ্রে'র 'এলিজি'* বঙ্গ ভাষায় পরিণত হয়। ১২৭৫ সালে 'ফুলরা'

---

*গ্রের এলিজির বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কবি একস্থলে বলিয়াছেন:—

"If ever this translation goes to the press, it shall be dedicated to Babu Nilmony Chukerbatty, with whom I read the piece. It is his thorough explanation which has enabled me to translate a poem that is as poetic and not without the touch of abstract metaphysics."

ও 'সবিতা সুদর্শন' যমজ জন্ম গ্রহণ করে। ১২৭৬এ Bravo of Venice ও Plato's Immortality of the Soul (আত্মার অবিনশ্বরতা) † এর অনুবাদ হয়। এই কয়টি অনুবাদ ও 'নবোন্নতি' আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না। যথাস্থানে 'ফুলরা' 'সবিতাসুদর্শন' ও 'মাদকমঙ্গল' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। এই তিনটিই কিছুদিন হইল, মাসিক সমীরণে প্রকাশিত হয়। ১২৭৮ সালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ মুঙ্গের যাত্রা করেন। এই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশই সুরেন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'মহিলার' জন্মস্থান। এই সালের শেষ ভাগে 'বর্ষবর্ত্তন' বিবৃত হয়। ১২৮০ সালে তিনি অসমাপ্ত রচনা 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' লিখিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার কোনও বন্ধুর অনুরোধে 'হামির' নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকখানি ১২৮৭ সালে প্রসিদ্ধ নটকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং ঐ বৎসরেই তাঁহার সহোদর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে কাশীরাম দাসের মহাভারতাদির ন্যায় সরল পদ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ চেষ্টা করেন। তজ্জন্য 'মঙ্গলাচরণ' মাত্র লিখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'সুরমা' নামে আর একটী সুরভি কুসুমও আমরা সমীরণে সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবু বলিয়া গিয়াছেন, কাব্য অপেক্ষা কবিকে জানা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু আমি যে রূপ সংক্ষেপে কবিদ্বয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাতে আপনাদিগকে কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানাইতে পারিলাম না। আমার প্রবন্ধের বিষয় অন্যবিধ, তাই যথাসাধ্য সংযত হইয়া এই প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছি।

শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত। ক্রমশঃ।

---

† কবি স্বকৃত সমস্ত রচনাপেক্ষা ইহার গৌরব করিতেন, এবং উহা নিজের নিকটে রাখিতেন। কিন্তু কিছু দিন পরে বাহির করিয়া দেখেন, কীট ইহার একবর্ণও অবশিষ্ট রাখে নাই। কবি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন, "আমার আজন্মের যত্ন সঞ্চিত আর আর লেখা সকল নষ্ট হইয়া যদি এইটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিত, এত দুঃখিত হইতাম না।"

সংবাদ ও মন্তব্য।

অতিশয় আনন্দের সহিত আমরা প্রকাশ করিতেছি, বহুবাজার ১২ নং সারপেনটাইন লেনস্থ রামকৃষ্ণ সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত অনাথ ভাণ্ডার অতিশয় সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে এবং কতিপয় সচ্চরিত্র উদ্যমশীল যুবক ইহার উন্নতিকল্পে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। আপাততঃ ৪টী নিঃসহায় বালক এই আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছে এবং ছয়টি সহায়সম্পত্তিবিহীনা হিন্দু-বিধবা এবং একটী নিঃসম্বল পরিবার এই ভাণ্ডার হইতে মাসিক অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, দেশের জন্য অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু বক্তৃতা ব্যতীত কার্য্য কিছু দেখিতেছি না। যাঁহারা দেশের গরিব দুঃখীর জন্য এক বিন্দু স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন না, যাঁহারা স্থিরচিত্তে দৃঢ় ভাবে কোন কার্য্য করিতে অক্ষম, তাঁহারা একবার এই সকল নিঃস্বার্থ যুবকের নীরব কার্য্য দেখিয়া আসিয়া শিক্ষা লাভ করুন। হৃদয়ে বল ও আশা আসিবে। কার্য্য করিবার শক্তি পাইবেন।

এই ভাণ্ডারের জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্বের জের				২২৯৮৵৭॥
জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসের আয়ঃ—				
চাউল বিক্রয় হইতে	...	...	১২৭॥৵৫	
চাঁদা আদায়	...	...	১০০৮/০	
এককালীন দান প্রাপ্তি	...	...	২৪॥৵১৫	
অন্য হিসাবে উপার্জ্জন	...	...	৬।০	
			২৫৯।৵০	
				৪৮৯।০ ৭॥

জুন জুলাই ও আগষ্ট মাসের ব্যয়ঃ—			
অনাথ ভাণ্ডারের আবশ্যকীয় খরচ	...		২৮১২॥
বিধবাগণকে সাহায্য দান	...	...	২১৶০
অনাথ আশ্রমের ব্যয়ঃ—			
খাই খরচ	...	...	৪৪৶০
বস্ত্রাদি	...	...	৪ ৷১০
ঔষধ	...	...	৩৮১৫
তৈজসাদি	...	...	২৶২॥

আলো	...	..	৩৷৶১৫
পুস্তকাদি	...	...	৭৷৷৶১৫
ধোপানাপিত	...	...	১৷৷৵০
শয্যাদি	...	...	৬৷০
পাচকের বেতন	...	...	৯৷/১২৷৷
ঘর ভাড়া	...	...	১৩৲
ঘর মেরামত	...	...	১০ ৻০
খুচরা খরচ	...	...	১৷৴১০
			১৩১ ৻২৷৷
		মজুত	৩৫৮৷৫

সত্যের সাক্ষাৎকারই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ; অন্যান্য উদ্দেশ্য উহারই আনুষঙ্গিক বা সহকারী মাত্র। চিত্তের শুদ্ধি ও একাগ্রতা যতদিন না লাভ হয়, ততদিন উপলব্ধির আশা বৃথা। সংসারের সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ, অনবরত ধর্ম্মচর্চ্চা ও সাধনভজনই উপলব্ধির প্রধান উপায়। এতদ্ব্যতীত নিষ্কাম কর্ম্মও চিত্তশুদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। দরিদ্র-কুলের দুঃখ প্রতীকারের জন্য কাশীতে যে রামকৃষ্ণসেবাশ্রম আছে, তাহার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু এই কাশীরই একাংশে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম যে তিন বৎসর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধন ভজন স্বাধ্যায় ও ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইয়া আসিতেছেন, গড়ে দুজন ব্রহ্মচারীকে প্রতিপালন করিয়া তাহাদিগকে জীবনের সর্ব্বোচ্চ পথে লইয়া যাইতেছেন, শিক্ষিত যুবকগণকে নিজেদের আদর্শ ও শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা ক্রমশঃ মানুষ করিয়া তুলি-তেছেন, তাহার সংবাদ কয়জন রাখেন? যদি আমাদের এই ত্যাগ ও উপ-লব্ধিরূপ মহান্ আদর্শদ্বয় রক্ষিত না হয়, তবে জাতীয় জীবনের অবনতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ, আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র ধর্ম্ম।

যতই উন্নত হউন, সাধনাবস্থায় একটু থাকিবার স্থান ও আহারাদির আবশ্যক হয়। এতদর্থে অর্থেরও প্রয়োজন। সমাজের উচিত, নিজ আদর্শ রক্ষার জন্য এই সকল আশ্রমের উন্নতি ও সহায়তাবিধান করা। অনেকে অবশ্য এই মহৎকার্য্যের সহায়তা করিয়া ধন্য হইতেছেন। আশা করি, অন্যান্য সহৃদয় মহোদয়গণ আশ্রমের উন্নতিকল্পে সাহায্য প্রেরণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ঠিকানা—রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, খাজাঞ্চী বাগান, লাক্সা, বেনারস সিটী।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। যথা সমৃদ্ধবেগাঃ পতঙ্গা নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি, তথা সমৃদ্ধবেগা লোকা নাশায় তবাপি বক্ত্রাণি বিশন্তি এব। ২৯।

মূলানুবাদ। যেমন পতঙ্গগণ স্বীয় বিনাশের জন্য অত্যন্তবেগে প্রদীপ্ত বহ্নিতে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপই লোকসমূহও তোমার মুখমধ্যে বিনাশের জন্য অতি বেগে প্রবেশ করিতেছে। ২৯।

ভাষ্য। তে কিমর্থং প্রবিশন্তি কথং চ ইত্যাহ। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিং পতঙ্গাঃ পক্ষিণঃ বিশন্তি নাশায় বিনাশায়, সমৃদ্ধবেগাঃ সমৃদ্ধো বেগো গতির্যেষাং তে সমৃদ্ধবেগাঃ, তথৈব নাশায় বিশন্তি, লোকাঃ প্রাণিনঃ, তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ। ২৯।

ভাষ্যানুবাদ। তাহারা কেন কি প্রকারেই বা প্রবেশ করে? তাহাই বলিতেছেন যে, যেমন প্রদীপ্ত "জ্বলন" অগ্নির মধ্যে "সমৃদ্ধবেগ" সমৃদ্ধগতি "পতঙ্গ" পক্ষিগণ "নাশ" অর্থাৎ বিনাশের জন্য প্রবেশ করে, সেইরূপ তাহারাও সমৃদ্ধবেগ হইয়া বিনাশের জন্য তোমার মুখসমূহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।২৯।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো! ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। সমন্তাৎ জ্বলদ্ভির্বদনৈর্গ্রসমানঃ (ত্বং) লোকান্ 'লেলিহ্যসে' হে বিষ্ণো তব উগ্রাভাসঃ তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য প্রতপন্তি। ৩০।

বঙ্গানুবাদ। তুমি চারিদিকে প্রজ্বলিত বদনমণ্ডলের দ্বারা লোকনিবহকে গ্রাস করিবার জন্য বারংবার লেহন করিতেছ, হে বিষ্ণো, তোমার ভয়ঙ্কর প্রভারাশি সকল জগৎকে তেজোরাশিতে আচ্ছন্ন করিয়া প্রতপ্ত করিতেছে।৩০।

ভাষ্য। লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি গ্রসমানোঽন্তঃ প্রবেশয়ন্ সমন্তাৎ সমন্ততো লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভির্দীপ্যমানৈস্তেজোভিরাপূর্য্য সংব্যাপ্য

জগৎ সমগ্রং সগ্রাগ্রেণ সমন্তমিত্যেৎ কিঞ্চ ভাসো দীপ্তয়স্তবোগ্রাঃ ক্রুরাঃ প্রতপন্তি প্রতাপং কুর্ব্বন্তি হে বিষ্ণো ব্যাপনশীল। ৩০।

ভাষ্যানুবাদ। (তুমি) দীপ্যমান বদনসমূহ দ্বারা, চতুর্দ্দিকে সমস্ত লোককে নিজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া আস্বাদন করিতেছ। হে বিষ্ণো ব্যাপনশীল, তেজের দ্বারা "সমগ্র" অগ্রের সহিত অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে "আপূর্য্য" ব্যাপ্ত করিয়া (রহিয়াছ) অপরন্তু তোমার "উগ্র" অর্থাৎ ক্রুর দীপ্তিরাশি (জগৎকে) প্রকৃষ্টরূপে তাপ দিতেছে। ৩০।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ
নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১॥

অন্বয়। কোভবান্ উগ্ররূপঃ (ইতি) মে আখ্যাহি হে দেববর! তে নমোহস্তু প্রসীদ আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুং ইচ্ছামি তব প্রবৃত্তিং হি (যতঃ) ন প্রজানামি। ৩১।

মূলানুবাদ। এই ভয়ানকরূপধারী আপনি কে? ইহা আমাকে বলুন। হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও, আদিপুরুষ আপনাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। আপনার চেষ্টা কি তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। ৩১।

ভাষ্য। যতস্ত্বমেবমুগ্রস্বভাবঃ অতঃ আখ্যাহি কথয় মে মহ্যং কো ভবান্ উগ্ররূপঃ ক্রুরাকারঃ। নমঃ অস্তু তে তুভ্যং হে দেববর দেবানাং প্রধান প্রসীদ প্রসাদং কুরু, বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুং ইচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং আদৌ ভবং। ন হি যস্মাৎ প্রজানামি তব ত্বদীয়াং প্রবৃত্তিং চেষ্টাং। ৩১।

ভাষ্যানুবাদ। যে কারণ আপনি এত উগ্রস্বভাব, সেই কারণ বলুন "মে" আমার কাছে কে আপনি "উগ্ররূপ" ক্রুরাকার, তোমাকে নমস্কার করি হে "দেববর"! দেবগণের প্রধান! প্রসন্ন হও অনুগ্রহ কর "আদ্য" সকলের আদিতে উৎপন্ন আপনাকে বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি, যে কারণ আমি আপনার "প্রবৃত্তি" চেষ্টা বুঝিতেছিনা। ৩১।

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালোঽহং ইহ লোকান্ সমাহর্ত্তুং প্রবৃত্তোঽস্মি। প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতা (তে) সর্ব্বেঽপি ত্বামৃতে ন ভবিষ্যন্তি। ৩২।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি কাল; লোক ক্ষয় করাই আমার স্বভাব। আমি অতি পুরাতন। এই লোকসকলকে সংহার করিবার জন্যই আমি উদ্যত হইয়াছি। এই প্রতিপক্ষ সেনার মধ্যে যে সকল যোদ্ধৃবর্গ অবস্থিত আছে, তাহারা সকলেই (এই যুদ্ধে) বিনষ্ট হইবে. কেবল তুমি বিনষ্ট হইবে না। ৩২।

ভাষ্য। কালোঽস্মীতি লোকক্ষয়কৃৎ লোকানাং ক্ষয়ং করোতীতি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো বৃদ্ধিং গতঃ। যদর্থং প্রবৃদ্ধস্তচ্ছৃণু লোকান্ সমাহর্ত্তুং সংহর্ত্তুমিচ্ছন্ ইহ অস্মিন্ কালে প্রবৃত্তঃ। ঋতেঽপি বিনাপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে যেভ্যস্তবাশঙ্কা যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু অনীকমনীকং প্রতি তেষু প্রত্যনীকেষু প্রতিভূতেষু অনীকেষু যোধা যোদ্ধারঃ। ৩২।

ভাষ্যানুবাদ। কালোঽস্মীতি (শ্লোকের অর্থ) আমি কাল হই "লোকক্ষয়কৃৎ" লোক সকলের ক্ষয় করিয়া থাকি যে. সেই লোকক্ষয়কৃৎ (আমি) এবং "প্রবৃদ্ধ" বৃদ্ধি পাইতেছি। কেন বৃদ্ধি পাইতেছি? তাহার কারণ লোকসকলকে সংহার করিবার জন্য, অর্থাৎ সংহার করিবার ইচ্ছায় আমি প্রবৃত্ত। "প্রত্যনীক" অর্থাৎ প্রতিপক্ষ সেনাদলের মধ্যে যে সকল ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীর যোদ্ধৃগণ আছেন এবং তুমি যাহাদের নিকটে পরাজয়ের আশঙ্কা করিতেছ, তুমি ছাড়া তাহারা কেহই থাকিবে না। ৩২।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়। তস্মাৎ ত্বং উত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব হে সব্যসাচিন্ এতে ময়ৈব নিহতাঃ ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। ৩৩।

মূলানুবাদ। সেই কারণ তুমি উঠ, কীর্ত্তি লাভ কর; শত্রুনিকরকে বধ করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, আমিই ইহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছি। হে সব্য-সাচিন্, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩।

ভাষ্য। তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতয়োঽতিরথা অজেয়া দেবৈরপ্য-র্জ্জুনেন জিতা ইতি যশোলভস্ব, কেবলং পুণ্যৈর্হি তৎ প্রাপ্যতে, জিত্বা শত্রূন্ দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধমসপত্নমকণ্টকং। ময়ৈবৈতে নিহতা নিশ্চয়েন হতাঃ প্রাণৈর্বিয়োজিতাঃ পূর্ব্বমেব। নিমিত্তমাত্রং হে সব্যসাচিন্ সব্যেন বামেনাপি হস্তেন শরাণাং ক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে অর্জ্জুনঃ। ৩৩।

ভাষ্যানুবাদ। সেই হেতু তুমি উঠ, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি অতিরথ বীরগণ দেবগণেরও অজেয় অথচ অর্জ্জুন তাহাদিগকে জয় করিয়াছেন, এই প্রকার কীর্ত্তি তুমি লাভ কর। এই কীর্ত্তি বহু পুণ্যের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমিই ইহাদিগকে নিহত করিয়াছি অর্থাৎ নিশ্চয়ই মারিয়া রাখিয়াছি—প্রাণবিহীন করিয়া রাখিয়াছি; তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। হে সব্যসাচিন্ সব্য অর্থাৎ বাম হস্তের দ্বারাও যে শরক্ষেপ করিতে পারে, তাহাকে সব্যসাচী কহে। অর্জ্জুনও তাহা করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার সম্বোধন হইয়াছে, সব্যসাচিন্। ৩৩।

দ্রোণং চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাঽসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

অন্বয়। ত্বং ময়া হতান্ দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঽন্যান্ অপি যোধবীরান্ জহি, মা ব্যথিষ্ঠা, যুধ্যস্ব রণে সপত্নান্ জেতাঽসি। ৩৪।

মূলানুবাদ। দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ কর্ণ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাগণকে

আমিই মারিয়া রাখিযাছি, তুমি তাহাদিগকেই নিহত কর; তুমি ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ কর, এ যুদ্ধে তুমি শত্রুগণকে (নিশ্চয়ই) জয় করিবে। ৩৪।

ভাষ্য। দ্রোণঞ্চেতি, দ্রোণং চ যেষু যেষু যোধেষু অর্জ্জুনস্যাশঙ্কা তাংস্তাং ব্যাপদিশতি ভগবান্ ময়া হতানিতি। তত্র দ্রোণভীষ্ময়োস্তাবৎ প্রসিদ্ধমাশঙ্কাকারণত্বং দ্রোণোধনুর্ব্বেদাচার্য্যঃ দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন আত্মনশ্চ বিশেষতো গুরুর্গরিষ্ঠো। ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ পরশুরামেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমগমন্ন চ পরাজিতঃ। তথা জয়দ্রথঃ—যস্য পিতা তপশ্চরতি মম পুত্রস্য শিরো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি যঃ তস্যাপি শিরঃ পতিষ্যতি ইতি। কর্ণোঽপি বাসবদত্তয়া শক্ত্যা ত্বমোঘয়া সংপন্নঃ সূর্য্যপুত্রঃ কানীনঃ অতস্তন্নাম্নৈব নির্দ্দেশঃ। ময়াহতাংস্ত্বং জহি নিমিত্তমাত্রেণ, মা ব্যথিষ্ঠাস্তেভ্যো ভয়ং মা কার্ষীর্যুদ্ধস্য জেতাসি দুর্য্যোধন প্রভৃতীন্ রণে যুদ্ধে সপত্নান্ শত্রূন্। ৩৪।

ভাষ্যানুবাদ। দ্রোণঞ্চ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। দ্রোণ—যে যে বীরের উপর অর্জ্জুনের আশঙ্কা তাহাদেরই নাম নির্দ্দেশ করিয়া (ভগবান্) বলিতেছেন যে, তাহাদিগকে আমি নিহত করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে দ্রোণ এবং ভীষ্ম যে আশঙ্কার কারণ তাহা প্রসিদ্ধ ছিল—কারণ দ্রোণ ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য, দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন এবং বিশেষতঃ সাক্ষাৎ গুরু ছিলেন। ভীষ্ম—বিশেষতঃ পূজ্য তাঁহার মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। অনেক দিব্য অস্ত্র তাঁহার অধিকৃত ছিল, তিনি পরশুরামের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়াছিলেন অথচ পরাজিত হযেন নাই। সেইরূপ জয়দ্রথও ভয়ের কারণ (ছিলেন কারণ) জয়দ্রথের পিতা এইরূপ বরের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন যে, যে আমার পুত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলিবে তাঁহার মস্তক তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইবে। কর্ণও ইন্দ্রপ্রদত্ত অমোঘ শক্তি ধারণ করিতেন এবং তিনি সূর্য্যের পুত্র ছিলেন। কুন্তীর যখন বিবাহ হয় নাই, সেই সময় কর্ণ তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই জন্য (ভগবান্) তাঁহার নাম ধরিয়াই নির্দ্দেশ করিলেন। এই সকল দ্রোণ প্রভৃতিকে আমিই নিহত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি নিমিত্ত মাত্রে ইহাদিগকে বধ কর। তুমি ব্যথিত হইও না। এই যুদ্ধে তুমি দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিতে পারিবে, সুতরাং তাহাদিগের নিকট ভীত হইও না। ৩৪।

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়। কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ স কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ সন্ নমস্কৃত্বা তথা ভীতভীতঃ স ভূয় এব প্রণম্য চ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং আহ।৩৫।

মূলানুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্‌কে নমস্কার করিলেন। তিনি আবার অত্যন্ত ভীত হইয়া—আবার প্রণাম করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ৩৫।

ভাষ্য। এতচ্ছ্রুত্বেতি। এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য পূর্ব্বোক্তং কৃতাঞ্জলিঃ সন্ বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী নমস্কৃত্বা ভূয়ঃ পুনরেব আহ উক্তবান্ কৃষ্ণং সগদ্‌গদঃ ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাৎ অশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ ততশ্চ বচোঽপাটবং মন্দশব্দত্বং যং স গদ্‌গদঃ তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সগদ্‌গদং বচনমাহেতি বচনক্রিয়াবিশেষণমেতৎ। ভীতভীতঃ পুনঃপুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্ প্রণম্য প্রহ্বী ভূত্বা আহ ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। অত্রাবসরে সঞ্জয়বচনং সাভিপ্রায়ং কথং? দ্রোণাদিষু অর্জ্জুনেন নিহতেষু অজেয়েষু চতুর্ষু নিরাশ্রয়ো দুর্য্যোধনো নিহত এবেতি মত্বা ধৃতরাষ্ট্রঃ জয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতি ততঃ শান্তিরুভয়েষাং ভবিষ্যতি ইতি। তদপি নাশ্রৌষীৎ ধৃতরাষ্ট্রো ভাবিতব্যবশাৎ। ৩৫।

ভাষানুবাদ। এতচ্ছ্রুত্বা ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। এই পূর্ব্বোক্ত কেশবের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলি ও কম্পমান হইয়া "কিরীটী" অর্জ্জুন নমস্কার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা ভয়ে গদ্গদ হইয়া পড়িয়াছিল (গদ্গদ শব্দের অর্থ কি?) যে ভয়ব্যাকুল তাহার দুঃখাভিভাব— এবং যে স্নেহময়, তাহার হর্ষের আবেগে—নেত্র অশ্রুসিক্ত হয় ও শ্লেষ্মার দ্বারা কণ্ঠাবরোধ হয় সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ের সামর্থ্য কমিয়া যায় এইরূপ অবস্থায় যে কণ্ঠ হইতে (বিকৃত ভাবে) মন্দ শব্দ বহির্গত হয়,

তাহাকেই গদ্‌গদ কহা যায়। অর্জ্জুনের যে বাক্য সে সময় উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা গদ্‌গদের সহিতই হইয়াছিল বলিয়া উহারই বিশেষণ হইতেছে "সগদ্‌গদং" তিনি ভীত ভীত অর্থাৎ অত্যন্তভয়াবিষ্টচেতা হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে বলিলেন (এই অন্বয়টি একটু দূরান্বয় হইল, এই সময়ে সঞ্জয়ের বচনে একটা অভিপ্রায় আছে, কিরূপ? "দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ ও জয়দ্রথ এই চারিজন মহাবীরের বিনাশ হইলে দুর্য্যোধন নিরাশ্রয় হইবে এবং (নিশ্চয়ই) বিনষ্ট হইবে" এই প্রকার বিবেচনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র জয় সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া হয়ত সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন এবং তাহা হইলে উভয় পক্ষেই শান্তি স্থাপিত হইবে এই প্রকার মনে করিয়াই সঞ্জয় এই সকল কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু ভবিতব্য বশে ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়ের এই কথায়ও কর্ণপাত করেন নাই। ৩৫।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

অন্বয়। হে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা যৎ জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ তৎ স্থানে (যুক্তমেব) (তথা) রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি, সর্ব্বে সিদ্ধ-সঙ্ঘাশ্চ নমস্যন্তি (তদপি যুক্তমেব)। ৩৬।

মূলানুবাদ। হে হৃষীকেশ তোমার গুণ কীর্ত্তনে যে জগৎ আনন্দ অনুভব করে ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, তাহা সমুচিত এবং রাক্ষসগণ ভীত হইয়া যে চারি দিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, তাহাও সমুচিত। ৩৬।

ভাষ্য। স্থানে ইতি। "স্থানে যুক্তং কিং তৎ? তব প্রকীর্ত্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেন শ্রুতেন, হে হৃষীকেশ! যৎ জগৎ প্রহৃষ্যতি প্রহর্ষমুপৈতি তৎস্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। অথবা বিষয়বিশেষণং স্থানে ইতি যুক্তো হর্ষাদিবিষয়ো ভগবান্। যত ঈশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতসুহৃচ্চেতি। তথা অনুরজ্যতে অনুরাগঞ্চ উপৈতি। তচ্চ বিষয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। কিং চ রক্ষাংসি ভীতানি

ভয়াবিষ্টানি দিশোদ্রবন্তি গচ্ছন্তি তচ্চ স্থানে বিষয়ে। সর্ব্বে নমস্কুর্ব্বন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ সিদ্ধানাং সমুদয়াঃ কপিলাদীনাং তচ্চ স্থানে।৩৬।

ভাষ্যানুবাদ। স্থানে ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ "স্থানে" অর্থাৎ উচিত, কি উচিত তাহাই বলিতেছেন, তোমার প্রকীর্ত্তিতে অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া যে জগৎ প্রহর্ষ লাভ করে ও তাহা স্থানে অর্থাৎ উচিতই বটে—তথা স্থানে এই শব্দটী প্রহর্ষের বিশেষণ নয় কিন্তু প্রহর্ষের বিষয় যে ভগবান্ তাহারই বিশেষণ। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ লোক সকলের হর্ষের উপযুক্ত বিষয় এবং সেইসকল জগৎ যে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয় তাহাও উচিত, অথবা ভগবান্ই লোকানুরাগের উপযুক্ত বিষয়, এই প্রকার অর্থও হইতে পারে। আরও রাক্ষস গণ যে ভীত হইয়া অর্থাৎ ভয়াবিষ্ট হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে, তাহাও উচিত বটে এবং কপিলাদি সিদ্ধগণের সংঘ অর্থাৎ সমুদায়ও যে আপনাকে নমস্কার করেন তাহাও উচিতই বটে। ৩৬।

কস্মাচ্চতে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়। হে মহাত্মন্ ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে (তুভ্যং) তে (সিদ্ধসঙ্ঘাঃ) কস্মাৎ ন নমেরন্ হে অনন্ত হে দেবেশ হে জগন্নিবাস ত্বং অক্ষরং ত্বমেব সৎ অসৎ যৎ তৎপরং সদসদতীতং তৎ অপি ত্বমেব। ৩৭।

মূলানুবাদ। হে মহাত্মন্ আপনি চতুরানন ব্রহ্মা হইতেও গরীয়ান্, কারণ আপনিই আদি কর্ত্তা। আপনাকে সেই কপিলাদি সিদ্ধগণ কেন নমস্কার না করিবেন? হে অনন্ত হে দেবেশ হে জগদাধার আপনি অবিনাশী, আপনি কার্য্য আপনি কারণ। এবং কার্য্য ও কারণ ব্যতিরিক্ত যে বস্তু আছে, আপনিই সেই বস্তু। ৩৭।

ভাষ্য। কস্মাচ্চ হেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ নমস্কুর্য্যুঃ হে মহাত্মন্ গরীয়সে গুরুতরায় যতো ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্যাপি আদিকর্ত্তা কারণং অতস্তস্মাদাদিঃ কর্ত্তে কথমেতে ন নমস্কুর্য্যুরতো হর্ষাদীনাং নমস্কারস্য চ স্থানং ত্বমর্হো বিষয় ইত্যর্থঃ। হে অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং তৎপরং যদ্ বেদান্তেষু

জ্ঞান ও ভক্তির একতা।

(অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।)

আবহমান কাল হইতে জ্ঞানকে অধিকার করিয়া ভক্তজগতে বাদ বিস-ম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ উহার নামে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের অভিনয় দেখাইয়া থাকেন; কেহ বা উহাকে কর্কশ ও নিরস ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিভূষিত করেন। আবার অনেকে উহার সংস্রবমাত্রও উপেক্ষা করিয়া রাধাকৃষ্ণ ও সীতারামাদি যুগল নামের শরণ লয়েন এবং উহা ভগবৎ প্রাপ্তির প্রবলতম প্রতিবন্ধক এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন।

প্রস্তাবিত সমস্ত দলই যে ভ্রান্তি-সাগরে মগ্ন রহিয়াছেন, ইহা তাঁহা-দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাঁহারা এমন ভাবে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন যে, অন্য চর্চ্চা শ্রবণই তাঁহাদের মতে নর-কের পথপ্রদর্শক—নাস্তিকতা বা পাষণ্ডতার জ্ঞাপক। এই শিক্ষালাভে তাঁহাদিগকে সবিশেষ প্রযাস পাইতেও হয় না। সুচতুর গুরুদেবই দীক্ষাকালে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন যে, যাহারা স্বকীয় সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করা দূরে থাকুক্, দর্শন করাও পাপ! শিষ্যগণও গুরুপ্রদর্শিত মার্গের রেখামাত্রও অতিক্রম করেন না।

তথাপিও সত্যের প্রকাশ করা প্রভূত ফলদায়ক না হইলেও সর্ব্বাংশে নিষ্ফল নহে।

অধিকাংশ সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিই বিদিত আছেন যে, 'সাপরাণুরক্তিরী-শ্বরে' সূত্রটিতে ভক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে অনুরাগ পদার্থ কি ইহাই বিবেচ্য। উহা ইচ্ছাবিশেষ বা জ্ঞানবিশেষ? বিচার্য্য বিষয়টী অতি সূক্ষ্ম ও দার্শনিকগণের মার্জ্জিত বুদ্ধিগম্য।

জীবের ইচ্ছা অনিত্য ইহা সর্ব্ব তন্ত্র সিদ্ধান্ত, সুতরাং ইচ্ছা বিশেষকে অনুরাগ বলিলে উহাও অনিত্য সিদ্ধ হইবে। অনুরাগ অনিত্য প্রমা-ণিত হইলে অপৌরুষেয়বাণী উপনিষদের উপর বড় আঘাত লাগে; এবং ব্যাস-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মবোধ পর্য্যন্ত যাবতীয় বেদান্ত

গ্রন্থের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। 'রসোবৈসঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। এই উপনিষদ বাণী সুস্পষ্ট বলিতেছে যে, ব্রহ্মাত্মা রসস্বরূপ। এই স্থলে রসের অর্থ পার্থিব মাধুর্য্যাদি রস নহে। ইহা ভক্তগণের জীবনসর্ব্বস্ব স্বর্গীয় নিত্য অনুরাগ বিশেষ। উহাই প্রেমিকবৃন্দের হৃদয়াকাশোদিত প্রেমশশধরীশ্বর। উহাকে অনিত্য বলিলে ব্রহ্মাত্মাও অনিত্য হইয়া পড়ে, কেননা তিনি অনুরাগস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

'সএষ অনির্ব্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ', এই নারদ সূত্রাভিহিত প্রেমের ব্রহ্মাভিন্নতাও উক্তরীতিতে অসঙ্গত হইয়া উঠে এবং ব্রহ্ম পদার্থকে অনিত্য বলিলে তর্কও সর্ব্বথা অপ্রতিষ্ঠ থাকে—দাঁড়াইবার ভিত্তি পায় না। অতএব বুঝা গেল যে ইচ্ছাবিশেষকে অনুরাগ বলা উপনিষদ ও নারদসূত্র বিরুদ্ধ এবং ভারতের যাবতীয় ঋষিদিগের অনভিমত।

পক্ষান্তরে নিত্যজ্ঞান বিশেষকে প্রেম আখ্যা দিলে উক্ত আপত্তির অবসর হয় না। যেহেতু বেদান্ত মতে জ্ঞান নিত্য ও জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। যুক্তিও জ্ঞানের নিত্যত্ব উপদেশ করে—কেন না জীবজগতে এরূপ অবস্থা দৃষ্টি গোচর হয় না যাহাতে কোন না কোন প্রকারের জ্ঞান নাই। জাগ্রতে জ্ঞান, স্বপ্নে জ্ঞান ও সুষুপ্তিতেও ঐ জ্ঞানেরই রাজত্ব। সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকার প্রমাণ—জাগ্রতে তদীয় সুখস্মৃতি। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ঐ সুখ সুষুপ্তি অবস্থার নহে কিন্তু জাগ্রতের অন্তিমে ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা জনিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ সুখের নাশক কে? নিদ্রার প্রারম্ভ অর্থাৎ জাগ্রতের অন্তিম হইতে আরম্ভ করিয়া সুষুপ্তির শেষ পর্য্যন্ত সুখ ভিন্ন অন্য কিছুরই স্মৃতি দৃষ্ট হয় না। এবং বিরোধী গুণ উৎপন্ন না হইলে কখন পূর্ব্ব গুণের নাশও হইতে পারেনা। সুতরাং উক্ত সুখানুভূতি তিলমাত্র বিচ্ছিন্ন না হইয়া ঐকালে ধারাবাহিকভাবে বর্ত্তমান থাকে ইহা মানিতে হইবে। উহার স্থিতিসীমা—সুষুপ্তি ভঙ্গ পর্য্যন্ত।

আপাতদর্শীরা জ্ঞানদেবের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মহা বিভ্রাটে পড়েন এবং নিত্যশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মাকে মরণশীল ও অশুদ্ধ বলিয়া জানেন। কিন্তু ধীর স্থিরভাবে তত্ত্বানুসন্ধানে ডুবিয়া যাও দেখিবে জ্ঞান বিশেষকে প্রেমাভিধান দেওয়া কল্পনা বিশেষ অথবা জ্ঞানপক্ষপাতীদিগের জল্পনা মাত্র নহে। ঋষিদিগের ন্যায় তুমিও বুঝিবে যে

জ্ঞান বিশেষই প্রেম ইহা ধ্রুব সত্য। প্রেমই জ্ঞান এবং জ্ঞানই প্রেম কেবল সংজ্ঞা মাত্র ভিন্ন। উভয়েরই বাচ্য এক চিণ্ময় ব্রহ্মাত্মা। এই চিণ্ময় দেবই ভক্ত হৃদয়ে প্রেমরূপে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে মাতাইয়া তুলেন। ইনিই ব্রজ-গোপীদিগের মানসাকাশে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে লোকাতীত আলোকে আলোকিত করিয়াছিলেন। যথার্থ রসজ্ঞ নরনারীগণ ইহাকেই প্রণয়রূপে জানিয়া কখনও ভাবেরউচ্ছ্বাসে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আনন্দে নাচিতে থাকেন আবার কখনও বা প্রিয়তমের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া বাহ্য চেতনাশূন্য হইয়া পড়েন।

বস্তুতঃ জ্ঞানকেই কবিপ্রবীণ ও ভক্তগণ ভক্তি ও প্রেমাদি নামে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ভক্তকেশরী রামানুজ 'বেদনং ভক্তি' ইত্যাদি বচন দ্বারা ভক্তি পদের অর্থ, জ্ঞানই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তি-সুধাসিন্ধু ভাগবতেও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই অপূর্ব্ব জ্ঞানই উত্তম ভক্তি শব্দের অর্থরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যথা—"একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণং"! হে পাঠক অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, পরমবৈষ্ণব ভাগবত বলিতেছেন, সর্ব্বত্র ভগবৎ দর্শনই একান্ত ভক্তি। অতএব জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য আর কোথায় রহিল? অদূরদর্শীদিগের জ্ঞান ও ভক্তিসংক্রান্ত বিবাদ চিণ্ময়ী সুরতটিনী ও ভক্তি কালিন্দীর শুভ-সঙ্গমে চিরদিনের মত মগ্ন হইল। এই পুণ্যময় প্রয়াগে যিনি অবগাহন করিতে পারেন তিনিই জ্ঞানী তিনিই ভক্ত, তিনিই গীতাভিহিত শ্রেষ্ঠ ভাগবত পদের অভিধেয় তাঁহারাই ভবিষ্যৎ বিবেকানন্দময় ও নিরাময় ব্রহ্মকিরণে জ্যোতিষ্মান।

গীতার ৬ষ্ঠ অঃ ৩১ শ্লোকের টীকাতে মধুসূদন সরস্বতীও ভক্তি এবং জ্ঞানের একতা প্রতিপাদন করিয়াছেন যথা যে ভজতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্ত বাক্যজেন সাক্ষাৎকারেণাপরোক্ষী করোতি ইতি—

প্রমাণিত হইল যে ভক্তির অর্থ জ্ঞানবিশেষ। ঐ জ্ঞানবিশেষ কি পদার্থ তাহাই অগ্রে নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। অনুরাগ মাত্রেরই কারণ প্রীতিভাজনের সৌন্দর্য্যানুভূতি। যিনি যত অধিক পরিমাণে সৌন্দর্য্যরসের আস্বাদন বা অনুভব করিতে পারেন তিনি তত অধিক মাত্রায় প্রীতি তরঙ্গিণীর পূতনীরে মগ্ন হইয়া ধন্য হন, এবং নিত্যানুরাগময়ী জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহার ভাগ্যে বিধাতা

উহা শিখেন নাই, তিনি বিদ্যা-জলধী মন্থনকরিলেও প্রীতিরত্ন লাভে বঞ্চিত থাকেন। তিনি বাহিরে জন সমাজের নেতা হইলেও তাহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন না। লোকনায়কত্বযজ্ঞের ঋত্বিকপদে একমাত্র মহাপ্রেমীই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, কারণ অলোক-সামান্য ত্যাগব্রতের উদ্‌যাপনে স্বার্থগন্ধহীন সদাশিবোপম প্রেমিক-রাজই কেবলমাত্র অধিকারী ও সমর্থ!

ভক্তি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহাদি অনুরাগেরই অন্তর্ভূত; সুতরাং অনু-রাগ পদার্থ নির্ণীত হইলেই উহাদেরও নিরূপণ হইয়া যাইবে। 'ইহা আমার অনুকূল' এই জ্ঞানই অনুরাগ বা প্রীতির মূলে বর্ত্তমান এবং ইহার বাহিক প্রকাশই উক্ত ভক্তি আদি—কোথাও ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। ভক্তি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহাদি সকলই এই অনুরাগ মহোদধির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। ভক্তি বা প্রেম উৎপত্তির পূর্ব্বে ভক্তিভাজন ও প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, অনন্তর 'ইনি আমার অনুকূল' এবম্বিধ জ্ঞান জন্মে ক্রমে উহা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করে এবং ঘনীভূত হইতে থাকে। তখনই মানব অন্যবস্তু ভুলিতে থাকে। অবিরত ঐ ছবি তাহার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে, অবিশ্রান্ত ঐ সৌন্দর্য্যময়ীধারা চিত্তে প্রবাহিত থাকিয়া পূর্ণশশীর বিকাশে উহারই বিকাশ, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যে উহারই গম্ভীরতা নগরাজের বিস্তারে উহারই বিস্তার এবং যাবতীয় পদার্থে সেই মনো-মোহন রূপের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়া তাহাকে বিচিত্র রসানুভব করাইতে থাকে। এমন কি নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে প্রয়াস পাইলেও সেই কমনীয় আকারই যেন বলপূর্ব্বক ধ্যেয়পদ অধিকার করে। বস্তুতঃ এই অনি-র্ব্বচনীয় লোকোত্তর অবস্থার বর্ণন লেখনী দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা কেবল ভক্তকেশরীরই অনুভবনীয়। ভক্তিভাজনের বেদন বা জ্ঞান হইতে ভক্তিকে ভিন্ন করিতে পারা যায় না, সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে জ্ঞানই ভক্তি। সুবর্ণই মাথার ফুল, সুবর্ণই কণ্ঠের মালা; ইহাদের আকৃতিগত ভিন্নতা থাকিলেও বস্তুগত কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তদ্রূপ একই চিদ্বস্তু অবস্থাভেদে জ্ঞান ও ভক্তি রূপ ধারণ করে এবং এই উভয়রূপই মনকে মাতাইয়া জীবকে শিব করিয়া তুলে।

যিনি ভক্তি জলধির অন্তস্তলে কখনও ডুবিয়াছেন, তিনি কখনও ভক্তিকে ইচ্ছা বিশেষ বলিবেন না। ইচ্ছা বিশেষ আসক্তি পদের বাচ্য

হইতে পারে; ইচ্ছা বিশেষকে দয়া বা করুণা বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু বিশ্বপাবন ভক্তি ও প্রেমাদি স্বর্গীয় পদার্থনিচয়কে ইচ্ছা বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোন প্রকারেই বিবেকানুমোদিত হইতে পারে না। কোন ক্রমেই উহা প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য নহে।

ভক্তি ও প্রেম যেরূপ স্বভাবতঃ অন্য বস্তুতে হয় সেরূপ আপনাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই আত্ম-প্রেমই নিখিল প্রেমের অগ্রণী। এই আত্ম-প্রেমই জগতকে আত্মস্বরূপ অনুভব করাইয়া নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া দেয়। কারণ উহা চিণ্ময় আত্মাকে অধিকার করিয়াই আবির্ভূত হয়। পক্ষান্তরে দেহাত্মপ্রেম আবার মানুষকে পশুবৎ করিয়া অনর্থ সমুদায়কে আমন্ত্রণ করে এবং নরকের কপাট খুলিয়া দেয়। চিণ্ময় আত্মপ্রেমের পরাকাষ্ঠা হইলেই অনাত্ম বস্তু অদর্শনকূপে মগ্ন হয়, সকল ভেদজঞ্জাল ঘুচিয়া যায়, শোকমোহাদি কোথায় বিলীন হইয়া পড়ে, এবং অনঘ আত্মজ্যোতি সর্ব্বত্রই প্রতিফলিত হইতে থাকে—কেননা আত্মাই ব্রহ্ম—আত্মই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী মহেশ্বর! যাঁহারা এই আত্মদেবকে সাড়ে তিনহাত বামনআদি সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন তাঁহারাই মেঘের অন্তরালে ঈশ্বর অন্বেষণ করেন। তাঁহারাই উন্নতশিখর গিরিরাজের পর পারে যাইয়া প্রভুর দর্শন প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হন।

আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি—ইহাই প্রেমের অন্তিম ভূমিকা। কেননা প্রেমাস্পদকে আত্ম-আখ্যায় আখ্যাত করাই প্রেম বিজ্ঞানে প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপে কথিত হইয়াছে। লৌকিক ভালবাসাতেও প্রিয়তমের সহিত আত্মার অভেদনির্দ্দেশই হইয়া থাকে। প্রেমের স্বভাব এই যে, ধীরে ধীরে ভেদ অন্তরিত করে ও অজ্ঞাতসারে প্রিয়তমের প্রকৃতি প্রেমিকে সঞ্চারিত করে। এজন্যই ঈশ্বর-প্রেমিক প্রেমের সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত আপনার অভেদানুভব করিয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িক ভাবান্ধ মূঢ়তম লোকেরাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-রূপ প্রেমপীযুষময়ী বাণীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে এবং ইহার উপর হৃদয় বিদারক নাস্তিকের অভিযোগ আরোপিত করে! তাহারা বুঝে না যে আত্মপ্রেমে বিভোর হইয়া আপন জীবত্বভাব সমূল না ভুলিলে কখন কাহারও মুখারবিন্দ হইতে জগতপাবন অহংব্রহ্মাস্মিপদ যথার্থ নির্ঘোষিত হয় না! সর্ব্ববেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাস্মি বাক্য যদি নাস্তিকতা জ্ঞাপক হইয়া অবজ্ঞার বিষয়

হয় তবে জগতে আস্তিকত্তা ও সম্মানের জিনিস যে কি আছে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যে জীব ও ব্রহ্মের একতাজ্ঞান ঋষি ও মুনিগণের হৃদয়ের ধন যাহা 'অপৌরুষেয় বাণী' বলিয়া তাঁহারা অসকৃৎ তারস্বরে উপদেশ করিতেছেন এবং যাহা লাভ করিবার জন্য যাবতীয় সাধন সকলের আবির্ভাব তাহাকে ঐরূপ অনাদর ও অবহেলা করা সামান্য অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। হে অজ্ঞান! জগতে তোমার দ্বারা না হয় এমন অকার্য্য কিছুই নাই তুমি এক নিমেষের মধ্যেই সত্যকে অসত্য করিয়া ফেল! তুমি জগৎপূজ্য মহাপুরুষকে পামরদিগের দলে গণ্য করাইতে কুণ্ঠিত হও না এবং তোমারই প্রভাবে শত শত অপসিদ্ধান্তসমূহ আবহমান কাল হইতে মানবকুলকে উন্নতির দিকে যাইতে দিতেছে না।

নিদিধ্যাসনের পরাকাষ্ঠা সংপ্রজ্ঞাতসমাধি ও অহৈতুকীভক্তি একই বস্তু। তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেহর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে। পঞ্চদশী॥ শ্রবণ ও মনন দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্মাত্মাতে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে পর তাহার যে একতানতা অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা তাহাকেই নিদিধ্যাসন বলে।

ভাগবত—

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।

ভগবানের উক্তি—

আমার গুণ শ্রবণ করিবা মাত্র আমার সর্ব্ব হৃদয়স্থ নির্গুণব্রহ্মস্বরূপে সমুদ্রে গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনোবৃত্তির একাকার হওয়া ইহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ॥

তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ, সেই ধ্যানই যখন আপনার স্বরূপ বিলোপ করিয়া ধ্যেয়রূপে পরিণত হয় তখন তাহাকে সমাধি বলা হয়।

নির্গুণ ভক্তিরই নামান্তর অহৈতুকী ভক্তি ইহা পরমহংসগণেরই উপসেব্য যেহেতু এই ভক্তি কেবল নির্গুণ স্বরূপেই হইয়া থাকে।

ভাগবতে যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থ ভূত গুণোহরিঃ।

যাঁহাদের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মারাম মুণিগণও পরব্রহ্মে অহৈতুকীভক্তি করিয়া থাকেন কেননা শ্রীহরির মহিমাই এরূপ

ব্রহ্মাকার বৃত্তিই জ্ঞান এবং ব্রহ্মাকার বৃত্তিই অহৈতুকী ভক্তি। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু এবং উহাদের উভয়েরই লক্ষ্য এক চিণ্ময়আত্মা। এখন উহাদের একত্ব প্রতিপাদক একটি শ্লোক ভাগবৎ হইতে পাঠককে উপহার দিয়া আমরা অদ্যকার প্রবন্ধের উপসংহার করি।

ভাগবত—

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তি লক্ষণঃ
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থোভগবচ্ছব্দ লক্ষণঃ।

আমাতে জ্ঞানযোগ ও নির্গুণ ভক্তিযোগ উভয়েরই প্রয়োজন এক পরব্রহ্ম।

যিনি এই ব্রহ্ম সুধাসিন্ধুর অভ্যন্তরে মগ্ন হইতে চাহেন, তিনি প্রথমে জ্ঞান ও ভক্তির একতা হৃদয়ঙ্গম করুন; তিনি পশুবুদ্ধি অর্থাৎ ভেদ-ভাব বিবেকসলিলে ধুইয়া ফেলুন এবং উপনিষদের শ্রবণ ও মননে নিবিষ্ট হউন অবশ্যই শুভভবিষ্যৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে। অবশ্যই তিনি বিবেকানন্দনীরে স্নাত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ পূর্ব্বক মানব জন্মের সফলতা সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মহামায়ার এইরূপ স্বহস্তে রচিত, অতি বিচিত্র, মনোহর, সুবিস্তৃত, উদ্যান ও তপোবন এবং জগজ্জননী ভবানীর পুত্র নির্ব্বিশেষ, স্নেহ, যত্নে, প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট, বিবিধ সুশোভন বৃক্ষ ও লতাকুঞ্জের অচিন্ত্য প্রভাব ও সৌন্দর্য্যদর্শনে আমি মহাবিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম এবং আমার হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া যেন কি এক অপূর্ব্ব মধুর রসের উৎস প্রবাহিত হইল! আর আমি কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে, এমন কত ফল-পুষ্প-ভারাবনত, বিবিধ চারুদর্শন তরুলতা তো এই হিমালয়েই বিস্তর দেখিয়াছি, কৈ, তাহাদের সৌন্দর্য্যভাব তো আমাকে এরূপ অভিভূত করিতে পারে নাই? কৈ, সামান্য উদ্ভিদ দেখিয়া তো আমার হৃদয়ে কখনো এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই? কৈ, সামান্য তৃণ, তরু, লতা ও গুল্মের পাদমূলে বিস্ময় ও ভক্তি গদ্গদ-চিত্তে আমার তো এমন লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় নাই? তাহারা তো আমার মন প্রাণ এরূপ করিয়া কাড়িয়া লইতে পারে নাই? কৈ, ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও তো আমি এরূপ বিচিত্র স্বভাব-সম্পন্ন, অসামান্য-প্রভাবশালী, পরমানন্দদায়ক, মহাগৌরবাস্পদ, পবিত্র কাননও দেখি নাই? আমি যে ত্রিলোকপূজ্য, মহা পবিত্র কাননের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বাবা কেদারনাথের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম তাহা যে, অসাধারণ কারণ বশতঃ এইরূপ প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আর তখন আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। এই বিশ্বরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী, গিরিরাজ নন্দিনী, গৌরীর অলৌকিক শক্তি ও তপঃপ্রভাবেই যে, ইহার এত মাহাত্ম্য ও গৌরব, তাহা অতি সহজেই আমি তখন জানিতে পারিলাম; ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়েরও অগ্রজন্মা পাদপ সমূহ, জগদম্বার অপার স্নেহ রসাভিসিঞ্চিত হইয়া যেন অমরত্ব লাভ করিয়াছে এবং নতশিরে আজিও মায়ের শ্রীচরণে অজস্র পুষ্প বরিষণ করিয়া তাঁহার পূজায় রত রহিয়াছে, আর জগদম্বার অসামান্য তপভূমের অলৌকিকত্ব ও মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

আজিও সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী মহামায়ার সেই বিচিত্র অমানুষিক লীলার অতি পবিত্র স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরূক করিতেছে এবং সুদূর অতীতের অতি পবিত্র ঘটনাসমূহ যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া মায়ের উপযুক্ত ভক্তসন্তানেরই কার্য্য করিতেছে।

সে যাহা হউক, তাহার পর আমি এইরূপ কত মহাভাবতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে আকুলিত হইয়া গৌরীকুণ্ড হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া রামবাড়া নামক এক চটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গৌরীকুণ্ডের ন্যায় স্থায়ী, দৃঢ়, মজবুত, ঘরবাড়ী এইখানে একখানিও নাই। যে সকল যাত্রী ৺কেদারের অত্যধিক শীতে কাতর হইয়া তথায় একরাত্রিও অবস্থিতি করিতে অপারগ কেবল তাহাদিগেরই জন্য অযত্ন-সুলভ প্রস্তরখণ্ড এবং তৃণগুল্মে রচিত কয়েকখানি কুটীর মাত্র এইখানে আছে। যাত্রীগণের অত্যাবশ্যকীয় আহার্য্য দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য পাহাড়ীদের দুই একখানি দোকানও আছে। ৺কেদারের দর্শন করিয়াই যে সকল যাত্রী এইখানে আসিয়া একরাত্রি বাস করেন, ইহা কেবল তাঁহাদেরই জন্য নির্ম্মিত। সুতরাং এইখানে এককালীন প্রচুর পরিমাণে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না। নিম্নদেশীয় যাত্রীগণ এখানেও অতি কষ্টেই একরাত্রি মাত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন। এই রামবাড়াই ৺কেদারের পথে শেষ চটী। এইখান হইতে বাবা কেদারনাথের মন্দির প্রায় ৩ ক্রোশ হইবে। অতএব এখানকার কথাই স্বতন্ত্র। অতিরিক্ত তুষারপাতে এই সকল স্থান শীতকালে যেরূপ অগম্য এবং যেরূপ অপরিমিত তুষাররাশিতে পূর্ণ হয় যে, তাহাতে কোন প্রকারই এখানে স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। তুষারভারাক্রান্ত গৃহ, যেমনই মজবুত হউক না কেন, তাহা শীতের গুরু তুষারভারে চাপা পড়িয়া নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে। কেবল অগ্নি ও পাহাড়ী গরমবস্ত্রের সাহায্যেই পাহাড়ীরা কায়ক্লেশে বর্ষার কয়েকমাস সামান্য তৃণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া এইখানে বাস করিতে পারে। ভিন্ন দেশীয় যাত্রীগণের পক্ষে এখানে একরাত্রি বাসই বহু তপস্যার ফল বলিয়া বিবেচিত হয়।

যাহা হউক এই চটীতে আমি আর বিশ্রাম না করিয়া কেবল একবার চটী খানির ভিতর দিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। তখন আমার মন কেবল বাবার দর্শনের জন্যই দৌড়িতেছিল। যে কেদার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি

নিত্যই নূতন, চমৎকার, অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম, না জানি সেই দিব্যরাজ্যের অধীশ্বর বাবা-কেদারনাথের অধিষ্ঠান ভূমিতেই বা কত বিচিত্রতা এবং না জানি তথায় পঁহুছিতে পারিলে আমি কি পরমপদই প্রাপ্ত হইব? না জানি কি পরমানন্দময় রূপেই আমি তথায় গিয়া লয় পাইব? ইহা ভাবিয়াই আমি রামবাড়া ছাড়িয়া খুব ব্যগ্রতার সহিত বাবার মন্দিরের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রামবাড়া চটী হইতেই পার্ব্বত্য দৃশ্য ও স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। গিরিরাজের-পাদমূল হইতেই এতদিন যাঁহাকে গভীর অরণ্য সমাচ্ছাদিত দেখিতেছিলাম, গৌরীকুণ্ড হইতে যত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, তাহা বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। হিমাদ্রির চিরশুভ্র সুবিশাল বক্ষে যে, বিচিত্র শাল, সরল সুচারু দেবদারু দ্রুমগুল ঘনকৃষ্ণ লোমাবলী রেখার ন্যায় গিরিগাত্রে শোভা পাইতেছিল এবং যে মনোহর, সুবিস্তীর্ণ, লতাবিতানাচ্ছন্ন, বিহগকূজিত, নিভৃত গিরিকুঞ্জ দেখিতে ছিলাম, তাহা আর দেখিতে পাইলাম না। এখানে কেবল গগণমণ্ডলভেদী, শ্রেণীবদ্ধ, অত্যুচ্চ, মহান্, অলঙ্ঘ্য, অগাধ, হিমময় শুভ্র, অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ আমার নয়ন গোচর হইল এবং অসংখ্য নির্ঝরিণীর অবিরল কলকল ধ্বনি, আমার শ্রুতিগোচর হইল। আর দেখিলাম যে, এখানে বিশুদ্ধ মেঘমালা, সত্য সত্যই ধরাধরের সুবিশাল নিতম্বদেশে দিব্যমেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

৮ কেদারের নিম্নপ্রদেশ হইতেই আমি গিরিনিতম্ব স্বচ্ছ মেঘ-মালায় সুশোভিত দেখিয়াছিলাম। এমন কি, কোথাও উচ্চতর গিরিপ্রদেশ হইতে তন্নিম্নে মুষলধারে বৃষ্টিপতন হইতে দেখিয়াও আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। গিরিবরের এক একটী উন্নতশৃঙ্গে কত বিচিত্র ভাবেরই যে একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একই পর্ব্বত শৃঙ্গ, কোথাও অজস্র মেঘ বরিষণে সুস্নাত এবং প্রচণ্ড ভানুতাপে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত; কোথাও অবিরল-ধার অসংখ্য প্রস্রবণ, নদী ও নির্ঝরিণীর প্রবল প্রবাহ পরিপ্লাবিত এবং পাষাণময় চির উষরভূমিতে পরিণত; কোথাও চিরবসন্তের মন্দ মন্দ সুগন্ধ সমীরণে আমোদিত এবং আকুল বিহগকুলের হৃদয়োন্মাদক সুমধুর তান সমন্বিত সঙ্গীতধ্বনিতে চিরমুখরিত; কোথাও হিমাংশুর সুস্নিগ্ধ বিমল জ্যোৎস্না-

লোকে পুলকিত এবং প্রগাঢ় অন্ধকার সমাবৃত সকল ভাব ও দৃশ্য বিবর্জ্জিত নিভৃত গিরিগহ্বরে পরিপূর্ণ ; এবং কোথাও অক্ষয় তুষারবরাশিপূর্ণ, অগম্য, অপার ও অচিন্ত্য ভাববিশিষ্ট হইয়া কত রঙ্গই যে দেখাইতেছে এবং আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ কত ভাবেরই যে উৎস খুলিয়া দিতেছে, তাহা বলা যায় না। একই গিরিশৃঙ্গ মূর্ত্তিমান্ ষড়ঋতুরূপে প্রকাশিত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে তাহার অতীত, অনন্ত ভাবের সমষ্টিস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং ভাবাতীত অবস্থায় থাকিয়া, যেন বিশ্ব-স্রষ্টার বিচিত্র বিধানের অপূর্ব সমন্বয় সম্পাদন করিতেছে এবং অল্পবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট মানবের উদ্ধার কামনায় নামরূপ বিবর্জ্জিত, নিরুপাধিক ব্রহ্মই স্বয়ং এই বিরাট গিরিবররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার বিচিত্র স্বভাব ও শক্তির রহস্যোদ্ঘাটন করতঃ তাহার জ্ঞান চক্ষুর অতি সহজেই উন্মেষ করিতেছেন !

যাহা হউক তাহার পর দেখা যাউক, আমি এখানে আর কি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম। আমি ক্রমশঃ উপরে উঠিতে উঠিতে স্বয়ংই মেঘমণ্ডলে অদৃশ্য হইয়া গেলাম! তখন ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে, না জানি পৃথিবীর সমতল ভূমি হইতে আমি কত উর্দ্ধে উঠিয়াছি। উত্তরোত্তর আবার ইহাও দেখিলাম যে, আমি অপার মেঘমণ্ডল অতিক্রম করিয়াও উপরে উঠিতেছি এবং ঘন বায়ুমণ্ডলেরও উচ্চ প্রদেশে উপস্থিত হওয়ায় আমার শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ারও কিছু ব্যতিক্রম বোধ হইল। তাহার পর কোথাও দেখিলাম যেন. অপরিগ্রাহ্য ও দুরধিগম্য মহীধরকে বেষ্টন করিতে গিয়া, শতধা বিভক্ত ধারাধর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অপার গিরিনিতম্বে অসাড়, নিস্পন্দ ভাবে লম্বমান হইয়া রহিয়াছে : চপলাচমকিত, চঞ্চল জলধর, শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়াও শেষ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সুগভীর গিরিসঙ্কটে নিপতিত হইবার ভয়েই যেন মৃতবৎ গিরিগাত্রে জাপটাইয়া ধরিয়া রহিয়াছে : আবার কোথাও নভশ্চরের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন জগৎ পিতার বিশ্বমন্দির প্রদক্ষিণ করিবার জন্যই খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি একমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; অখণ্ড জলদজাল যেন,কোথাও ভূধররাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর তাঁহার পাদমূল বিধৌত করিতেছে এবং তাঁহার অপার মনোহর উদ্যান, প্রতিনিয়ত বিমল বারি-সিঞ্চনে বিবিধ ফল পুষ্পে সুশোভিত করিয়া আপন জলদনাম সার্থক করিতেছে ; অনন্তভাব সমন্বিত হিমালয়ের অনন্ত

মহিমায় মুগ্ধ ও তাঁহার অপরিবেষ্টনীয় নিতম্বদেশেরও ইয়ত্তা করিতে অসমর্থ পযোধর যেন একান্ত ভক্তি সহকারে অপর সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তপোনুষ্ঠান কামনাতেই এইখানে আসিয়া নিভৃত গিরি-গুহা-দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিরকালের জন্য সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছে, অথবা ইহাও মনে হয় যে, লোকপাবন প্রাচীন মহর্ষিগণ, যেন এখনো হিমালয়ের নিভৃত গিরি-কন্দরে অনন্তের ধ্যানে সমাহিত আছেন, তাঁহাদিগকে লোকচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিবার জন্য এবং তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গের বিঘ্ন নিবারণ করিবার জন্যই বুঝি, খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি নিথর ও নিশ্চলভাবে গিরিবিবর রুদ্ধ করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছে; প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাশালী নগাধিপের অচিন্ত্য মহিমাবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াই বুঝিবা লজ্জায় অধোবদনে গগণবিহারী হইয়াও বিজন গিরিগুহায় গিয়া একেএকে অদৃশ্য হইতেছে; গিরিরাজের সর্ব্বাঙ্গ মেঘাবৃত দেখিয়া আমার ইহাও মনে হইল যে, গিরিরাজ, যেন তাঁহার কঠিন বহিরঙ্গের বহিরাবরণ স্বরূপ ঘন, ভীষণ, নিবিড় অরণ্যাণীর পরিবর্ত্তে এখানে তিনি স্বীয় স্বচ্ছ হিমময়, কোমল চারুঅঙ্গের উপযুক্ত বসন মনে করিয়াই স্বচ্ছ, জলদজালে আবৃত হইয়া দিব্যবেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন! আর মধ্যে মধ্যে দামিনীচমকে যেন তাঁহার অমূল্য রত্নখচিত বসনের প্রভা বাহির হইতেছে।

ক্রমশঃ—

কবিবর ৺ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

জীবনী ও কাব্য আলোচনা।

কাব্য সমালোচনা।

শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কাব্য সমালোচক হইতে হইলে কবি হওয়া আবশ্যক। আমি তাহা নহি, সুতরাং আলোচ্য কবিদ্বয়ের কবিতার দোষ, গুণ, মাধুর্য্য, লালিত্য, অলঙ্কার পটুতা প্রভৃতি আমি যে ঠিক খুঁজিয়া বাছিয়া পাঠককে

উপহার দিতে পারিব সে ভরসা আমার নাই। কবি সুরেন্দ্রনাথও তাঁহার কাব্যের একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন—

" নদীমধ্যভাগে যথা সন্তরিত জন
গভীর নীরের নৃত্য করি বিলোকন
সভয়ে, সন্দেহ মনে কুল পানে ধায়
কবির অবস্থা তাই
আগে চেয়ে ভয় পাই "

আমারও প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া অবস্থা অনেকটা সেইরূপ হইয়াছে। আমিও সুরেন্দ্রনাথের ও বিহারীলালের কাব্যরত্নাকরে পড়িয়া কুল পাইতেছিনা। তবে ভরসা এসমুদ্র "যাদোরত্নরিবার্ণবঃ" নহে। এ রত্নকরে আমার বোধ হয় সকল রত্নই বাছাইকরা, যাহা তুলিয়া দিব তাহাই বহুমূল্য। এক্ষণে উভয় কবির কয়েক খানি কাব্য হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমে বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ' ও 'সঙ্গীতশতক' হইতে নমুনাস্বরূপ দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গলের' যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বন্ধুবিয়োগ ১২৬৬ সালে রচিত হয়, তখন কবির বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। আর এই কাব্যখানিতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বের। তিনি বাল্যে ও যৌবনে বন্ধুগণের সহিত যে সকল আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে নিত্য যেমন গঙ্গাস্নান করিয়া আমোদ পাইতেন, কাহারও কাহারও সহিত সংস্কৃত কবিদিগের কাব্য রসাস্বাদন করিয়া কেমন পুলকিত হইতেন ও কাহারও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া কেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেন তাহার একটী সরল সঠিক ছবি বন্ধুবিয়োগে পাওয়া যায়। তাঁহার বন্ধুবিয়োগের ভাষা সারদামঙ্গলাদির ন্যায় মার্জ্জিত না হইলেও পড়িবার কালীন হৃদয়ে কেমন এক আঘাত করে তাহাতে সব দোষ ঢাকিয়া যায়। বন্ধুবিয়োগজনিত শোকের চিহ্ন ইহার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। স্থানে স্থানে তাহা এত পরিস্ফুট যে পাঠকের হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। কবিবর বিহারীলাল বন্ধুবর্গকে হারাইয়া কাব্যের শেষে নিজের মানসিক অবস্থার যে ছবি দিয়া গিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

হাহা প্রিয়গণ, অল্পক্ষণ সুখ দিয়ে,
প্রণয় পবিত্রপ্রভা প্রকাশ করিয়ে,
অরুণ উদয়ে তারাগণের মতন,
যৌবন উদয়ে সবে হ'লে অদর্শন!
জগতের জ্বালা হ'তে পেয়ে অবসর,
নিদ্রিত রয়েছ মহানিদ্রার ভিতর।
তোমাদের পক্ষে এবে সম সমুদয়,
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়।
কিবা ঘোরতর বজ্র-নিনাদ ভীষণ,
কিবা সুমধুরতর বীণার বাদন,
কিবা প্রজ্জ্বলিত দিনকর খরজ্যোতি,
কিবা পূর্ণশশধর-নির্ম্মল-মালতী,
কিবা বিদ্যুতের খেলা নীরদ মণ্ডলে,
কিবা কমলের শোভা চল চল জলে,
কিবা সাধুদের মুখে প্রশংসার গান,
কিবা নিন্দুকের তূণে বিষেশানা বাণ,
কিবা প্রিয় বান্ধবের শোক হাহাকার,
কিবা শত্রু শকুনির সানন্দ চীচ্‌কার,
কিছুই এখন আর অনুভূত নয়;
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়!
হায়রে মনের সাধ মনেই রহিল,
বসন্ত মুকুল জাল আতপে দহিল!

সঙ্গীতশতক গ্রন্থে একটী গীতে হিংসকের কি অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়াছেন দেখুন।——

রাগিণী—ললিত, তাল—যৎ।

১

হিংসক কি ভয়ানক
জন্তু এ সংসারে!
অন্তরে নরক কৃমি
কিলি বিজি করে;

২

চোক্ দুটো মিট্‌মিটে,
কথাগুলো পিট্‌পিটে,
মাস সিঁটকে আছে সদা
মুখের দুধারে;

৩

সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁৎ
সর্ব্বদাই ঘুঁৎ ঘুঁৎ
সুধা কেহ খেতে দিলে
বিষ জ্ঞান করে ;

৪

থেকে থেকে কচি খোকা,
থেকে থেকে নেকা বোকা,
পোড়া মুখে দেঁতো হাসি
খেতে আসে ধোরে ;

৫

প্রত্যেক কথায় বিষ
থুথু ফেলে তাহা বিস,
জগতের মধ্যে ভাল
লাগেনা কাহারে ;

৬

যদি কেহ সুখে রয়,
যেন সর্ব্বনাশ হয়,
কুঁড়ের ভিতরে বোসে
জ্বোলে পুড়ে মরে ;

৭

সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো
পেঁচারে লাগেনা ভাল,
কোটরে লুকিয়ে থেকে
মালসাট্ মারে ;

৮

শুনিলে কাহার যশ
রেগে হয় গশগশ,
রটায় তার অপযশ
যে প্রকারে পারে ;

৯

করিতে পরের মন্দ
বড়ই মনে আনন্দ,
নিয়ে তার ছন্দ বন্দ
ছুতো খুঁজে মরে ;

১০

ভাবিয়ে না ঠিক পাই
বল বিধি শুন্‌তে চাই,
কোন্ মাটি দিয়ে তুমি
গড়েছ ইহারে ?

বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী কাব্য দশ সর্গে সম্পূর্ণ। প্রথম সর্গে অনেক মনের কথা বলিয়া কোনও দার্শনিক বন্ধুকে সম্বোধন পূর্ব্বক, সমস্ত নারী-জাতিকে আটটী অবস্থায় বিভাগ করিয়া ও গ্রন্থ উপহার দিয়া বলিতেছেন,

চিত্রিতে এঁদের দেহ, মন,
যথাশক্তি পেয়েছি যতন ,
প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণ,
ধেয়ায়েছি একতান,
দেখ দেখি হয়েছে কেমন !

দ্বিতীয় সর্গে সমস্ত নারী জাতির উদ্দেশে এক অতি সুন্দর নারী বন্দনা করিয়াছেন। তৃতীয় হইতে দশম পর্য্যন্ত ৮টী সর্গে কবি পূর্ব্বোক্ত অষ্টবঙ্গ সীমন্তিনীর আটখানি চিত্র অতুল্যতূলিকায় অপূর্ব্ব রঙ প্রতিফলিত করিয়াছেন সে চিত্র যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। সে চিত্রে রঙের সমাবেশ অভাবনীয়। অভ্রহৃদিমাঝে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বরণ দেখিলেই যেমন প্রাণ কেমন মোহিত হইয়া যায় বিহারীলালের অপূর্ব্বচিত্রেও সেইরূপ প্রাণ বিমোহিত হয়। সেই মূর্ত্তি কয়টী দেখিলেই জীবন্ত প্রতিমা বলিয়া অনুভূত হয় কবিবর যে সে প্রতিমা গুলিতে ধ্যান পরায়ণ হইয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সে মধুর চিত্র কয়টির একটিও সম্পূর্ণভাবে এখানে দেওয়া অসম্ভব। কোন কোন চিত্রের দুই একটি কবিতা মাত্র উদ্ধৃত হইল।

সুরবালা।

শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী ;
নয়নে কমলা করেন নিবাস;
আননে কোমলা ভারতী সতী।

সীতার মতন সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা ;
কালরূপে আলো করি চরাচর,
কে গো এ বিরাজে মুগধা বামা!

বালিকার মত ভোলা খোলা মন,
বালিকার মত বিহীন লাজ ;
সকলেরে ভাবে ভেয়ের মতন
নাহিক বসন ভুষণ সাজ

* * *

তুমিই সুরবালা! সে সুর রমণী,
ঊষারাণী হৃদি উদয়াচলে ;

সখা-শক্তিশেল—বিশল্যকরণী
মৃত-সঞ্জীবনী ধরণীতলে।

করুণাসুন্দরীর কেমন মধুর চিত্র দেখুন :—

এই যে দাঁড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
উপরে চাতালে থামের কাছে ;
মুখ খানা আহা চুনপানা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে !
চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িয়ে ঢাকিয়ে মুখ কমল ;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে,
গড়িয়ে আসিছে নয়ন জল।

* * *

যেন দেব-বালা হেরিয়ে শিখায়,
কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে,
চেয়ে চারিদিকে না পেয়ে উপায়,
ভাসিছেন সুধু নয়ন জলে।

বিরহিণীমূর্ত্তি কিরূপে একটী গীতে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহারই উদাহরণ এক্ষণে প্রদত্ত হইল :——

গীতি।

কে তুমি যোগিনী বালা, আজি এ বিরল বনে ;
বাজায়ে বিনোদ বীণা, ভ্রমিছ আপন মনে !
গাহিছ প্রেমের গান
গদগদ মন প্রাণ,
বাধ বাধ সুর তান ধারা বহে দুনয়নে।
পদ কাঁপে থর থর,
টলমল কলেবর,
এলোথেলো জটাজাল লটপট সমীরণে।

শত শশী পরকাশি
অপরূপ রূপরাশি,
বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে হেরিছে হরিণীগণে।
যেন মণিহারা ফণী,
কার প্রেমে পাগলিনী,
কেন হেন উদাসিনী, হে উদার দরশনে!

এইবার সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গলের কাব্যসৌন্দর্য্য দেখাইতে হইলে প্রায় সমগ্র সারদামঙ্গলখানি উদ্ধৃত করিলেই ভাল হয়। শ্রদ্ধাস্পদ কবি রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গলের বিষয় লিখিতে যাইয়া ১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধে মধ্যে ১০ পৃষ্ঠা 'সারদামঙ্গল' উদ্ধৃত করিয়াছেন। সারদা-মঙ্গলে যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত আছে, তাহা প্রকাশ করা যায় না। সে সঙ্গীত কতকটা যেন "প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো! আকুল করিল মোর প্রাণ" এর মত। রবীন্দ্র বাবু বলেন, "সারদামঙ্গলে কবি যাহা গাহিতেছেন, তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটী স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে। সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোণার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়। কিন্তু কোনও রূপকে স্থায়িভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটী অপূর্ব্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।" কবির সারদাপ্রেম অপূর্ব্ব। তিনি সরস্বতীকে নানা ভাবে উপাসনা করিতেন। কখন সরস্বতী সেব্য তিনি সেবক, কখন সারদা প্রেমিকা তিনি প্রেমিক। তাঁহার সারদা কখনও স্নেহময়ী জননী, কখনও প্রণয়িনী প্রেয়সী, কখনও ভক্তিমতী দুহিতারূপে জগতের প্রভূত মঙ্গল করিতেছেন।

কবি বিহারীলাল ভক্ত ও প্রেমিক। কারণ, ভক্তিই প্রেম আর প্রেমই ভক্তি। ভক্ত বিহারীলাল তাঁহার সাধনের ধন সারদাকে ডাকিতেছেন—

"অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী!
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পাদ-পদ্মাসন কাছে

নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কি করিবে কোথা যাবে, দাও অনুমতি।
স্বরগ-কুসুম-মালা,
নরক জ্বলন জ্বালা,
ধরিয়ে প্রফুল্লমুখে মস্তকে সকলি
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী!"

প্রেমিক বিহারীলাল সারদা অদর্শনে ব্যথিত হইয়া হিমালয় শিখরে যাইয়া প্রণয়িনীকে অন্বেষণ করিতেছেন—

কেন গো বিমানে আজি অমরী অমর!
তোমরা কি সারদারে
দেখেছ, এনেছ তারে
ভূষিতে এ প্রকৃতির প্রাসাদ সুন্দর!

—o—

হা দেবী! কোথায় তুমি?
শূন্য গিরিফুল ভূমি!
কোথায় কোথায় হায়—সারদা—সারদা!

—o—

আহা স্নিগ্ধ সমীরণ।
বুঝিলে তুমি বেদন!
বুঝিল না সুলোচনা সারদা আমার
হা মানিনী! মানভরে
গেছ কোন্ লোকান্তরে।
বল দেব, বল বল কুশল তাহার।

—o—

অয়ি, ফুলময়ী সতী
গিরিভূমি ভাগ্যবতী!
অভাগার তরে তব হয়নি সৃজন;
দেখা যদি পাই তার,

দেখা হবে পুনর্ব্বার;
হলেম তোমার কাছে বিদায় এখন ॥

কবি উন্মাদপ্রেমিক। প্রেমোন্মত্ত হইয়া বলিতেছেন —

(১)

কোথা সে প্রাণের পাখী,
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি
আর কেন গান কোরে ডাকে না আমায়!
বল দেবী মন্দাকিনী!
ভেসে ভেসে একাকিনী
সোনামুখী তরিখানি গিয়েছে কোথায়!

* * *

(২)

কোন সুখ নাই মনে,
সব গেছে তার সনে,
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার!
বল কোন্ পদ্মবনে
লুকায়েছে সংগোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার!

কবি প্রণয়িনী সারদাকে এই দেখেন, এই হারান। সারদা এই তাঁহার নয়নপথে আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, আবার হয়ত এক অপূর্ব্ব বিষাদময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া পরক্ষণেই আবির্ভূতা। এই আসেন এই যান। তাই কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

ফের্, একি আলো এল!
কই কই কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার।
কে আমারে অবিরত
খেপায় খেপার মত,
জীবন-কুসুম-লতা কোথারে আমার!

নিম্নে কবির বর্ণিত সারদাদেবীর বিষাদময়ী মূর্ত্তির একটী চিত্র দেওয়া গেল——

"অয়ি, একি, কেন কেন,
বিষন্ন হইলে হেন!
আনত আনন শশী, আনত নয়ন,
অধর মন্থরে আসি
কপোল মিলায় হাসি,
থর থর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন।
তেমন অরুণরেখা
কেন কুহেলিকা ঢাকা
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন!
বল বল চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন কে এমন হৃদয় বিহীন!

অবশেষে প্রশান্ত গিরিভূমিতে জীবনের প্রদীপ, অমূল্য নিধির সহিত মিলিত হইয়া বলিতেছেন—

প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মূরতি তোমার!
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি করে হাহাকার।
আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ সাগর মাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়।

এইবার আমরা সারদামঙ্গলে বর্ণিত সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সারদামঙ্গলের কথা শেষ করিব—

ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে চল চল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
যোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।

স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতার এক স্থলে বলিয়াছেন—"আমি বিহারীলালকে দুঃখের কবি আখ্যা প্রদান করি, কেন না তিনি যেমন মানসিক কষ্ট বর্ণনা করিতে পারেন, আজ কালের কোনও কবি সে রূপ পারেন না"। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতা কয়টী হইতেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে——

বঙ্গ-সুন্দরী—সুরবালা।

কেন অচেতন কি হয়েছে হায়
হে জীবিত নাথ আজি তোমার
ও কোমল তনু ধুলায় লুটায়
নয়নে দেখিতে পারি না আর।
উঠ উঠ মম হৃদয় বল্লভ
উঠ প্রাণসখা হৃদয়স্বামী
মেল দুটি ওই নয়ন পল্লব
হেরিয়ে জীবন জুড়াই আমি।

ঐ—বিরহিণী।

একি আচম্বিতে ম্লান হয় কেন
জগত ব্যাপিনী নাথের ছবি
কেন কেঁপে উঠে রাহুমুখে যেন
থর থর করে মলিন রবি।
হৃদয়েরো প্রিয় মূর্ত্তি মধুরিমা
কেঁপে কেঁপে হেলে পড়িছে কেন
বিজয়া বিকালে সোনার প্রতিমা
দুলে দুলে জলে ডুবিছে যেন।

গ্রহণকালীন রাহুগ্রস্ত মলিনরবি ও বিজয়া বিকালে সোনার প্রতিমাকে জলে ডুবিতে যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, বিহারীলালের 'রাহুমুখে মলিন রবি' ও 'বিজয়া বিকালে সোনার প্রতিমা' বিসর্জ্জনে কতটা খেদ কতটা কাতরতা মাখান আছে।

সারদামঙ্গল হইতে—

ভেবে সে শোকের মুখ
বিদরে আমার বুক
মরিতে পারি না তাই আপনার হাতে,
বেঁধে মারে কত সয়
জীবন যন্ত্রণাময়
ছারখার্ চুর্ মার, বিনি বজ্রাঘাতে!
অন্তরাত্মা জ্বর জ্বর
জীর্ণারণ্য চরাচর
কুসুম কানন মন বিজন শ্মশান!
কি করিব কোথা যাব
কোথা গেলে দেখা পাব
হৃদি-কমল-বাসিনী কোথারে আমার?
কোথা সে প্রাণের আলো
পূর্ণিমা চন্দ্রিমা জাল
কোথা সেই সুধামাখা সহাস বয়ান?
কোথা গেলে সঞ্জীবনী
মণিহারা মহাফণি
অহো সেই হৃদি রাজ্যে কি ঘোর আঁধার।
তুমিতো পাষাণ নও
দেখে কোন্ প্রাণে সও
অয়ি সুপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে।

বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীর ভাষা বড়ই মধুর, বড়ই প্রাণস্পর্শিনী। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীর ছন্দের সহিত 'সমতালে নৃত্য করে প্রাণ'। সারদামঙ্গলের ছন্দ—প্রচলিত ত্রিপদী। কিন্তু ত্রিপদী হইলে কি হয়, এ বটতলা প্রতিষ্ঠিত রসবিন্দুবিহীনা সামান্য ত্রিপদী নহে। এ ত্রিপদী মধ্যে যে প্রাণ-

মনবিমোহনকারী সঙ্গীতসৌন্দর্য্য বর্ত্তমান আছে, তাহা অতুলনীয়। ত্রিপদী মধ্যে সে সৌন্দর্য্য এক অভাবনীয় ব্যাপার। ত্রিপদী কেন, অন্য কোনও গীতিছন্দে এমন সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। বিহারীলালের কাব্যের আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে বিহারী-লালের ভাষার আর একটী বিশেষত্ব সম্মুখে উদয় হয়। সেটী দোষ না বলিয়া বিশেষত্ব বলিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। সচরাচর সেটী দোষ বলিয়া গণ্য হয়। বিহারীলালের কাব্যে যেখানে সেখানে আমরা গ্রাম্য কথা সকল পাইয়া থাকি। আমার বোধ হয়, এই সকল গ্রাম্য কথা না থাকিলে বিহারীলালের কবিতাগুলি তত শীঘ্র প্রাণের অন্তস্থলে আঘাত করিত না, এবং বিহারীলালের ভাষা যতটা শ্রুতিসুখকর হইয়াছে, ততটা হইত না। কেহ কেহ বলেন, সাধুভাষার সহিত অশিষ্টবাক্য ব্যবহারে ভাষার সৌন্দর্য্য হানি হয় ও ভাষার ওজন থাকে না। তাঁহারা বিহারীলালের ভাষার এই স্বেচ্ছাকৃত নূতন ধরণ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, স্থলে স্থলে শিষ্টের পরিবর্ত্তে অশিষ্টকথা সাধুকথার স্থানে চলিতকথা কত উপাদেয়, কত মধুর, কত আবশ্যকীয়। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল পাঠকালে বেশ দেখা যায় যে, বঙ্গসুন্দরীর

‘গড়াগড়ি’— ‘গর্ব্বভরা অট্টালিকা যায়
এবে সব গড়াগড়ি যায়।’

‘ঝালা পালা’— ‘চারিদিকে ঝালা পালা
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা।’

‘নড়বোড়ে’— ‘সে নিশায় আমি ক্ষেত্রতীরে,
নড়বোড়ে পাতার কুটীরে।’

‘হেসে খুসে’ ‘খেলা দেলা’ ‘কাড়াকাড়ি’ } ফিরে আসে সেই ছেলে বেলা
হেসে খুসে করি খেলা দেলা
আহ্লাদের সীমা নাই
কাড়াকাড়ি করে খাই
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

‘বেয়ে চেয়ে’— ‘দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ,
বাঁচাবার যদি থাকে উপায়।’

'ছিঁড়ে খুঁড়ে'— 'ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক্ মন থেকে সব
ভাবনা, বাসনা, প্রণয়, স্নেহ।'

'ধাঙড়া ভাঙড়া'—'করেছেন দান সে কাল নিশিতে
ধাঙড়া ভাঙড়া বেদড়া বরে'

সারদামঙ্গলের——

'লালে লাল'— 'তৃণ তরু লতাজাল
অপরূপ লালে লাল'

'চুল বুলে'— 'যেন ভৈরবের গায
আহ্লাদে উথলে যায
ফণা তুলে চুল্ বুলে ফণী অগণন'

'হেসে খেলে'— 'এস বোন, এস ভাই,
হেসে খেলে চলে যাই।'

'আলুথালু'— 'মুখ খানি হাস হাস
আলুথালু বেশ বাস।'

ইত্যাদি গ্রাম্য শব্দনিচয় বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলকে প্রকৃতকাব্যে পরিণত করিতে কতকটা সাহায্য করিয়াছে। ৺বিহারীলালের অসাধু ভাষার কতকগুলি বাক্যাংশ ব্যবহার অতি মনোহর। তাঁহার 'বঙ্গ-সুন্দরীর'

'দেঁতো হাসি হাসা'—'লোক মাঝে দেঁতো হাসি হাসি
বিরলে নয়ন জলে ভাসি।

'ডাক ছেড়ে কাঁদা'—'ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি'

'তর্ করে দেওয়া'—'চারি দিকে এক পরিমল বায়,
তর্ করে দেয় মগজ ঘ্রাণ।'

'ঝাল ঝাড়িয়ে নেওয়া'—'রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।'

তাঁহার 'সারদামঙ্গলের'——

'আপনার মনে বকা'—'বিহ্বল পাগল প্রায
বেড়ায় কি বকে বকে আপনার মনে'

'মেজাজ খোলা'— 'মেজাজ গিয়েছে খুলে,
বসেছে দুনিয়া ভুলে।'

'উলে যাওয়া'— 'হয়ে কত জ্বালাতন
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার।'

প্রভৃতি শব্দবিন্যাস কাব্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে, সন্দেহ নাই। আর একটী কথা মাত্র বলিয়া বিহারীলালের প্রসঙ্গ শেষ করিব। বিহারীলালের সারদা-মঙ্গলের আগাগোড়া বিলাপোক্তিতে পরিপূর্ণ—যেন মূর্ত্তিমান্ করুণরস। সারদামঙ্গলে যে মর্ম্মস্পর্শিনী বিরহ-ব্যথা আছে, তাহা অতুলনীয়, অপার্থিব। বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যপ্রধান। বাঙ্গালীর মধ্যে কাব্যামোদীর সংখ্যাই অধিক, অথচ কবি বিহারীলালের কাব্য, যত বেশী লোকের নিকট আদর পাইবার যোগ্য, আমার বোধ হয় তাহা পায় নাই। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক কাব্য সম্বন্ধে যাঁহারই উপাসনা করুন না কেন, বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোকিল কবি সাহস করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট ও বিস্মৃত হইয়া যাইবে, 'সারদা-মঙ্গল' তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমালা ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।"

ক্রমশঃ

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

(ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত।)

শিষ্য। স্বামীজি! ঠাকুর বল্‌তেন, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না কর্‌লে ঠিক ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যারা গেরস্ত, তাদের উপায় কি? তাদের ত দিনরাত ঐ দুটো নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌তে হয়।

স্বামীজি। কামকাঞ্চনের আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না ; তা গেরস্তই হোক্ আর সন্ন্যাসীই হোক্। যতক্ষণ জান্‌বি ঐতে মন আছে, ততক্ষণ ঠিক্ অনুরাগ, দার্ঢ্যভাব বা শ্রদ্ধা আস্‌তে পারে না।

শিষ্য। তবে গেরস্তদের উপায় ?

স্বামীজি। উপায় হচ্ছে, ছোট খাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া ; আর বড় বড় গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বর লাভ হবে না—"যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ"।

শিষ্য। সন্ন্যাস নিলেই কি সব ত্যাগ হয় ?

স্বামীজি। সন্ন্যাসীরা ত ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। গেরস্তরা ত নোঙ্গর ফেলে নৌকো টান্‌ছে। ভোগের সাধ মিটে কি ? "ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"।

শিষ্য। কেন ? ভোগ করে করে শেষে ত বিতৃষ্ণা আস্‌তে পারে।

স্বামীজি। তা কজনের আসে ? বিষয় ভোগ ক্রমাগত কর্ত্তে থাক্‌লে মনে সেই সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়,—দাগ পড়ে যায়—মন বিষয়ের রঙে রঙে যায়। ত্যাগ—ত্যাগ—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। কেন, ঋষিবাক্য আছে—"গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং"।

স্বামীজি। গৃহে থেকে যারা কামকাঞ্চন ত্যাগ কর্ত্তে পারে, তারা ধন্য ; তা কয় জনের হয় ?

শিষ্য। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও কি সম্পূর্ণরূপে কাম কাঞ্চন ত্যাগ হয়েছে ?

স্বামীজি। পূর্ব্বেই যে বল্লুম—তারা পথে পড়েছে, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের এখনও বিপদ্ বলেই ধারণা হয় নাই, আত্মোন্নতির চেষ্টাই হচ্ছে না। যুদ্ধ কর্‌তে হবে, এ ভাবনাই আসে নাই।

শিষ্য। কেন, তাদের মধ্যেও ত অনেকে struggle কচ্ছে।

স্বামীজি। তারা ক্রমে অবশ্য ত্যাগ কর্‌বে ; ক্রমেই কামকাঞ্চনাসক্তি তাদের কমে যাবে। কিন্তু কি জানিস্,—'হয় হচ্ছে' যারা কর্‌ছে, তাদের আত্মদর্শন অনেক দূরে। এখনি ভগবান্ লাভ কর্‌ব, এই জন্মেই কর্‌ব—এই হচ্ছে বীরবাণী। তারা এখনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব ব্রজেৎ"॥

শিষ্য। ঠাকুর ত বল্‌তেন, ঈশ্বরের কৃপা হলে তাঁকে ডাক্‌লে তিনি এই সব আসক্তি কাটিয়ে দেন।

স্বামীজি। হাঁ, তাঁর কৃপা হলে হয় বটে; কিন্তু তাঁর কৃপা পেতে হলে pure হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে pure হওয়া চাই; তবে কৃপা হয়।

শিষ্য। কায় মন বাক্য সংযম কর্‌তে পার্‌লে তার আর কৃপার দরকার কি? তা হলে ত আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করলুম।

স্বামীজি। তুই যে চেষ্টা কচ্ছিস্ এই struggle দেখে তবে তাঁর কৃপা হয়। struggle না করে বসে থাক্; কখনও কৃপা হবে না।

শিষ্য। তা আমি নিজে ভাল হব, এ সকলেরই ইচ্ছা, কিন্তু কি দুর্লক্ষ্য সূত্রে যে মন নীচগামী হয় বল্‌তে পারি না; সকলেরই কি মনে ইচ্ছা হয় না যে, আমি সৎ হব—ভাল হব—ঈশ্বর লাভ কর্‌ব?

স্বামীজি। তা যাদের হচ্ছে, তাদেরই জান্‌বি struggle এসেছে। এই struggle continue কর্‌তে কর্‌তে ঈশ্বরের দয়া হয়।

শিষ্য। অনেক অবতারে দেখা যায়, যাদের আমরা ভয়ানক ব্যভিচারী মনে করি, তারা সাধন ভজন না করে, অনায়াসে ঈশ্বর লাভে সক্ষম হয়েছিল; এর মানে কি?

স্বামীজি। জান্‌বি, তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল; ভোগ কর্‌তে কর্‌তে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল। হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত। তাই ভগবানের দয়া হল। ওরা তমোগুণের ভেতর দিয়ে উঠেছিল।

শিষ্য। তা ওভাবেও ত ঈশ্বর লাভ হয়েছিল।

স্বামীজি। হাঁ, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়ীতে ঢোকা ভাল নয় কি?

শিষ্য। তা ত ঠিকই! তবে কৃপাতেও ত লোক সিদ্ধ হয়।

স্বামীজি। হয়, তবে খুব অল্প।

শিষ্য। আমার ত মনে হয়, যারা ইন্দ্রিয়াদি দমন করে, কামকাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বর লাভ কত্তে যাচ্ছে, তারা হচ্ছে পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; কিন্তু যারা তাঁর নামে নির্ভর করে পড়ে আছে, তাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই দূর করে, অন্তে পরম পদ দেন।

স্বামীজি। হাঁ, জ্ঞানী ও ভক্তের এই বিভিন্ন মত বটে। কিন্তু উভয় মতেই ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু—ঘোষ একদিন আমায় বলেছিলেন যে, কৃপা পক্ষে কোন নিয়ম নাই; সেখানে কোন law নাই। যদি থাকে, তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সব বেয়াইনী।

স্বামীজি। সে হচ্ছে শেষ কথা, দেশকালনিমিত্তের অতীত। যেখানে law of causation নাই, সেখানে কে কারে কৃপা করবে? সেখানে সেব্য সেবক, ধ্যাতা ধেয়, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হয়ে যায়। তাকে কৃপা বল্‌তে হয় বল্‌, ব্রহ্ম বল্‌তে হয় বল্‌—সব সমরস।

শিষ্য। আজ তবে আসি। আপনার কথা শুনে আজ বেদ বেদান্তের সার বুঝা হল; এতদিন কেবল "বাগ্‌বৈখরী" করা হচ্ছিল।

স্বামীজির পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আমিত্বে প্রেম।

(কত) ভালবাসি (আমি) "আমিত্বে" আমার!
ক্ষুদ্র হোক,—অসুন্দর, হোক অনুদার।
তুমি কবি—কাব্য মনোহর,
কল্পনা সহায় করি রচিয়া বিস্তর,
বিমল যশের ভাতি মাখিয়াছ দেহে।
তা' হেরি আমিত্ব মম ক্ষুব্ধ স্তব্ধ মোহে।
তব পাশে দাঁড়াইয়া, শক্তি স্ফূর্ত্তি হারাইয়া,
স্পন্দহীন জড়ের মতন।
কত মত বুঝাইয়া, কত আশা বিতরিয়া,
স্নেহে করি উরসে ধারণ।
প্রাণ পায়—শক্তি পায়—সব ফিরে পায়!
আশায় বাঁধিয়া বুক কত দিকে ধায়!

তুমি বিজ্ঞ। উচ্চ কণ্ঠস্বরে
ভাষাতে ভরিয়া তেজ মাতায়েছ নরে।
মহীয়সী-শক্তি মনে ভাবিতে বিস্ময় ;—
পাষাণে অঙ্কুরোদ্গম তব সাধনায়।
অদ্ভুত প্রতিভা স্মরে মনে প্রাণে জ্বলে মরে,
অসমর্থ "আমিত্ব" আমার!
পর্ব্বত লঙ্ঘিতে চায়, ফিরাতে না পারি তায়,
উল্লম্ফনে হয় চুরমার!
সযত্নে বিচূর্ণ অস্থি করিয়া সংগ্রহ ;
জীবন সঞ্চারি পুনঃ গড়ি নব-দেহ।

দার্শনিক—জ্ঞান সুবিমল——
সুধাকর-কর-কান্তি হতে. সমুজ্জ্বল!
যুক্তির শাণিত অস্ত্রে মিথ্যা করি নাশ ;—
সত্যের প্রতিষ্ঠা কর জ্ঞানের বিকাশ!
উচ্চতায় বিমণ্ডিত, ইচ্ছা—হই পদানত,
"আমিত্ব" না চায় নীচ হতে!
সে কহে, আছি বা দীন, কেন হব পরাধীন?
বিড়ম্বিত করে মোরে চিতে।
বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক প্রগাঢ় পণ্ডিত
প্রদীপ্ত প্রতিভা হেরে "আমিত্ব" ক্ষোভিত!

সঙ্গীতজ্ঞ তুমি শক্তিধর,
তোমার মোহন কণ্ঠে কে না মুগ্ধ নর?
পুত্রশোক, অন্নাভাব, ব্যাধির যন্ত্রণা।
ভুলেনা সঙ্গীতে হেন কোথা কোন্ জনা?
কণ্ঠসুধাপান আশে, ভুজঙ্গ আলোকে আসে,
করিকুল আকুল পরাণ।
ধন্য তুমি অসামান্য, সুধীজন গণ মান্য,
পৃথিবীতে অপার্থিব স্থান!

তব যশে ম্রিয়মাণ "আমিত্ব" আমার।
অক্ষম, তবুও তার বাসনা দুর্ব্বার!

চিত্রকর—ভাবেতে বিভোর,
প্রকৃতির অঙ্কগত ছবি মুগ্ধকর—
তুলিকায় সুচিত্রিয়া ভাব সমাবেশে
প্রদান কাব্যের সুখ মানব মানসে।
মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখে, সাধ্য নাই হেন আঁকে,
মরমে মরমে ব্যথা পায়;
নীরবে বসিয়া থাকে, শুনেনা সহস্র ডাকে,
উচ্ছৃঙ্খল যুবকের প্রায়!
মিষ্টভাষে "আমিত্বেরে" প্রবোধ প্রদানি,
কত দুখে কত শ্রমে স্বভাবেতে আনি।

ফিরে সাথে ছায়ার মতন!
তাই ভাল বাসাবাসি, তাই এ মিলন।
কি যেন হইয়া যাই ক্ষণেক না হেরি;
উৎসাহ-উদ্যম-হীন শক্তি কার্য্যকরী।
সুখে করি সুখ জ্ঞান, দুখে দুখ করে দান,
তার সনে দুশ্চেদ্য মিলন!
গর্হিত করম করে, প্রেম তাও ক্ষমা করে,
আশ্রিতের বাৎসল্য এমন!
ঘুমাইলে জাগাইয়া দেই অভিমান—
জগতের "আমিত্বের" কঠোর পরাণ!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ক্যালিফোর্ণিয়া বেদান্ত সমিতির কার্য্য এ পর্য্যন্ত বাটি ভাড়া লইয়া চলিতেছিল। পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, ১লা নভেম্বর হইতে ২৯৬৩নং ওয়েবষ্টার ষ্ট্রীট (সানফ্রান্সিস্কো) সমিতির নিজ বাটীতে কার্য্য চলিতেছে। সম্প্রতি এই বাটীতে বক্তৃতাদির জন্য একটী বৃহৎ হল এবং থাকিজন্য কতিপয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

জাতীয়ত্ব ভাবোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশজাত দ্রব্য বর্জ্জন ধ্বনি এই বঙ্গভূমে সর্ব্বপ্রথমে সমুথিত হইয়া সমুদায় ভারতবাসীর স্বদেশানুরাগের প্রমাণস্বরূপ সমগ্র ভারতাকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। এই স্বদেশপ্রেমের উৎস সম্ভূত কোটী কোটী ধারার অভূতপূর্ব্ব সম্মিলন জনিত প্রবাহ যাহাতে স্বীয় প্রচণ্ডবেগ সম্যক্ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুদায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জাতীয়ত্ব সাগরে মিলিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সহায়তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পিতৃপুরুষগণ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা পাইয়াছি এবং স্বচেষ্টায় যাহা উপার্জ্জন করিতেছি, তাহা কেবল আমাদের আজীবন ভোগের জন্য নহে; আমাদের ভাবী বংশধরগণের হস্তে সমর্পণের নিমিত্ত; কারণ, আমাদের কৃতকার্য্যতার উপরই তাহাদের উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এই উন্মেষের প্রারম্ভ হইতেই আমাদিগকে ক্রমান্বয়ে এক একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজনও আমাদিগকেই করিতে হইবে। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন আমাদের প্রথম যজ্ঞ। এক্ষণে এই যজ্ঞ যাহাতে সমুদয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আমাদের সকলকেই কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতে হইবে যে, যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদিগের মনোমত দ্রব্যাদি না পাই, সে পর্য্যন্ত স্বদেশজাত দ্রব্য নিকৃষ্ট হইলেও কিছু অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে। এই সঙ্গে আমাদের মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বদা আমাদের অন্তশ্চক্ষের সমক্ষে রাখিতে হইবে। সমগ্র স্বাধীন জাতিগণ মধ্যে আমাদের জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠাই আমাদের মহান্ লক্ষ্য। এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের চাই—"যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই,—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

অদ্বৈতবাদ

(শ্রীআশুতোষ দেব, এম এ

৩। মায়া।

এখন মায়া কাহাকে বলে, তাহাই আমাদের বিবেচ্য। শাস্ত্র ইহাকে "সদসদ্ভ্যাং অনির্বাচ্যা" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন,—অর্থাৎ মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে ; সৎও নহে, অসৎও নহে। ইহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। ইহাকে ঈশ্বরের শক্তি বা ইচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি ভিন্ন নহে, চন্দ্র হইতে যেমন চন্দ্রকিরণ ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে মায়া ভিন্ন নহে। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, "শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ", অর্থাৎ শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন নহে। এই জন্য বেদান্তসার বলিয়াছেন যে, "সদসদ্ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ" অর্থাৎ মায়া ভাবরূপী কোন কিছু, ইহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে। উপনিষৎ বলিয়াছেন যে,—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। (শ্বেতা-শ্বতর, ৪।১০) মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী বা মায়া-ধীশ বলিয়া জানিবে।

শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির দুইরূপ আছে। এক প্রকারে জগৎ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাংখ্যেরা মূলপ্রকৃতি বলেন এবং অন্য প্রকারকে দৈবীপ্রকৃতি বা যোগমায়া বলা হয় ; ইহাই জগতের আধার। মায়ার এই-প্রকার দুইটী রূপ আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে যে,—

"রাম মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যাঽবিদ্যেতি তে সদা।"

(অধ্যাত্ম রামায়ণ ৩-৩-৩২)

অর্থাৎ হে রাম! বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই প্রকারে মায়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন ইহা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইয়া ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া থাকে, তখন ইহাকে মহাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান বলা হয় ; কিন্তু যখন ইহা বিপরীত দিকে ফিরিয়া থাকে, তখন ইহাকে অবিদ্যা বা মহামায়া বলা হয়। বিদ্যারূপে ইহা

তত্ত্বসাক্ষাৎকার করাইয়া দেয় এবং অবিদ্যারূপে ইহা মোহে আবৃত করিয়া রাখে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,মায়া অনাদি, কার্য্যোৎপাদনসমর্থা, যাঁহা ব্রহ্মরূপে সতী, কার্য্যরূপে অসতী, অতএব সর্ব্বাত্মাতে ইনি সতীও নহেন অসতীও নহেন।

পঞ্চদশীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বিদ্যমান, তিনিই প্রকৃতি; তিনি সত্ব, রজ এবং তম—এই ত্রিগুণময়ী; তাঁহার দুই প্রকার রূপ,—মায়া ও অবিদ্যা। যে প্রকৃতির ধর্ম্ম শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, তাহাই মায়া এবং যাহার ধর্ম্ম রজস্তমোমলিনীকৃত সত্ত্বগুণ, তাহাই অবিদ্যা। মায়া-প্রতিবিম্বিত চিদানন্দ ব্রহ্ম ঈশ্বর, মায়া তাঁহার বশবর্ত্তিনী বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী। কিন্তু অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের নাম জীব, তিনি অবিদ্যার বশবর্ত্তী। মলিনতার ন্যূনাধিক্য বশতঃ অবিদ্যার ভেদ হইয়া থাকে এবং অবিদ্যার ভেদে জীবও নানা প্রকার হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তুর শক্তিই মায়া। দেবী ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধাশক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা ॥" ৭—৩২—৩

অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মের কোন স্বতঃসিদ্ধ শক্তিই মায়া নামে প্রসিদ্ধ। মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই, সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য দেখিয়া মায়াশক্তির অনুমান করিতে হয়, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি। কার্য্য জন্মিবার পূর্ব্বে কেহ কখন শক্তিকে জানিতে পারে না। পরমাত্মশক্তি মায়াকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না; যেহেতু আপনিই আপনার শক্তি ইহা বলা অসঙ্গত—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না। আবার এই মায়ার সত্তা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ও নহে, যে হেতু বেদে দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সদ্বস্তু পরব্রহ্মের সত্তাসম্বন্ধেই তাহার সত্তা। সুতরাং মায়ার দ্বিতীয়ত্ব নাই। বস্তু এবং তাহার শক্তি এতদুভয়ের পৃথক্ জীবনগণনা লোকপ্রচলিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত শক্তি সম্পূর্ণ ব্রহ্মব্যাপী নহে, কিন্তু একদেশব্যাপী, যেমন ঘটশরাবাদি জননশক্তি পৃথিবীর সর্ব্বাবয়বে নাই, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকাতেই তৎশক্তি অবস্থিত। এই পরমাত্মার এক পাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ। মায়া যে ব্রহ্মের একদেশবৃত্তি, তাহা শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং জগৎ যে ব্রহ্মের একদেশে অব-

স্থিত, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, যথা—"আমি কিয়দংশ দ্বারা এই সমুদয় জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি।" পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-বহির্ভাগেও অবস্থান করেন। ব্রহ্মাণ্ড বহির্ভাগেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ—এই প্রকার শ্রুতি আছে। যেমন রং ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বিবিধ চিত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তদ্রূপ মায়াশক্তি, সদ্বস্তু ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া, তাহাতেই নানাবিধ বিকার অর্থাৎ কার্য্যপরম্পরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে, সর্পের যে অস্তিত্ব জ্ঞান হয়, তাহা রজ্জুর অস্তিত্বমূলক। রজ্জুর অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যতীত সর্পের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বতন্ত্র নহে; এখানে রজ্জু অধিষ্ঠান, সর্প আরোপিত। সেইরূপ ব্রহ্মেই মায়াসৃষ্ট জগৎভ্রম কল্পিত। জগতের অস্তিত্বজ্ঞান, সদ্বস্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধ হইতেই উৎপন্ন। ব্রহ্মের একমাত্র সত্তা ব্যতীত, পৃথক্ সত্তা জগতে নাই।

শাস্ত্রে মায়ার তিন প্রকার রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়া যে জড়স্বরূপ অথচ মোহরূপ, তাহা শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই বোধিত হইয়াছে। বালক, মূর্খ প্রভৃতি সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত বলিয়া মায়া যে অনন্ত, ইহাও শ্রুতি-প্রতিপাদিত। অচেতন ঘটাদির যে স্বরূপ, তাহাকে জড় বলা যায় এবং বুদ্ধি যে বস্তুতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়, তাহাকে মোহ বলা যায়। উক্ত প্রকার লৌকিক দৃষ্টিতে মায়ার সর্ব্বানুভবসিদ্ধ অনন্তরূপত্ব প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু যুক্তি দ্বারা তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় না এবং শ্রুতিতে উহা অনির্ব্বাচ্যরূপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানদৃষ্টিতে নিত্য নিবৃত্ত বলিয়া তাহাকে 'তুচ্ছ' মাত্র বলা যায়। অতএব উক্ত মায়াকে তিন প্রকারে ব্যক্ত করা হইল, যথা—শ্রৌত দৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তি দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক।

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে মায়া অভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"সা চ মায়া পরে তত্ত্বে সম্বিদ্রূপেঽস্তি সর্ব্বদা।
তদধীনা প্রেরিতা চ তেন জীবেষু সর্ব্বদা॥
ততো মায়াবিশিষ্টাং তাং সম্বিদং পরমেশ্বরীম্।
মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
ধ্যায়েৎ * * * ।"

(দেবীভাগবত- ৩১— ৪৮ ও ৪৯)

অর্থাৎ মায়াকে পরমতত্ত্ব বলা যায়, তাহার স্বভাবই হইতেছে সংবিৎ বা চৈতন্য স্বরূপ, সে ঈশ্বরের অধীন এবং জীবসমূহের মধ্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। মায়াবিশিষ্ট সেই সংবিৎকে সচ্চিদানন্দরূপে ধ্যান করিবে।

মনুষ্যের যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন এই মায়ার অন্তর্ধান হইয়া থাকে।

যাহা দ্বারা পদার্থ সকল পরিচ্ছিন্ন (conditioned) হয়, তাহাকে মায়া বলে। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তিন প্রকারে হইয়া থাকে, যথা—দেশ, কাল ও পাত্র সুতরাং ইহাদিগকে মায়ার ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বলা যাইতে পারে। কাল-পরিচ্ছেদেব অভাবকে নিত্যত্ব, দেশ-পরিচ্ছেদের অভাবকে বিভুত্ব এবং বস্তুপরিচ্ছেদের অভাবকে পূর্ণত্ব বলা হয়। এই জন্য মায়াধীশকে নিত্য, বিভু ও পূর্ণ বলা হয়।

প্রকৃতি, শক্তি, অজা, দৈবী, প্রধান, অব্যক্ত, তম, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দ মায়ার পর্য্যায়। জগতের উপাদান বলিয়া 'প্রকৃতি' এবং জগন্মোহক বলিয়া 'মায়া' নামে উক্ত হইয়া থাকে। অনাদি বলিয়া ইহাকে অজা বলা যায়। বিষ্ণুর শক্তি বলিয়া ইহাকে দৈবী এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণাশ্রিতা বলিয়া ইহাকে ত্রিগুণময়ী বলা হয়।

আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি ভেদে মায়া দুই প্রকার। আবরণ শক্তির দ্বারা মায়া জীবোপাধি 'অবিদ্যা' রূপে এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা পরমেশ্বরী মায়ারূপে বিদ্যমান আছেন। আবরণ শক্তিটি বুঝাইবার দৃষ্টান্ত এই যে, অতাল্প এক খণ্ড মেঘ যেমন দর্শকের নয়ন মাত্র আচ্ছন্ন করে, সেই প্রকার এই শক্তি আত্মার যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে। জীব তখন নিজেকে বদ্ধ দেখিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপ শক্তি আর সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য একই কথা। রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞান যেমন সর্পাদির সৃষ্টি করে, সেইরূপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও স্বাবৃত আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির সৃষ্টি করিয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মায়া, অজা, মূলপ্রকৃতিরূপা ও ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, একাই দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি বহুবিধ প্রজা প্রসব করিয়া থাকেন। এই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে,—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধা চ মায়া
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (শ্বেতাশ্বতর)

অর্থাৎ, আত্মার পরাশক্তি, বিবিধ মায়া; জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি ও

ক্রিয়াশক্তি—এই তিনটী স্বভাবসিদ্ধ, অর্থাৎ ইহারা বিনা প্রয়োজনে ও বিনা উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়। সুতরাং মায়া ও শক্তি একই অর্থবাচক।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকেই শক্তি বলিয়াছেন। যথা,—"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তানি অধিতিষ্ঠতি।" (শ্বেতাশ্বতর)। প্রকৃতি দেবাত্মাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে অবস্থিতা; ইনি পরমেশ্বর হইতে অপৃথগ্‌ভূতা; ইহাঁকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী শক্তি বলা হয়। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,——

"জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ॥"
(যোগবাশিষ্ঠ—নির্ব্বাণ প্রকরণ)

অর্থাৎ, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ প্রবৃত্তি শক্তি, অকর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ নিবৃত্তি শক্তি ইত্যাদি পরমেশ শক্তির সীমা নাই। তৎপরে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, শক্তিমান্ হইতে শক্তির ভেদ নাই। মায়া বা অনাদিকর্ম্ম শক্তিভেদের কারণ; মায়া স্বরূপতঃ অনন্ত হইয়া পরব্রহ্মের গুণরূপে, শক্তিরূপে ও কার্য্যরূপে আনন্ত্য খ্যাপন করিয়া থাকে। বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন যে, শক্তিই দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; শক্তিই আকাশ, দেশ, কাল, মন, বুদ্ধি, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। মোটের উপর যত কিছু সত্তা আছে, তাহা সকলই শক্তি বা মায়া। বিজ্ঞানভিক্ষু যোগবার্ত্তিকে বলিয়াছেন যে, প্রধান, প্রকৃতি, পরমাণু ইত্যাদি সমানার্থক। এই জন্য বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে, নামরূপবিনির্মুক্ত জগৎ যাহাতে অবস্থান করে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ বা অণু বলিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল ইহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। পুরুষ ও কাল ব্রহ্মেরই অবস্থা বিশেষ এবং প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা জগৎকারণ নির্দ্দেশ করিলেও অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বা শক্তিকে মায়া বলে। এই শক্তিকে নানা শাস্ত্রে নানা প্রকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। শক্তি হইতে যেমন শক্তিমান্ পৃথক্ নহেন, তেমনি মায়া হইতে মায়ী বা ঈশ্বর পৃথক্ নহেন। তিনি মায়াময়

বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে নানা প্রকার নামে অভিহিত করিয়াছেন যথা,—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

(ঋগ্বেদ সংহিতা, ১৬৫-৬৬)

তাঁহাকে শাস্ত্রে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি এবং তাঁহাকে সুবর্ণপক্ষযুক্ত গরুত্মান্ বলা হয়। যে বস্তু সৎ তাহা এক, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাকে বহু প্রকারের নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন ; তাঁহাকে অগ্নি, যম এবং মাতরিশ্বা বলা হয়।

এই মায়োপাধিক সগুণ ব্রহ্মকে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,——

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"

(মনুসংহিতা।)

অর্থাৎ, কেহ তাঁহাকে অগ্নি বলে, কেহ তাঁহাকে মনু বলে, কেহ প্রজাপতি বলে, কেহ ইন্দ্র বলে, কেহ প্রাণ বলে এবং কেহ বা শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া থাকে।

মায়াবশে এই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর হইতে সৃষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে।

৪। জীব।

জীবের স্বরূপ কি, তাহা অবগত হওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,——

"নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবপরমানন্দানন্তাদ্বয়ং"

অর্থাৎ, তিনি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সৎস্বরূপ, পরমানন্দ স্বরূপ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। চারিবেদের চারিটী মহাবাক্যের দ্বারা জীবের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে ; যথা,—

(১) ঋগ্‌বেদে—"প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"
(২) যজুর্ব্বেদে—"অহং ব্রহ্মাস্মি।"
(৩) সামবেদে—"তত্ত্বমসি"।
(৪) অথর্ব্ববেদে—"অয়ং আত্মা ব্রহ্ম।"

এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু জীবের তো ঐ প্রকার জ্ঞান হইতেছে না। ইহার কারণ কি? শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, চিদাত্মা অজ্ঞানোপহিত হওয়াতে ঐ রূপ ভ্রম হইতেছে। অজ্ঞান দূরীভূত হইলে, জীব তখন "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে।

জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য দুইটী শাস্ত্রীয় উদাহরণ (classical example) প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথা—(১)"কণ্ঠচামীকরবৎ"। কোন শিশুর গলায় স্বর্ণালঙ্কার ছিল। সে কিন্তু অন্যমনস্কতাবশতঃ উহা ভুলিয়া গিয়া তাহার অলঙ্কার সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেইখানে ছিল, সে বলিল, "তুমি তোমার অলঙ্কার খুঁজিতেছ কেন? এই তোমার গলায় রহিয়াছে।" তখন বালকের চমক ভাঙ্গিল, সে গলায় হস্ত দিয়া স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। জীবেরও ঐ প্রকার দশা হইয়াছে। সে যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, তাহা ভুলিয়া গিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু যখন বলেন যে, তুমিই সেই ব্রহ্ম—"তত্ত্বমসি," তখন জীবের জ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

(২) "সিংহশিশুবৎ"। এক দল মেষের সহিত একটী সিংহশিশু জন্মাবধি প্রতিপালিত হইয়াছিল। এক সঙ্গে প্রতিপালিত হওয়াতে সে নিজের স্বরূপ অবগত ছিল না, সে নিজেকে মেষশাবক বলিয়া ভাবিত। একদা এক হস্তী সেই মেষের দলের ভিতর আসাতে, মেষেরা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইল। ঐ সিংহশিশুও মেষবৎ পলাইতে লাগিল। এই ঘটনার অনতিদূরে এক সিংহ দণ্ডায়মান থাকিয়া এই ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে ঐ সিংহশিশুর মেষবৎ আচরণ দেখিয়া, তাহার নিকট গিয়া বলিল যে, "তুমি ভয়ে পলাইতেছ কেন? আমার সহিত আইস।" সিংহশিশু তাহাকে অনুসরণ করিয়া এক জলাশয়ের ধারে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন ঐ সিংহ সেই শাবককে তাহার প্রতিবিম্ব জলে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "তোমার স্বরূপ দেখ দেখি, তুমি ত মেষ নও; তুমি সিংহশিশু, তবে তুমি মেষবৎ আচরণ করিতেছ কেন?" তখন সেই সিংহশিশু তাহার স্বরূপ অবগত হইয়া ঐ হস্তীকে আক্রমণ করিতে গেল। জীবেরও ঐ দশা হইয়াছে। সে তাহার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। সদ্গুরু যখন বুঝাইয়া

দেন যে, "তুমি জীব নও, তুমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, তুমি অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে জীব বলিয়া ভাবিতেছ" তখন তাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তখন সে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ, ব্রহ্মবিদ্ হইয়া ব্রহ্ম হইয়া থাকে।

বিদ্যারণ্যমুনি বলিয়াছেন যে,——

"মায়াখ্যায়া কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বং তদদ্বৈতমেব হি॥"

(পঞ্চদশী, ৬।২৩৬)

অর্থাৎ মায়ারূপা কামধেনুর দুইটী বৎস,—জীব ও ঈশ্বর ; অর্থাৎ উভয়ই মায়িক অবস্তু ; তদ্দ্বারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু পরম তত্ত্ব। তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম তদ্বস্তু তস্য তৎ।
ঈশ্বরত্বন্তু জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্॥ (পঞ্চদশী ৩—৩৭)
"মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ
অনন্তং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে॥ (ঐ—১—৪৮)

অর্থাৎ, ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ, তিনিই বস্তুতঃ সৎ কিন্তু ঈশ্বর ও জীব উপাধি কল্পিত সুতরাং অবস্তু। ব্রহ্ম বস্তুতঃ নিরুপাধিক, যখন তাঁহাতে মায়াশক্তির উপাধি সংযুক্ত হয়, তখন তিনি ঈশ্বর এবং যখন কোষ উপাধির যোগ হয়, তখন তিনি জীব পদবাচ্য হইয়া থাকেন। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে——

"কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।" (ঐ—৩—৪১।)

কোষ রূপ উপাধির অভাবে অর্থাৎ মায়ার অভাবে জীব নিরুপাধি চৈতন্য স্বরূপ হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ।)

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

রুদ্র-প্রয়াগ হইতে কেদার-বাহিনী মন্দাকিনীকে কখনো বামে কখনো দক্ষিণে রাখিয়া বরাবরই তাহার তীরে তীরে আসিতেছিলাম, তাহার পর বামবাড়া হইতে, আমার যত দূর স্মরণ হয়, মন্দাকিনীকে দক্ষিণে রাখিয়া স্থানে স্থানে অল্পায়তন তুষারময় ভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। নগ্নপদে যাইতে আমার তথায় কোন কষ্টই হইল না। বোধ হয়, আমি আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে ৺কেদারনাথে গিয়া পঁহুছিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে সেরূপ তুষারাচ্ছন্ন পথ দিয়া যাইতে হয় নাই। যাঁহারা যাত্রার প্রারম্ভেই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমেই ৺কেদারনাথে আইসেন, তাঁহাদিগকে তখন যেরূপ তুষারাচ্ছন্ন পথ দিয়া যাইতে হয় এবং মন্দাকিনীকে সে সময় যেরূপ কঠিন হিমাবৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, এ সময়ে সেরূপ থাকে না। আষাঢ় মাসের মধ্যেই ৺কেদারের পথ, ঘাট, সমুদায় বেশ ধুইয়া পরিষ্কৃত হইয়া যায়। প্রতি বৎসর শীতকালে নিপতিত যে অপরিমিত তুষাররাশি, কঠিন প্রস্তরের ন্যায় জমিয়া ৺কেদারনাথের পথ, ঘাট ও মন্দিরাদি আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ স্পর্শে বিগলিত হইতে থাকে ও বর্ষাগমে ক্রমশঃ সে সমুদায় বরফ জল হইয়া মন্দাকিনীর কলেবর বৃদ্ধি করে। আষাঢ় মাসের শেষ হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত কালই, ৺কেদারনাথ দর্শনের উপযুক্ত সময়। কেদারের যে প্রস্ফুট বিকশিত ভাব এই সময় দেখিতে পাওয়া যায় এবং কেদারের অলৌকিক শোভা সম্পদের যে অপূর্ব্ব শ্রী ও প্রকাশ এই সময়ে পরিদৃষ্ট হয়, আর কোন সময়েই সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বর্ষার বারিপাতাশঙ্কায় যে সকল যাত্রী, জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই ৺কেদার বদরী যাত্রা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রার সম্পূর্ণ সুখাস্বাদনে বঞ্চিত হন—৺কেদার বদরী নারায়ণের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অপরূপ, বিচিত্র দৃশ্যের পূর্ণতা ও চমৎকারিতার কিছুই তাঁহারা দেখিতে পান না। পূর্ণ বর্ষায় ৺কেদারনাথে শৈত্যের অল্পতা প্রযুক্ত এবং স্বভাবজাত বিবিধ ফুল্ল কুসুমের আবির্ভাবে উহা যেরূপ স্পৃহনীয় হয়, তাহা আর কখনই সম্ভবে না।

৺ কেদারের পূর্ণ-মাহাত্ম্য অনুভব করিবার জন্যই বুঝি পূর্ব্বাপর ৺ কেদারে সমগ্র শ্রাবণ মাস কল্পবাস করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

সে যাহা হউক, এইবার আমি যে ভুবনমোহন, বিচিত্র, স্বর্গীয়, জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং ৺ কেদারের যে অসামান্য, মহান্, অপূর্ব বিস্ময়জনক দৃশ্য আমার নয়ন পথে পতিত হইল, তাহার অতি স্থূল বিবরণও আমি লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম। সেই অনির্ব্বচনীয়-স্বভাবসম্পন্ন কেদারের অনন্ত মহিমা আমি যতই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই তাহার ইয়ত্তা হইবে না, বা কোন মতেই আমি তাহার বস্তু-গত মাহাত্ম্য সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হইব না। যে বিরাট্, দিব্য, পরমসুন্দর মূর্ত্তি আমি এই চর্ম্মচক্ষে তথায় প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে আমি সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া একবার সেই অমরধাম স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি।

আমি হিমালয়কে যে, কি ভাবে দেখিয়াছি, তাহার মোটামুটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও যে আমার উপযুক্ত স্মৃতির অভাবে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইবে, তাহা আমি এক্ষণে বিলক্ষণ রূপেই বুঝিতে পারিতেছি। হিমালয়ের এক একটী বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহার পর আমার এই দুর্ব্বল অকিঞ্চিৎকর ভাষায়, বিশ্ববিখ্যাত কেদারের বিষয় যেরূপেই বর্ণনা করি না কেন, আমি নিজেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারিব না। আর প্রস্তাবিত বিষয়ের গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া যদি কেহ ভ্রমক্রমেও আমার এই নীরস ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনিও যে, সর্ব্বলোক-বিস্ময়কর, কেদারের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারিবেন, আমি তাহা মনে করি না। বহুকাল পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, তাহার অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, আমাকে পুনরায় একবার এই সময়ে সেই অদ্ভুত, দিব্য রাজ্য দেখিয়া আসিতে হয়। সবিশেষ দেখিয়া এবং তাহার বিশেষ বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে, তাহা পাঠ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকেই কিয়ৎ পরিমাণে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন। সদ্যোদৃষ্ট হইলেও কোনও বিষয় যদি হৃদয়গ্রাহী না হয়, বা তাহার একটী অবিকল চিত্র যদি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত না থাকে, তাহা হইলে তাহাও অচিরকাল মধ্যেই

বিস্মৃতির অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যায়। অতএব এই সুদীর্ঘকাল পরে আমি সহায়সম্পদ্বিহীন হইয়াও যে, এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, হিমালয়ের যে অপার চৈতন্যময়, অদ্ভুত, জীবন্ত মূর্ত্তি, একদিন আমার সম্পূর্ণ হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তাহা চিরকাল আমার হৃদয়ে সমভাবে জাগরূক থাকিবে। বিস্মৃতির অগাধ সলিলে সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মগ্ন হইলেও আমার চক্ষে, হিমালয়ের সেই চিন্ময়মূর্ত্তি সদাকাল ভাসমান থাকিবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করিব। সেই জন্যই আমাকে অতি সন্তর্পণে সকল কথা বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে হইতেছে। প্রবন্ধের আরম্ভেই প্রিয় পাঠকবৃন্দকে আমার প্রকৃত ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার অক্ষমতার প্রধান কারণ সম্বন্ধে জ্ঞাপন করিয়াছি, পুনরায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি পদে পদে স্বীয় ত্রুটি বুঝিয়া বিশেষরূপে লজ্জিত ও ব্যথিত হইতেছি।

সে যাহা হউক্, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিয়া দেখা যাউক্ যে, আমি ক্রমশঃ কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিছু দূর হইতেই আমি ৺ কেদারের প্রকাণ্ড, বিশাল, উজ্জ্বলতম, আমূল তুষারমণ্ডিত সুমহান্ গিরিশৃঙ্গ দর্শন করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। যেরূপ দ্রুতপাদবিক্ষেপে আমি এতক্ষণ উপরে উঠিতেছিলাম, আর যেন সে ভাবে আমি চলিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ মোহাবিষ্টের ন্যায়, আমি যেন আমার অজ্ঞাতসারেই অল্পে অল্পে দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে মহান্ উত্তুঙ্গ, চিরনীহারময়, গিরিশৃঙ্গের সানুদেশে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, বাবা কেদারনাথের বিশ্ব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহার আগাগোড়া সমুদায় আমি এক্ষণে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দিনমণি ভাস্করের দিকে একদৃষ্টে তাকাইলে যেমন তাহার দীপ্তার্চ্চিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, অপ্রদর্শন কেদারের মহোচ্চ, উজ্জ্বল, বিরাট্, জ্যোতির্ম্ময়, শুভ্র বিশালকায় সম্মুখে দর্শন করিয়াও আমার ঠিক সেইরূপ হইল! গিরিবরের দীপ্তাঙ্গ হইতে যেন অনন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া আমার দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করিতে লাগিল, এবং সেই জন্যই আমার মনে হইল, যেন কোন অন্ধকার রাজ্য হইতে আমি হঠাৎ একেবারে দিব্যালোকে আলোকিত স্বয়ংপ্রকাশ এক অদ্ভুত বিচিত্র প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি! সেই অত্যুজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের দিকে

প্রকৃতই যেন অধিকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না! জগদ্‌গুরু, দেবাদিদেব মহাদেবের জ্যোতির্ম্ময়, অনাদি, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ যে, এই গিরি-চূড়া, তাহা যেন আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম এবং ইহা যে কল্পিত নহে, সত্য, জীবন্ত প্রতিমা, আমি তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। হিমাদ্রির অতি শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময়, বিরাট্ বপুর অবাধ দর্শন, যেমন এই কেদারে হয়, সমগ্র উত্তরাখণ্ডের মধ্যে আর কোথাও তেমন হয় না। এমন কি, আমি উত্তরাখণ্ডের বহুতর দুর্গম প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু এই কেদারের তুল্য সুপ্রশস্ত, পরমরমণীয়, বিচিত্রায়তনবিশিষ্ট, সুপবিত্র ক্ষেত্র আর অতি অল্পই দেখিয়াছি। দুর্গম ও দুর্লক্ষ্য চিরহিমানী, যেমন এই কেদারে অতি সহজেই সকলের দর্শনীয় হন, এমন বোধ করি আর কোথাও নহেন। কেদার সর্ব্বাংশেই এক পরমধাম কৈলাসেরই অনুরূপ; এক কৈলাস ভিন্ন হিমালয়ের আর কোনও স্থানের সহিতই ইহার তুলনা হয় না।

ক্রমশঃ।

কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

জীবনী ও কাব্য আলোচনা।

সুরেন্দ্রনাথের কাব্য।

(শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত।) (পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এইবার আমরা সুরেন্দ্রনাথের কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কোনও লেখক বলিয়াছেন—যে জাতি যত সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতে পারে, সেই জাতিতে তত উৎকৃষ্ট কবি জন্মায়। বাঙ্গালী জাতি কত সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়াছে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন এবং সুরেন্দ্রনাথই তাহার পরিচয়স্থল। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে 'সবিতা সুদর্শন' ও 'মহিলা' পুস্তকাকারে পাওয়া যায়। তাঁহার 'ফুলরা' ও'মাদক মঙ্গল'সমীরণ নামক মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয় ও এখনও তদবস্থাতেই আছে। প্রথমে আমরা ফুলরা ও মাদক মঙ্গলের যথা-

সাধ্য আলোচনা করিয়া, সবিতা সুদর্শন ও মহিলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

'ফুলরা'—ফুলরা ১২৭৫ সালে রচিত হইয়াছিল। ১৩০১ সালে সমীরণে সর্ব্বপ্রথম ও অদ্যাবধি সর্ব্বশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। ফুলরা একখানি ক্ষুদ্র বিয়োগান্ত প্রেমকাব্য। রচনার গুণবৈচিত্র্যের হিসাবে আখ্যানবস্তু সামান্য। অন্যান্য প্রেমকাব্যে বর্ণিত ঘটনা হইতে ফুলরার ঘটনাবলী বেশী পৃথক্ নয়। তবে ফুলরার আখ্যানভাগের গঠনপ্রণালী কিছু নূতন এবং সেই গঠনপ্রণালী সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব। আখ্যানভাগ বর্ণনা করিতে করিতে সুরেন্দ্রনাথ দার্শনিকের উচ্চাসন গ্রহণ করিয়া বহুগবেষণাপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব সকল সরল সুখপাঠ্য শ্লোকসমূহে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফুলরার এক একটা পরিচ্ছেদ সারগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। কবি একস্থলে কাল সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে ধনীর সহিত দীন দুঃখীর কিরূপ তুলনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে জানা যাইবে—

কেহ কাল কাটে, কারে কালে কাটে হায়,
কালের শকট দ্রুত ধায় ;
গৌরব গর্জ্জনে কেহ আরোহিয়া যায়
দীন কেহ চাপা পড়ে তায়।

এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে সুরেন্দ্রনাথের প্রেম, কাল ও রূপ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য আছে, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

প্রেম সম্বন্ধে——

"কন্দর্প কি পেয়েছিলে হৃদয় এমন,
বিন্ধে না কুসুম শর যায় ?
তোমার মধুর বিষ রস আস্বাদন
আছে কি যে কখন না পায় ?
না ফুটিতে শ্মশ্রু কারু আগে প্রেম ফুটে,
কারু প্রেম জাগে শ্মশ্রু সনে,
হায় হাসিবার কথা, কারু প্রেম ফুটে,
শ্মশ্রু হয় ধবল যখনে !"

কালের অসাধ্য কিছুই নাই। কালের সর্ব্বত্র সমদর্শন। কাল মহা বলবান্। সেই কাল সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন——

"কিছুই ছিল না, ছিল তব অবস্থান,
রবে, কিছু রহিবে না আর ;
তুমি কাল বলবান্,
কি অসাধ্য অসাধ্য তোমার ?
রবি শশী কাঁটা দুটি ঘুরাইয়া করে
কি কৌতুক কর প্রদর্শন !
সোনা রূপা কর ধূলা পরশের ভরে
ইন্দ্রজালী কোথায় এমন ?"

কিন্তু পরক্ষণেই কবি বলিতেছেন, যে কাল সোণা রূপাকে ধূলায় পরিণত করিতে পারে, যাহার মত ঐন্দ্রজালিক আর কেহই নাই, সে একটি কার্য্য সম্পাদনে কেবল অক্ষম। কবি বলিতেছেন—

"গলাও ভূধর, সিন্ধু জমাও গিরিতে,
ব্যাঘ্র চরে পূর্ব্বের নদীতে !
সব পার কাল, তুমি পার কি মুছিতে,
প্রেমস্মৃতি প্রেমীর হৃদিতে ?"

রূপ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের মন্তব্য কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া ফুলরার কথা শেষ করিব।

"নাই যার সেই বলে রূপ কিছু নয়,
এলো গেলো ক্ষণিক প্লাবন,
চির নব, যদিও না চিরদিন রয়,
তথাপি সে রূপ পুরাতন !
প্রকৃতির বিস্তৃত বিনোদ আবরণ !
বিশ্বপটে স্নেহের মাৰ্জ্জন !
রূপ, তুমি প্রণয়ের অগ্রজ নন্দন,
কর যত্নে পিতার পালন।
রূপ-বেদী পরে প্রেম উপহার দিয়া
উপাসিব পুলকে ধাতায় ;
পাষাণ কাষ্ঠের বেদী কি কায রচিয়া ?
কি কায বা পট প্রতিমায় ?"

সুরেন্দ্রনাথের মাদক মঙ্গল একখানি রূপক কাব্য। সমীরণের প্রথম বর্ষে, সুধী সমীরণ-সম্পাদক উহা বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি রীতি নীতির অনুকরণ করা আমাদের দেশে সংক্রমিত হয়। বলা বাহুল্য, অধঃপতিত বাঙ্গালী অগ্রেই ইংরাজের কুরীতি কুনীতির অনুকরণ করিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইল ও আপনাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার গরিষ্ঠ শেখরে উন্নত মনে করিয়া অহঙ্কারে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইল। আবকারী মহল একচেটীয়া করিয়া বাঙ্গালী অপূর্ব্ব রসের আস্বাদনে স্বীয় রসনাকে অমৃতসিঞ্চিত মনে করিল। সুখের বিষয়, ভারতের এহেন দুর্দ্দিনে, সুরাপ্লাবিত ভারতে সমাজমূলের শিথিলতার দিনে সেই সুবিখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার ও আলোচ্য কবি সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও চেষ্টায় সুরানিবারিণী সভা নামে এক সভা গঠিত হয়। সে সভায় সুরাপানের অপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইত। অধ্যাপক প্যারীচরণ উহার সভাপতি ছিলেন। এই সময়েই শুভক্ষণে সুরেন্দ্রনাথের 'নবোন্নতি' নামক আখ্যায়িকা ও 'মাদক মঙ্গল' রূপক কাব্য রচিত হয়। প্যারী বাবু প্রিয় ছাত্রের এই আখ্যায়িকা ও মাদক মঙ্গল দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করেন। এই স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি যে, বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের সুযোগ্য অভিনেতা ৺ মহেন্দ্রলাল বসুর তত্ত্বাবধানে কিছুদিন পূর্ব্বে এই মাদকমঙ্গল 'মরকত' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। মাদকমঙ্গলে পাঠক দেখিবেন—

"বিশ্বসীমা প্রান্তভাগে ভয়ময়
তমসিন্ধু ; তার পারে কালের নিলয় ;
রবি শশী সে পুরে না প্রবেশিতে পারে,
সে তম সাগর ঘোর, লঙ্ঘিবারে নারে,
অপ্রিয় শীতল লোক ;—কায়া পরিহরি
লোক বাসে যায় যথা ছায়া দেহ ধরি ;
স্থানে স্থানে শত নীল সৌদামিনী জ্বলে,
আন্ধার না হরে, মাত্র দহে পাপিদলে।
শ্রুত মাত্র, নিপীড়িত পাপীর রোদন,
আর শ্রুত বৈতরণী নদীর গর্জ্জন !

হেন পুরে আপন সভায় একদিন
অনুচরগণ সহ শমন আসীন।"

শমন অনুচরগণের সহিত বসিয়া আলোচনা করিতেছেন, কেন এখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধের পরিবর্ত্তে সুকুমার নবীন যুবকগণ দলে দলে শমন-ভবন পূর্ণ করিতেছে? তাহারা কি বৈরাগ্য অবলম্বন করিল? না—ধরাধামে সুখ-বিলাস একেবারেই নাই কিম্বা কোনও শমনকিঙ্করের কার্য্যদক্ষতায় কৃতান্তপুরের এ সকল উন্নতি হইতেছে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার দক্ষতার জন্য আমি উচিত পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি।

"শমন বদনে হেন বচন বিন্যাস
ভীষণ অশনি শত নাদিল আকাশ,
জলনিধি জ্বলিল, টলিল গিরিশির,
দ্বিপ্রহরে মধ্যাকাশে মলিন মিহির।"

কৃতান্তমুখে এই পুরস্কার প্রাপ্তির কথা শ্রবণমাত্র ব্যাধি, বিগ্রহ, বাত্যা, দুর্ভিক্ষ ও মাদকতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান শমন কিঙ্কর কিঙ্করীগণ পুরস্কার-লাভাশয়ে স্বীয় স্বীয় গুণগরিমা প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে মাদকতা-নাম্নী শমনকিঙ্করী শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া কৃতান্তদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। নিম্নে প্রত্যেক শমনানুচরের কার্য্যপারদর্শিতার পরিচয়োক্তির দুটি একটী উদাহরণ দিয়া মাদকমঙ্গল আলোচনা শেষ করিব। এস্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি যে, নটকবি গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলার পাপের সভার সহিত মাদকমঙ্গলের যমের সভার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সাধারণে সুরেন্দ্রনাথের উপর কটাক্ষপাত করিবেন না, স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এ কটাক্ষ-পাতে কুণ্ঠিত হইবেন। চৈতন্যলীলা প্রণয়ন কালে মাদকমঙ্গলের কবি জীবিত ছিলেন না, তবে মাদকমঙ্গল অপ্রকাশিত ছিল। চৈতন্যলীলা প্রকাশের বহু পরে সমীরণে মাদকমঙ্গল প্রকাশিত হয়। সমীরণের পাঠক-গণ পাছে তুলনায় সমালোচনে ভ্রমে পতিত হন, তাই সমীরণ সম্পাদক উক্ত সঙ্কেত করিয়াছেন।

শমনকিঙ্করগণের প্রতাপের বিষয় নিম্নে কিছু দেওয়া গেল—

ব্যাধি মূর্ত্তিমান্ হইয়া বলিতেছে—

"সিকন্দর, আকবর, বোনাপার্টি বংশধর,
আর আর কত কব নাম?

নর পুরন্দরোপম, বধি সবে কীট সম,
প্রেরণ করেছি তব ধাম।
যথা জীব আমি তথা, কায়া সনে ছায়া যথা,
ভ্রমি বনে প্রান্তর নগরে,
বিশ্বক্ষেত্র সুবিশাল, চরে জীব পশুপাল,
শুধু মম মৃগয়ার তরে।

এই ব্যাধির উক্তির শেষ ভাগে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক নব বৈদ্য-দলের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সে কটাক্ষ কবির কথায় কেমন ফুটিয়াছে দেখুন,—

বঙ্গধামে বিশেষতঃ, নব বৈদ্য দল যত,
সবে করে সাহায্য আমার।
মম আক্রমণ তরে, দৈবে যদি কেহ তরে,
তাদের ঔষধে নাহি ত্রাণ!
হেন সুসংযোগ ভরে, যদি কোন জন তরে,
জেনো তারে ধাতা কৃপাবান।
কোন কোন নরে বটে, আমার বিলম্ব ঘটে,
বৈদ্য কর্ণ সমাধে সম্ভব!

বিগ্রহের উক্তি—

ছিল নর শূলকর, অসি ধনুঃশর,
মম উপদেশে ধরে
ন্যায় নিধন সাধন, না দেখে তেমন,
কামান সৃজছি পরে।
দেখ, গ্রন্থ ইতিহাস, মহিমা প্রকাশ,
কেবল আমার ন্যায়,
পাবে দেখিতে কেমনে, বিনা প্রয়োজনে,
রণে নর নাশ পায়!

বিগ্রহ না থামিতে থামিতে— বাত্যা কহে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে—

আমি ছাড়ি যখন হুঙ্কার ধরা ধরাধর পারাবার
সভয়ে কম্পিত কায়।

শিশু বৃদ্ধ নর নারীগণে ধীরে ধীরে বধি এক সনে
পাখী শাখী না এড়ায়।

দুর্ভিক্ষ কহিল,—

যদি শশী দেখেনি বদন,
নগ্নকায় ধায় হেন কুলবতীগণ!
নর জাতি করে অভিমান,
দয়াবান্ নাহি জীবে তাহার সমান,
সে গর্ব্ব করেছি আমি ক্ষয়,
পুত্রমুখগত গ্রাস মাতা কাড়ি লয়।
কেহ হয়ে ক্ষুধায় বিকল,
শিশু সুতে বধিল আছাড়ি ধরাতল!
কেহ মুষ্টি তণ্ডুলের দায়,
বিক্রয় করিল স্বীয় প্রেয়সী জায়ায়!
সুকুমারী দ্বিজের কুমারী,
আহার কারণ হল যবন কুমারী!

মাদকতা——

হিন্দুর মহিলা সতী বিখ্যাত ধরায়
সে গর্ব্ব এখন নাই আর
দেখ—বারাঙ্গনা দল, বঙ্গে না কুলায় স্থল,
নগরে শোভিছে তারাকার।
চিরদিন ব্যভিচার কিঙ্কর আমার।
হিন্দু যুবাগণ সবে মাতিয়া আমায়,
জায়া ছেড়ে আরাধে বেশ্যায়;
রসাল ছাড়িয়া হায়, মজে বিম্ব লালসায়,
কুলস্ত্রী কুলটা হয় তায়
তরী স্থির না রয় কাণ্ডারী নাই যার!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শমনপ্রদত্ত পুরস্কার মাদকতারই প্রাপ্য হয়। এই মাদকমঙ্গল সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিয়া সমীরণসম্পাদক ইহার বিষয় যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ দেওয়া গেল—

"মঞ্জুকুঞ্জে যিনি বিরহিণীর বিরহে তপোবনে ঋষিকন্যার পূর্ব্বরাগে কবি-

কল্পনা লীলাময়ী দেখিয়াছেন, তিনি, দুর্দান্ত দুরন্ত কালান্তকর সভ্যাস ব্যাধি বিগ্রহ বাত্যা দুর্ভিক্ষের সম্মিলনে কবিকল্পনা কি অপূর্ব রঙ্গ করিয়াছে দেখুন। মাদকমঙ্গল পড়িয়া বুঝিতে বাকি থাকে কি কবিকল্পনা নীরস মরুভূমেও ফুল ফুটাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, ১২৭৫ সালে ফুলরা ও সবিতা সুদর্শন যমজ জন্ম গ্রহণ করে। ফুলরার যথাসাধ্য আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, এক্ষণে সবিতা সুদর্শনের কিছু আলোচনা করিব। এই সবিতাসুদর্শন পুস্তকাকারে দুই চারি খানি পাওয়া যায়। ফুলরার ন্যায় সবিতা সুদর্শনও একখানি ক্ষুদ্র বিয়োগান্ত প্রেমকাব্য। তবে এখানিকে এক খানি দার্শনিক কাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় কাব্যভাণ্ডারে সবিতাসুদর্শন একটী ক্ষুদ্র অত্যুজ্জ্বল রত্ন। এই ক্ষুদ্র কাব্য মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান ও গভীর গবেষণার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সবিতা সুদর্শনের প্রাচীন ব্রাহ্মণ কবিতার ভাবে অস্তপ্রায় মরীচিমালীর শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যে আদিত্যস্তব করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী! নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেলঃ—

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন——

*   *   *

"কি সুষমা শোভা হল, প্রথমে যখনে
হলে ভানু, শূন্যে বিভাসিত,
বিকসিত বিশ্বকুল বিচিত্র বরণে,
সিত, পীত, হরিৎ, লোহিত।
হে লোক-পুলক, প্রিয় আলোক-কারণ!
তুমিই জনক সুষমার,
দৃশ্যের বরণ তুমি, দর্শক নয়নে
সব তম বিহনে তোমার।
রঙ্গিন কিরণ স্রোতে সুখে করি স্নান,
পায় সবে বর্ণ আপনার,
এক বিভা কি বিচিত্র রূপের বিধান
সব সম বিহনে তোমার।

দীধিতি নিধান! দীপ্ত দেব দৃশ্যমান :
পালক জীবন উষ্ণতার,
বিশ্ব আত্মা বৈশ্বানর বেদে করে গান,
সব শব বিহনে তোমার।
অসীম আকাশ ক্ষেত্রে বালক ক্রীড়ায়
সদা তব মণ্ডল ভ্রমণ ;
রাশি হতে রাশি পরে ললিত লীলায়,
পরশিত কাঞ্চন চরণ।
সুলোহিত, পীত, সিত, বিচিত্র বিভায়
চারিপাশে নাচে গ্রহগণ,
বাসনিত ভৃগা সম লুকায় ধরায়,
তোমায় করিলে দরশন।
এলোচুলে হেলে দুলে মিলে করে করে
আগে আগে নাচে হোরাগণ,
একচক্র রথ চলে, চলে তার পরে,
পরে পরে ঋতু ছয় জন।

* * * *

কীলক সমান বলে পণ্ডিতে তোমায়,
পেয়ে যার আলম্বন বল,
বেগে বিঘূর্ণিত সবে আপন কক্ষায়,
ছোট বড় লোক চক্র দল।"

উপরোদ্ধৃত কবিতা কয়েকটীতে বিজ্ঞানবিদেরা দেখিবেন যে, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই দলভুক্ত। সবিতা সুদর্শনে সুদর্শনের ও সবিতার রূপ বর্ণনায়, সুদর্শন-অধীত শাস্ত্র সমূহের বিবরণে, কালের কার্য্য নিরূপণে, সৌন্দর্য্যের প্রকৃতি অন্বেষণে, পার্থিব প্রেমের সহিত সুরঞ্জিত পায়সের রূপক বর্ণনায় ও পরলোক যাত্রার পাথেয়ের নির্দ্ধারণে অপূর্ব্ব কবিত্ব, অপূর্ব্ব বিজ্ঞতা ও এক অমানুষী প্রতিভা লক্ষিত হয়। তাহার চচারিটি নমুনা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সুদর্শনের অধীত গ্রন্থ বিবরণে,—

পুরাণ পাদপ ছায়া সব তাপ-হর
কাব্যফুল বিকসিত তায়
মাঝে মাঝে ব্যবচ্ছেদ স্মৃতির সুন্দর
শোভে বনস্পতি সংহিতায়।
কি চারু মণ্ডপ চয় সাজে পরে পরে
দর্শনের লতা বিজড়িত
প্রতি বৃক্ষে প্রতি পাখী গায় শিরপরে
"তত্ত্বমসি' 'তত্ত্বমসি' গীত।

সবিতার রূপ,—

যে কিছু সুন্দর সৃষ্টি নয়নে লক্ষিত
যে সুন্দর মনে গড়া যায়
সে সব সুন্দর হৃদে করিয়া সঞ্চিত
ভাবিলে বুঝিবে সবিতায়।

* * * *

যৌবনে কামিনী শোভা যত হতে পারে,
ত্রুটি তার নাই সবিতায়,
লাবণ্যে ভূষিত তনু বিনা অলঙ্কারে
চাই শুধু সিন্দুর সিঁথায়।

রূপবর্ণনার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিতা আর কি হয়, আমার জানা নাই।

কালের কার্য্য—

দিবা নিশা, সিতাসিত, দুই পাখা ভরে,
সময় বিহঙ্গ উড়ে যায়;
এহেন কি আছে কেহ এ অবনীপরে,
সে না যারে হাসায় কাঁদায়?
হেম-কান্তি-কায় সুতে দেয় অঙ্কপরে,
পিতা মাতা হেসে ঢলঢল,
কৌতুকে অলক্ষ্য পাখী নেয় পুনঃ হরে,
আর না শুকায় আঁখিজল।
বালক ধূলায় খেলে, যুবতী যুবায়,
প্রাচীনের খেলা কাঞ্চনের

নীরবে সে পাখী ডাকে শুনিবারে পায়,
ক্ষান্ত হয় খেলা সকলের।

লোকান্তরে যাইবার পাথেয়—

দেশ হতে গমন করিতে দেশান্তরে,
পাথেয়ের হয় প্রয়োজন,
লোক হতে গমন করিতে লোকান্তরে
পাথেয় বিষয় বিসর্জ্জন।

নিম্নে যুবাগণের চাতুরী প্রতারণা সম্বন্ধে দুটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—

সুধীর স্থবিরগণ রয় মৌনানন,
অতিবোধে, অতিবোধহীন,
বিফলে চাতুরীখেলা খেলে যুবাগণ,
প্রাচীনেরা চাতুরী প্রাচীন।
প্রতারণা ফণী তুমি দ্বিফণা ভূষিত
আগে পাছে সমান নিধন,
প্রতারিত হয় বটে প্রথমে দংশিত,
মরে পরে প্রতারক জন।

সৌন্দর্য্যকে আবাহন করিয়া কবি বলিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বলি,

পূর্ণচিৎময় নাই ক্ষয় বৃদ্ধি যার,
পূর্ণানন্দ চিৎময় জন;
তব পূর্ণ অধিষ্ঠান কেমন তাহায়
হায় না দেখিল এ নয়ন!

এই স্থানে সবিতা সুদর্শনের কথা শেষ করিলাম।

ক্রমশঃ

শঙ্কর প্রসঙ্গ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

চিদম্বর হইতে বহির্গত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে কলম্বো মেলে কুম্ভকোণমে আসিলাম ও একটী ঝটকা ভাড়া করিয়া একটী ছত্রে আসিয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতে একখানি গাড়ী ডাকাইয়া সহর ভ্রমণে বহির্গত হওয়া গেল। কুম্ভকোণম অতি প্রাচীন নগর। ইহা বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অদ্যাবধি বিখ্যাত। কাঞ্চীর পতনের পর ইহাই দক্ষিণদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শঙ্করের সময়েও কুম্ভকোণম অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। শুনা যায়, তিনি এখানে আসিয়াছিলেন ও নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। এখানে একটী শঙ্কর মঠ আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর নহেন। শঙ্করের শিষ্য প্রশিষ্য মধ্যে কেহ ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মঠস্বামীর নিকট শঙ্কর সম্বন্ধে কিছু বিশেষ জানিবার আশায় মঠদর্শনে প্রথমেই বহির্গত হইলাম, পরন্তু আমাদের সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। মঠস্বামী শঙ্করাচার্য্য তখন ভ্রমণোপলক্ষে সেলাম জেলায় চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং মঠ মাত্র দর্শন করিলাম, শঙ্কর সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না।

মঠটী একতলা দুই মহল প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত চূণকাম করা একটী বৃহৎ অট্টালিকা। দুই মহলে দুইটী পাকা প্রাঙ্গণ। প্রথম মহলের প্রাঙ্গণটী বেশ বড়, দ্বিতীয় মহলের প্রাঙ্গণটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, উহার মধ্যে একটী প্রস্তরময় ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরটী চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের। শিবলিঙ্গটী এক্ষণে মন্দিরে নাই, উহা শঙ্করাচার্য্য নিজসঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মন্দিরটী বন্ধ। দ্বারে দুইটী বা তিনটী বড় বড় তালা লাগান এবং গালা দিয়া শিল মোহর করা। মন্দিররক্ষক মুখে শুনিলাম, মূল্যবান্ তৈজস পত্র উহার ভিতরে রক্ষিত রহিয়াছে। মঠের মহল দুইটী এরূপ ভাবে পরস্পর সংলগ্ন যে, দুইটিই একটী প্রশস্ত পথের ধারে পড়িয়াছে ও ইহার যতগুলি গৃহ আছে, প্রায় সব গুলিই পথের পার্শ্বে অবস্থিত। মঠে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কেবল একটী দ্বারবান ও কয়েকটী ভৃত্য রহিয়াছে। এ সময়ে যে এখানে কোনরূপ অনুষ্ঠান হয়, তাহা বোধ হইল না।

যাহা হউক, মঠের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। ইহার আয় সামান্য

হইলেও তাহাতেই ইহার প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলান হয়। বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক, ইহা এক কালে অতি প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। শঙ্করের সময় ইহা কাঞ্চীপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হায়দার আলীর অত্যাচার ভয়ে মহারাষ্ট্রীয় রাজা প্রতাপ সিংহের সাহায্যে কুম্ভকোণমে উঠিয়া আসিয়াছে। যাদবপ্রকাশ যতি বোধ হয় এই মঠেরই একজন আচার্য্য ছিলেন। ইঁহার নিকট রামানুজ প্রথম দার্শনিক শিক্ষা লাভ করেন। একদিন রামানুজ তাহার মুখে প্রসঙ্গক্রমে বিষ্ণুর প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য শুনিয়া ইহাঁর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং পরে বিচারে পরাজিত করিয়া গুরুকে স্বমতে আনয়ন করেন। তদবধি এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে এই মঠের যশো রবি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। মঠটী শৃঙ্গেরীমঠের শাখা বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার সহিত উক্ত মঠের যে, বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শুনিলাম, বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য অল্পবয়স্ক একটী যুবক, তাঁহার পাণ্ডিত্যও উল্লেখযোগ্য নহে। যাহা হউক, এই মঠের বিদ্যানুরাগের জন্য খ্যাতি আছে। গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ইঁহাদের নাই। বিলাত প্রত্যাগত হিন্দুকে শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত বিধি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া সমাজে লইতে ইঁহারা অনুমোদন করেন। পাশ্চাত্য জ্যোতিষের ঔৎকর্ষ স্বীকার করিয়া আমাদের পঞ্জিকার বর্ত্তমান ভ্রম সংশোধনেও ইঁহাদের সহানুভূতি আছে। আমাদের যাহা কিছু সব ঠিক, ম্লেচ্ছ বা অপরের নিকট শিখিবার কিছু নাই, এরূপ উপেক্ষা ইঁহারা প্রদর্শন করিতে চাহেন না। ইঁহাদের যুক্তিযুক্ত আচার ব্যবহার ও উদারতার জন্য পাশ্চাত্য বিদ্যাবিশারদগণের নিকটও ইহাঁরা সম্মানিত।

শঙ্করাচার্য্যের মঠ দর্শনানন্তর আমরা অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করিলাম। কুম্ভকোণম তাঞ্জোরের রাজাদিগের অধীনে বরাবরই ছিল। এই স্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ পৌরাণিক কথা শুনা যায়। প্রলয়কালে মহামেরুর গাত্রে এক ঘড়া অমৃত শিকায় করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। ক্রমে প্রলয়বারি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে কলসীটীও সেই প্রলয়জলে ভাসিতে ভাসিতে বায়ু বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ দিকে আইসে। পরে জল শুষ্ক হইলে অমৃত কুম্ভটী এই স্থানে পতিত হইয়া থাকে। কুম্ভের কানাটী ক্রমে ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহা হইতে অমৃত নিঃসৃত হইতেছিল। ভগবান্ শূলপাণি অমৃত অন্বেষণ করিতে করিতে এই স্থানটী অমৃতসিক্ত দেখিয়া এই

থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদবধি ভগবানের নাম কুম্ভেশ্বর এবং ইহা তাঁহার স্থান বলিয়া ইহার নাম কুম্ভকোণম হইল। এখানে আজ কাল ৬টী মন্দির দর্শনযোগ্য। ১। কুম্ভেশ্বর স্বামী। ২। সোমেশ্বর স্বামী। ৩। নাগেশ্বর স্বামী। ৪। শার্ঙ্গপাণি স্বামী। ৫। চক্রপাণি স্বামী। ৬ষ্ঠ। রাম স্বামী। প্রথম ৩টী শিবমন্দির শেষ ৩টী বিষ্ণুমন্দির। শৈবমন্দিরগুলি চোলবংশীয়দিগের দ্বারা ৭ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত, এইরূপই সাধারণে মনে করেন। প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণ স্বামী নামে কোন ব্যক্তি শিবমন্দিরগুলির সংস্কার করেন। অদ্যাবধি তাঁহার একটী মূর্ত্তি উক্ত দেবালয়ের মধ্যে রহিয়াছে। এখানে তাঁহার পূজাও হইয়া থাকে। সহরটী ব্রাহ্মণপ্রধান। এখানে একটী বিখ্যাত কলেজ আছে; অনেক দূরদেশ হইতে এখানে ছাত্রেরা পড়িতে আসে। লোকসংখ্যা কিছু কম ৫০,০০০ হাজার। সহরটী বেশ পরিষ্কার; পথঘাটও প্রশস্ত উভয় পার্শ্ব সুন্দর অট্টালিকাদিতে শোভিত। বাণিজ্যও বেশ প্রবল। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর এখানে যাতায়াত আছে। কাবেরী নদী কুম্ভকোণমের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত। এক্ষণে কিন্তু ইংরাজের খালের কল্যাণে ইহা শুষ্ক মরুভূমি মাত্র—ধূ ধূ করিতেছে। কোথায়ও উভয় পার্শ্বের গ্রাম্য জঙ্গল ইহার সংকীর্ণ তনুকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। হিন্দু আজ এই বালুকাক্ষেত্রে কূপ খনন করিয়া কূপজলে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। কূপগুলি ক্ষুদ্রকলেবর বালুকার মধ্যে খাত গর্ত্তবিশেষ মাত্র। আমরাও তাহার জলে স্নান করিলাম।

অতঃপর আমরা শ্রীরঙ্গম দর্শনে অভিলাষী হইয়া সেই দিনই বৈকালের একটী প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে কুম্ভকোণম ত্যাগ করিলাম এবং অপরাহ্ণে ত্রিচিনপল্লী নামক সুবৃহৎ ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। ত্রিচিনপল্লী হইতে একটী শাখা ইরোড অভিমুখে গিয়াছে। আমরা সেই শাখা লাইনে আবার চড়িয়া একটী ষ্টেশন পরে ত্রিচিনপল্লি ফোর্ট নামক ষ্টেশনে নামিলাম। শ্রীরঙ্গম এই ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূর। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্রীরঙ্গমে পঁহুছিয়া এবং অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এরূপ বৃহৎ মন্দির ও এরূপ সুবন্দোবস্ত খুব অল্পই দেখা যায়। ইহা বৈষ্ণবগণের যেমন আদরের স্থান, তেমনিই গৌরবের স্থল। রামানুজ শেষ জীবন এখানেই অতিবাহিত করেন। এই মন্দিরসংক্রান্ত বিবরণ দক্ষিণ দেশের ধর্ম্মমত ও রাজকীয় বৃত্তান্তের সহিত নানা

প্রকারে জড়িত। শঙ্করপ্রসঙ্গে ইহার স্থান নাই বলিয়া আমাকে ইহার বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইল।

পরদিবস প্রাতে পুনরায় ত্রিচিনপল্লি ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া রামেশ্বর যাত্রা করিলাম। কলিকাতা হইতে যে মাদ্রাজ মেল ছাড়ে, তাহা মাদ্রাজে পঁহুছিবামাত্র আর একটী মেল গাড়ী সাধারণ ইণ্ডিয়ান লাইন দিয়া টিনেভেলি পর্য্যন্ত যায়। তথা হইতে ষ্টীমার যোগে কলম্বো যাওয়া যায়। এজন্য এই মেল গাড়ীর নাম কলম্বো মেল। আমরা আবার এই কলম্বো মেল ধরিলাম, এবং মধ্যাহ্নে মদুরায় আসিলাম। রামেশ্বর যাইতে হইলে মদুরা হইতে পাম্বান পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলে যাইতে হয়, আমরা মদুরায় অবতরণ করিয়া সেই পাম্বানের গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। নানাবিধ অনির্ব্বচনীয় শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে অপরাহ্নে আমরা মণ্ডপমে পঁহুছিলাম। মণ্ডপমের নিকট স্বভাবের শোভা এতই মনোহর যে, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। রেলটী মণ্ডপম ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে অল্পক্ষণের জন্য আসিয়া আবার পিছু হাটিয়া অন্য পথে সাগরকূলের দিকে যাইল। আমরা তথায় অবতরণ করিয়া একটী ছোট ষ্টিমারে চড়িলাম। ষ্টিমার খানি সাগরবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে পাম্বান নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপাভিমুখে চলিল।

প্রসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দির এই ক্ষুদ্র দ্বীপে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪ মাইল ও প্রস্থে ৬ মাইল। রামেশ্বর শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ; ইহা অতি প্রাচীন তীর্থ। রামেশ্বর দ্বীপে ও ইহার নিকট ভারতের তীরে রামনাদের সেতুপতি রাজার রাজ্য মধ্যে রামেশ্বর শিব ব্যতীত অনেকগুলি তীর্থ আছে। তাহাদের বিবরণ স্কন্দপুরাণোক্ত সেতুমাহাত্ম্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিষ্ণু, বিষ্ণু অবতার শ্রীরামচন্দ্র, শিব, দুর্গা প্রভৃতি সকল দেবতারই মন্দির আছে, সকলেরই পৌরাণিক কথা আছে। এখানে রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি যেমন বর্ত্তমান, রামচন্দ্রের কীর্ত্তিসূচক তাঁহার নিজেরও মূর্ত্তি তদ্রূপ বিরাজমান। সেতুমাহাত্ম্যে রামেশ্বর তীর্থ সংক্রান্ত ২৪টী প্রধান তীর্থ ও ১৭টী উপতীর্থের উল্লেখ আছে। উক্ত পুরাণের মতে এই সমস্ত তীর্থসেবার ফল কেবলই সর্ব্ববিধ পাপমোচন নহে, ইহাতে সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। নানাবিধ ঘটনার উল্লেখ দ্বারা উহা দৃঢ় বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, আবহমান কাল পর্য্যন্ত প্রায় সকল মাহাত্ম্য ও

মহাপ্রাণ ব্যক্তিই এই বিশ্বাসে এই তীর্থ সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহাও বিজ্ঞাত করা হইয়াছে। মন্দির প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন, বস্তুতঃই এই তীর্থ এই ভাবেই পরিসেবিত হইয়া আসিতেছে। রামেশ্বরে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ঘটনা নানাপ্রকারে বিজড়িত। শিব ও বিষ্ণুর যত প্রধান প্রধান ক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে ইহা অন্যতম। রামেশ্বর সম্বন্ধে বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক। শঙ্কর প্রসঙ্গে সে সব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উহা বর্ণনে বিরত হইলাম। শঙ্কর এ স্থলে আসিয়াছিলেন, তিনি এস্থলে তাঁহার মতও প্রচার করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তৎসম্প্রদায়ভুক্তগণ প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে এস্থান দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন, এখনও তৎসম্প্রদায়েরই এখানে প্রভুত্ব, এখনও এখানে বহু সন্ন্যাসী অবস্থান করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়িগণও এ স্থানে আসিয়া থাকেন। মোট কথা, ইহার প্রাচীনত্ব ও প্রতিষ্ঠা সর্ব্বমান্য। দুঃখের বিষয়, বিশেষ অনুসন্ধানেও এখানে শঙ্করের কোন স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর আমরা রামেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

পুরী হইতে বহির্গত হইয়া ভারতের পূর্ব উপকূলের অনেক গুলি প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিয়া শঙ্কর সম্বন্ধে যাহা অবগত হইলাম, তাহার কিঞ্চিৎ পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এক্ষণে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। শঙ্করের জন্মভূমি, ঋষ্যশৃঙ্গের সাধনার স্থান তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠ প্রভৃতি যাবতীয় স্থান দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে। বর্ত্তমান কালে শঙ্কর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত স্থান সমুদয় সন্দর্শন না করিলে এবম্বিধ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং রামেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনর্বায় মদুরায় আসিলাম। তথায় মীনাক্ষী দেবী ও সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়া পুনরায় কলম্বো মেলে সন্ধ্যাকালে ত্রিচিনপল্লি ষ্টেশনে আসিলাম। তথা হইতে উত্তরপশ্চিমাভি-মুখে ইরোড নামক একটী জংসন ষ্টেশনে মধ্য রাত্রে আসিয়া মান্দ্রাজ হইতে কলিকট অভিমুখী গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। অতঃপর প্রাতে এই পথে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে পোড়ানুর জংসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণভারতের পশ্চিম উপকূলের সন্নিকটস্থ সোরানুর নামক জংসনে মধ্যাহ্নে আসিলাম। সোরানুর মালাবার বা কেরল দেশের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। সোরানুর হইতে পশ্চিম সমুদ্রোপকূলের উপর দিয়া দক্ষিণ দিকে একটী রেল লাইন কোচিন সহরের নিকট এরনাকুলাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমি রেলগাড়ীতে আরো-

হণ করিয়া অপরাহ্নে ত্রিচুর নামক স্থানে আসিলাম। শঙ্কর এই ত্রিচুরের নিকটবর্ত্তী কালতি (বর্ত্তমান কালাডি) নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত স্থানই মালাবার বা কেরল দেশের অন্তর্গত। সুতরাং শঙ্কর একজন মালাবারী বা কেরলদেশবাসী। শঙ্করের বিষয় জানিতে হইলে শঙ্কর যে দেশের লোক, সে দেশের কথাও জানা আবশ্যক। জাতীয় সংস্কার যেমন সাধারণতঃ মানবহৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, দেশীয় সংস্কারও তদ্রূপ সাধারণতঃ মানবহৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করে। অধিক কি একজাতীয় ব্যক্তিগণ ভিন্নদেশবাসী হইলে কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। তাহাদের সংস্কারগত পার্থক্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শঙ্কর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত সুতরাং ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার তাঁহার থাকিবারই কথা কিন্তু দেশভেদে তাঁহার সে সংস্কারে যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার বিচিত্রতা কি ! কে বলিতে পারে, তাঁহার জীবনেও তাঁহার প্রচারিত মতে সে সংস্কারের কোন ছায়া পতিত হয় নাই ? প্রকৃত প্রস্তাবে মালাবার দেশ, ভারতের অন্যান্য দেশের মত নহে। একজন সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিতে করিতে মালাবারে আসিলে সেই পর্য্যটকের চক্ষে অনেক নূতন ঠেকিবে। এখানেও সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বর্ণচতুষ্টয়, এখানেও সেই বেদ, সেই যজ্ঞ, এখানেও সেই দেব দেবী, সেই পূজা পাঠ, এখানেও সেই সদাচার, সেই নিষ্ঠা, তথাপি এখানে নূতনত্ব আছে, এখানে বিশেষ আছে, জানিবারও অনেক বিষয় আছে। শঙ্কর যে সেই বৈশিষ্ট্যের কোন অংশভাগী হন নাই, অথবা তাহার কোন আভাস তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হয় নাই, এরূপ ভাবিবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। যাহা হউক, আমরা প্রথমে মালাবার দেশ, তৎপরে তথায় শঙ্করকথার আলোচনা করিব।

সমালোচনা।

Self-Knowledge অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক নূতন প্রকাশিত।

স্বামী অভেদানন্দ প্রায় ৮।৯ বৎসর যাবৎ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। ইনি বেদান্তের প্রাচীন তত্ত্বসমূহ আধুনিক শিক্ষিত জনগণের উপযোগী করিয়া এত সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণার্থ ৪।৫ সহস্র ব্যক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্ত সংক্রান্ত ইঁহার অনেকগুলি পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকখানি উপনিষদের বিশেষ ব্যাখ্যাপুস্তক বলিলেই হয়। ইহাতে প্রাচীন উপনিষৎসমূহ হইতে এক একটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়া তৎসাহায্যে আত্মতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝান হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতাগুলির বিশেষগুণ এই যে, তাঁহার ব্যাখ্যাপ্রণালী অতি বিশদ এবং ভাষা অতি সরল। যাঁহারা কটমট ভাবিয়া বেদান্তচর্চ্চায় বিরত, তাঁহারা স্বামী অভেদানন্দের এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সহজে বেদান্তের মর্ম্ম জানিতে পারিবেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বেদান্তগ্রন্থাদি পাঠেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে।

জীবতত্ত্ববিবেক। শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী শিষ্য স্বামী শ্রীমৎ যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত এবং শ্রীব্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পাণিহাটি হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নলহাটি ইঁহার জন্মস্থান—পূর্ব্বাশ্রমের নাম রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১২৮২ সালে ১৮শ বর্ষ বয়সে দারপরিগ্রহ ও ২২শ বর্ষ বয়সে হইতে ৩৯শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষক, বিদ্যালয়ের পরিদর্শক, পত্রসম্পাদক এবং আচার্য্য প্রভৃতির কার্য্য করেন। ১৩০০ সালে পত্নীবিয়োগের পর চাকরি ত্যাগ করিয়া কিছুদিন বাটীতে থাকেন—মধ্যে মধ্যে তীর্থভ্রমণ করিতেন। ১৩০৫ সালে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত হরদুই

জেলার মধ্যে সাহাবাদ নামক স্থানে স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর। ধর্ম্মসম্বন্ধে ইঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

পুস্তকখানি পাঁচশত পৃষ্ঠার উপর। সংক্ষেপতঃ বেদান্তের তত্ত্ব সরল ভাষায় বিবৃত করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গতঃ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সময়াভাবে সমগ্র গ্রন্থখানি পড়িতে পারি নাই। যতটুকু পড়িয়াছি, তাহাতেই গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্য, বিচারশক্তি, সহৃদয়তা ও উদারতা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

এ গ্রন্থখানিতে একটী বিশেষত্ব দেখিলাম। আজকাল হিন্দুশাস্ত্রের পৌরাণিক অংশ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেকেই কৃত্রিম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার শরণ লন। ইনি তাহার চেষ্টা না করিয়া প্রত্যেক পৌরাণিক তত্ত্বের মূল বেদে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদী বটেন, কিন্তু অন্যান্য বাদ এবং ভক্তি, উপাসনাদি বিচারস্থলে গোঁড়ামি প্রকাশ না করিয়া সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার একজন সাধক। এই কারণ, তাঁহার লেখা একটু শক্ত হইলেও কটমট নহে, অনেক স্থানে সরস। এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে সাধারণে উপকৃত হইবেন।

কৃষিভাণ্ডার ও গৃহস্থালী। বঙ্গলক্ষ্মীর উপহার। কাশীপুর কৃষিশালা হইতে প্রকাশিত।

কৃষিভাণ্ডার পুস্তকখানিতে কিরূপ সামান্য মূলধনে ফল ফুল ও শস্য উৎপন্ন হয়, একখানি লাঙ্গলে কি ব্যয় ও কি আয় হয়, নিট কি লাভ থাকে, তাহার সবিস্তার হিসাব এবং কোন্ সময়ে কি ফসল কি উপায়ে বপন-রোপণ করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে এরূপ গ্রন্থের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদের শিক্ষিত লোকের মতিগতি কেবল দাসত্বের দিকে না যাইয়া চাষবাস ও শিল্প বাণিজ্যাদির দিকে না যাইলে দেশের কল্যাণ নাই। আমাদের জ্ঞান যদি আমাদের দেশের উন্নতিকল্পে না লাগাইতে পারিলাম, তবে সে জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র নহে কি?

গৃহস্থালী পুস্তকখানিতে স্ত্রীশিক্ষা ও সংসার, দ্রব্যগুণ, রন্ধন, প্রসূতি ও সরল মুষ্টিযোগ এই কয়েকটী বিষয় আছে। এগুলি সকল গৃহস্থ ব্যক্তিরই উপযোগী। [illegible] পাশ্চাত্য প্রথায় স্ত্রীশিক্ষার দোষ দেখাই-

য়াছেন, এমন কি, বালিকাকে কোনরূপ বিদ্যালয়ে পাঠাইবারও তিনি বিরোধী এবং মিশনরি বালিকা বিদ্যালয় হইয়া যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা দেখাইয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়, তাহা এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় অসম্ভব। সেই জন্য আমি একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই সমালোচনা শেষ কবিব। আমার প্রতিবেশী জনৈক বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত একদিন আমাকে বলেন, দেখ, তোমরা এত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছ—কিন্তু পাড়ায় যে মিশনরি মেয়ে স্কুল রহিয়াছে, তাহা উঠাইয়া দিতে পার? আমি তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলাম, পণ্ডিত মহাশয়, আপনার বাড়ীর মেয়েরাও যে যায়—আপনি প্রথমে তাহাদের যাওয়া বন্ধ করিতে পারেন? পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, মেয়েদের স্কুল যাওয়া এখন ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় হিন্দুদের দ্বারা যত মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গল। ইহা ব্যতীত উপায় নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা এত অপদার্থ হইয়াছি যে, আমরা সামান্য চেষ্টা করিয়া তাহা না করিযা আমাদের মেয়েদের ও আমাদের ছেলেদের আমাদের ধর্ম্মের নিন্দা শুনিতে পাঠাই। আমরা কি মানুষ?

ধম্মপদ ২য় সংস্করণ মূল, অন্বয়, অনুবাদও টিপ্পনী সমেত। শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রকাশিত।

ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবের শ্রীমুখনির্গত এই ধম্মপদ গ্রন্থের পরিচয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। ইহা গীতার ন্যায় সর্ব্বদা কাছে রাখিবার জিনিষ। ২য় সংস্করণে চারু বাবু অনেকগুলি ফুটনোট সন্নিবেশিত করিয়া পাঠকের বিশেষ সুবধা কিরিযাছেন। আমাদের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় উহার প্রাপ্তিস্থান মূল্যাদি জানিতে পারিবেন। যাঁহারা এখনও এই অমূল্যগ্রন্থ একখানি করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই, তাঁহাদিগকে একখানি করিয়া কাছে রাখিতে অনুরোধ করি। গীতার ন্যায় এই গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

——

সংবাদ ও মন্তব্য।

লণ্ডন মিশনরি সোসাইটির রেভারেণ্ড শ্লেটার তাঁহার একখানি নবপ্রণীত গ্রন্থে বলিয়াছেন, ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম নিশ্চয়ই বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে * * ভারত খ্রীষ্টিয় জগৎকে আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব শিখাইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একজন স্কচ উকিলকে ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের বিবরণ সংগ্রহার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ বর্ষ এই কার্য্যে যাপন করিয়া সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যেমন নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তদ্রূপ কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদেও বিশ্বাসী কারণ, উহাই মানব জীবনের একমাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা বলিয়া তাঁহার বোধ হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত যে শুদ্ধ পণ্ডিত ও ধনী লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে, তাহা নহে, আমেরিকার অন্তর্গত দক্ষিণ ডাকোটা নামক স্থানের খনিজীবীদের মধ্যেও বেদান্তের প্রভাব খুব বিস্তৃত হইতেছে। ইহাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ ও জ্ঞানযোগাদি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। ইহাঁরা এই সকল বেদান্তগ্রন্থপাঠে বাইবেল নূতন ভাবে বুঝাইতেছেন। ইহাঁদের বিশেষ ইচ্ছা, ভারতবর্ষ হইতে এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া ইহাঁদিগকে রীতিমত বেদান্তের সাধন শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে স্বামীজির শিষ্য আর, এ, কৃষ্ণমাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। মাননীয় আনন্দচার্লু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনেক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

উক্ত স্থানে বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর স্বামী বোধানন্দ হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয়ভাব সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

সত্ত্ব না তমঃ?

(স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।)

আলোক ও অন্ধকারের বিরোধিভাব অভিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বায়ু দেবতার উপাসক এবং সম্বিদা আসবাদি সেবকদিগের ঐ বিষয়ে ভিন্ন মত হইতে পারে, পরন্তু তৎস্বজাতীয়গণ ব্যতীত আর কেহই তাহাদের মতানুসারে চলেন না।

মনে কর, আলোকসংস্পর্শহীন কোন গৃহে কতকগুলি লোককে বহুকালাবধি বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। আহা, তাহাদের কতই কষ্ট! সম্মুখে বর্ত্তমান চতুর্ব্বিধ ভোজ্যের দর্শন তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না; কেবল সৌরভ গ্রহণরূপ অর্দ্ধ ভোজনই উহাদের জন্য বিধাতা নিয়ম করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তিনী উর্ব্বশীরূপিণী রমণীর রূপরাশিও ঐ হতভাগ্যদিগের নেত্রগোলকে প্রতিভাত হয় না। কেবল মাত্র অলঙ্কারের সুমধুর ঝনৎকার শুনিয়াই প্রাণ শীতল করিতে হয়। আবার যদি ঐ রমণীর মৃদুমধুর সুললিত ভারতী কখন তাহাদের কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া থাকে, তবে তাহা দ্বারা দিদৃক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া তুলে। কিন্তু পাপ অন্ধকার কোন প্রকারেই তাহা সফল করিতে দেয় না। সে যে দিকে দেখে, সেই দিকেই তিমিরের নীলিমময়ী ছবি, সেই দিকেই বর্ণলীলার সম্পূর্ণ অভাব। যেন সব নীল সমুদ্রে মগ্ন! যেন মহাপ্রলয়ের কালরাত্রি আসিয়া ঐ কারাগারে আপন তাণ্ডব দেখাইতেছে। অমা নিশিথিনীর তুলনাও উহার সহিত হইতে পারে না— কারণ, তারকারাজির মৃদু জ্যোতিও উহাতে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু এখানে কেবল ধারাবাহী তিমিরমালা। তমোময় তম—যেন মূর্ত্তিমান্ অন্ধতমের খেলা অন্ধতম দেখিতেছে—যেন জাগ্রতেই সুষুপ্তি স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে! অভাগা বন্দী মনে মনে কত সঙ্কল্প করিতেছে; কখনও পূর্ণিমার চাঁদনী কখন বা সৌদামিনীর স্থির জ্যোতি ভাবিতেছে আবার

কালান্তরে অর্দ্ধাঙ্গিনীর সুকুমার মুখচ্ছবি ও অপত্যাদির কমনীয় মূর্ত্তিও তাহার মানসদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে—কিন্তু সে সুখময় ছবি কত-ক্ষণের জন্য ? উঠিবামাত্রই আঁধারে বিলীন—সকলেরই স্থিতিসীমা মুহূর্ত্তমাত্র ! উহাদের বাহিরে নীলতম এবং অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত বিষাদতম ! ভিতর ও বাহিরের অন্ধকার যেন মুখ ব্যাদান করিয়া সর্ব্বগ্রাসে উদ্যত ! ঐ উভয় তিমির মিলিয়া উহাদিগকে নেত্র থাকিতেও অন্ধ করিয়া জীব-দ্দশাতেই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করাইতেছে ! কিন্তু জগতে একই অবস্থা চির-কাল থাকে না। সকলই পরিবর্ত্তনশীল, সবই সাময়িক। দেখিতে দেখিতে কারাগৃহ অকস্মাৎ বিদ্যুৎ তুল্য আলোকে আলোকিত হইল—অন্ধকার কোথায় পলাইল, বন্দিগণ প্রসন্নতার উচ্ছ্বাসে মনে মনে নাচিতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া যেন বহুদিনের হারাধন করতলস্থ পাইল। আর এখন কারাগৃহে দুঃখের উত্তাপ নাই। সকলেরই মুখে হাসি, সকলেরই অভ্যন্তরে প্রসাদের চিহ্ন, প্রফুল্ল ভাব ; প্রিয় সম্ভাষণে ও প্রিয় দৃষ্টিতে সকলেই প্রেমে বিভোর। যেন মুহূর্ত্তের জন্য ঐ স্থানে প্রেমের বাজার বসিল—কারাগার প্রেমাগারে পরিণত হইল। কিন্তু এ শুভ মুহূর্ত্তও স্থায়ী হইল না ! দেখিতে দেখিতে আলোক প্রবলতম বেগে জ্বলিতে লাগিল এবং উহারই প্রভাবে আবার উহাদিগের চক্ষু অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ! উহারা যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রহিল ! আবার অভাগাদের কপাল ভাঙ্গিল !

এইরূপ ঘটনা দেখিয়া অদূরদর্শী সমালোচক বলিয়া উঠিতে পারেন যে, আলোক অন্ধকারের নাশক নহে। অবিবেকী লোকের মন এবম্বিধ ঘটনায় অবশ্যই সন্দেহে দোলায়মান হইয়া বলিবে যে, তবে কি আলোক তিমিরান্তক নহে ? যথার্থই কি সর্ব্ববাদিসম্মত আলোক ও অন্ধকারের বিরোধী ভাব যুক্তিযুক্ত নহে ? ইহা কি কেবল কবির কল্পনা মাত্র অথবা আলো-কের অর্থবাদ বা স্তাবক বচন ? না, এই বিকল্পত্রয়ই মিথ্যা ? তিনই বক্তার মূঢ়তা ব্যঞ্জক, যেহেতু মায়িক জগতে সকল বস্তুই অতিরিক্ত মাত্রায় কুফল প্রসব করে। সকল শক্তিই সীমাতীত মাত্রায় উপনীত হইলে বিপ-রীতগুণবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এই জন্যই বুঝি সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং এই নীতির আবির্ভাব। যে আলোক উপযোগী মাত্রায় তিমির নাশ করিয়া মানবচক্ষুতে নিখিল রূপরাশির প্রকাশক হয়, তাহারই পরিমাণ আবার

অত্যধিক হইলে উক্তভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়ে! অত্যধিক আলোক ও আলোকাভাব মানবদৃষ্টিতে একই লীলা দেখাইয়া থাকে।

পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণেও ঠিক ঈদৃশ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে—মূঢ়তম ব্যক্তি ও সত্ত্বগুণের অন্তিমভূমিকাগত মহাপুরুষের বহির্ব্যাপারে একতাই উপলব্ধি হয়। উভয়েই লৌকিক চাতুর্য্যে অনভিজ্ঞ, উভয়েই সভ্যতার ধার ধারে না এবং উভয়েরই বস্তুগত পার্থক্যানুভবে ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গুণযুগলের তারতম্যানুপাতে মূঢ় এবং মহাত্মারও তারতম্য হইয়া থাকে।

অজ্ঞ সমাজের নিকট সব জিনিস একই দরে বিক্রীত হয়। শুকদেবের ন্যায় মহামুনিও ব্রহ্মবন্ধু তুল্য আসন পাইয়া থাকেন, সত্যনারায়ণের কথা এবং উপনিষদের তুল্যতা সিদ্ধ হইতে কিছু মাত্র বিলম্ব লাগে না, গ্রাম্য দাদাঠাকুর আর নদিয়ার বড় পণ্ডিতের একরূপ অভ্যর্থনা হইয়া থাকে এবং কালিদাসের কবিতা ও ভাটের ভনিতার ভিন্নতা প্রতিপাদককে হস্তাহস্তির অভিনয় দেখিতে হয়।

পক্ষান্তরে প্রবুদ্ধ পুরুষের নিকট হীরক ও কাচের মূল্য পৃথক্ হয় না; স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও বিজাতির তারতম্য থাকে না; গঙ্গাজলের সহিত গোমতীর জলের তুল্যতা দৃষ্ট হয়—সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যে ভেদজ্ঞান সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর ভাবে অনুভব করিবার জন্য এবং বাড়াইবার জন্য আমাদের পণ্ডিতকুল চিন্তা যন্ত্রাদি সহায়ে নিশিদিন ব্যস্ত থাকেন, তাহারই অত্যন্তাভাব ঐসকল ঋষিপ্রবীণের অবস্থাবিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভেদজ্ঞান কম বলিয়াই আবার অজ্ঞেরা অভিজ্ঞাপেক্ষা স্থূলবিষয়ানুভবে সুখী এবং অসভ্যসমাজ সভ্যসমাজ অপেক্ষা অধিকাংশ বিষয়ে নিশ্চিন্ত। সভ্য সমাজে একজনের একমাসে যে তার-খরচ লাগে, তাহা দ্বারা দরিদ্র অসভ্যের অক্লেশে বৎসর কাটিতে পারে! সভ্যগণ অধ্যাত্মবিদ্যা রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতির জটিল রহস্য ভেদ করিতে যাইয়া নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, অসভ্যেরা এবিষয়ে উদাসীন থাকিয়া সুখে কাল হরণ করে! উঁহাদের উপাদেয় ভোজ্য রাশিতেও অরুচি প্রকাশ হয় আর ইহারা অনায়াসে লঙ্কামাত্র সহায়ে বা অসহায়ে আম বা পর্য্যুষিত খাদ্যরাশি উদরসাৎ করিয়া ফেলে! বুদ্ধি, বিদ্যাদির মার্জ্জিত সূক্ষ্মানন্দ গণনায় না আনিলে অসভ্যদল এইরূপে সভ্যদলাপেক্ষা অনেক স্থূল বিষয়ে সুখী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সভ্যতা যতই বাড়িবে, ততই অভাব জ্ঞান প্রসারিত হইয়া জনসমাজকে করতলস্থ করিবে, ততই ভোগলালসাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। বর্ত্তমান সভ্য সমাজের ব্যবহারেই উহা প্রমাণিত হইতেছে, অভাব আবশ্যকতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দিনদিন নরনারীগণকে একবারে ক্রীতদাস করিয়া তুলিতেছে। সভ্যজগতের যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই উহার হুঙ্কার, সেই দিকেই উহার অটল প্রভুত্ব দৃষ্ট হইতেছে।

অভাব জ্ঞান ও আবশ্যকতার অতিমাত্রায় বৃদ্ধিতে যে আবার জনসমাজ নিতান্ত অসবন্ন হয়, ইহা বুঝিতে বিচারশীল ব্যক্তিব অধিক সময় লাগে না। সভ্যতাভিমানী ও অপরাবিদ্যাপ্রবীণ জনসমাজ উদ্যম সহায়ে যতই কেন ভৌতিকতত্ত্বের আবিষ্কার করুন না, তাহা দ্বারা যে মনুষ্য মনের অভাব বোধ দূরীভূত হইয়া ধরিত্রী কোন কালে সম্পূর্ণ সুখ ও শান্তির বিহারভূমি হইবে, এরূপ আশা এপর্য্যন্ত বৃথা বলিয়াই মনে হয়। কেননা ভৌতিক বস্তুর প্রতীতি প্রায়ই শরীর মাত্র বা কোন প্রকার মনোবিলাস মাত্রের পুষ্টিসাধনে পর্য্যবসিত হয় এবং সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের সর্ব্বমানবেরই একমাত্র চেষ্টা যাহাতে সেই উহার সিংহের অংশ লাভ করিতে পারে। এজন্যই মহামান্য ভাগবতপ্রণেতা এই মহামন্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন যে—

যশ্চ মূঢ়তমোলোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরঙ্গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতোজনঃ॥

যে অতীব মূঢ় এবং যে বুদ্ধির পারে চলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ স্বরূপানুভবে মগ্ন হইয়াছে, সেই দুই শ্রেণীর লোকেরই সুখ প্রাপ্তি হয়, মধ্যবর্ত্তী লোকেরা ক্লেশই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। টীকাকার অবশ্য এস্থলে মূঢ়তমের অর্থ সুষুপ্ত জীব মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ বা অগ্রহণ করা আমাদের অভিরুচি সাপেক্ষ।

লৌকিক বিদ্যার প্রভাব এই যে, উহা মনের প্রসার বৃদ্ধি করে এবং পদার্থরাশির পার্থক্যজ্ঞান প্রবুদ্ধ ও দৃঢ় করিয়া মানবমনকে সূক্ষ্ম পদার্থ ও শক্ত্যাদির অনুভবে সমর্থ করিয়া দেয়। কিন্তু ঐ ভেদবুদ্ধি যে আবার পক্ষান্তরে মনুষ্যমনের সুখ ও শান্তির পরিপন্থী, ইহা অধ্যাত্ম বিদ্যার সাধারণ উপদেশ। সেজন্যই উপনিষদাদি শাস্ত্র মধুরমন্দ্রস্বরে উপদেশ করিতেছেন—

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

অর্থাৎ মহান্ ব্রহ্মাত্মাই সুখ, ভৌতিকবস্তুতে সুখ নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাত্ত্বিক ও তামসিক লোকের মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ন্যায় প্রভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও বহির্ব্বস্তুর জ্ঞানাভাব বিষয়ে উভয়েরই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তামসপ্রকৃতি মানবগণ অবিদ্যাবৃত থাকে, এজন্য পার্থিব জগতের পার্থক্য তাহারা বুঝিতে পারেনা। উহাদের মধ্যে বিবেকশক্তি বীজ অবস্থাতেই বর্ত্তমান। এজন্যই অবিদ্যা উহাদের মনে স্বকীয় আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় বিস্তার করিয়া বসে। ফল কথা, তমোগুণাবৃত মূঢ়তম ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অজ্ঞানই বস্তুগত নানাজ্ঞানের অন্তরায় হয় এবং সাত্ত্বিকপ্রকৃতিপ্রাপ্ত মনুষ্যদের সম্বন্ধে ধারাবাহী একাত্মজ্ঞান ঐ ভেদজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। ইঁহারা সর্ব্ব কারণের কারণ ধ্যান এবং অনুভবে মগ্ন হইয়া বহির্ব্বস্তুর নানাত্ব এবং পৃথক্ত্ব আর দেখিতে পান না। ঐসকল বস্তুর কারণগত একত্বেই নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া পড়েন। তমসাচ্ছন্ন লোকেরা বিবেকরূপ আলোকের অভাবেই অজ্ঞানতমে পড়িয়া থাকে এবং সত্ত্বপ্রকৃতি মহাপুরুষদিগের বাহ্য ব্যবহার ঐ আলোকের অত্যধিক বৃদ্ধিতে কতকটা অজ্ঞানিসদৃশ হইয়া পড়ে।

সত্ত্বগুণের অন্তিম ভূমিকাতে পৌঁছিলে ঈদৃশী জ্যোতির্ম্ময়ী অবস্থার আবির্ভাব হয় যে, ঐ নিরাময় লোকোত্তর পুরুষের ব্রহ্মজ্যোতি ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার তখন বোধ হয়, যেন চতুর্দ্দিকে একমাত্র জ্যোতিরই লীলাখেলা, উহারই রাজত্ব, উহারই প্রভুত্ব। যেন ঐ জ্যোতিই সংসার ছাইয়া ফেলিতেছে এবং উহাতেই একে একে সকল পদার্থ লীন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে রবি শশী আদি নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ঐ অমৃতপ্রভাতে মিলাইয়া যায়। উপলময় হিমাচল ও জলময় সমুদ্র জ্যোতির্ম্ময় হয় এবং বসুন্ধরাদি সব পদার্থই জ্যোতিষ্মান রূপ ধারণ করে। তিনি তখন যে দিকে দেখেন, সেই দিকেই জ্যোতির পণ্যবীথিকা, সেই দিকেই প্রভার রঙ্গভূমি নয়নগোচর হয়। প্রভাময় সরিৎপতি তাঁহার দৃষ্টিতে ধ্রুব লোক পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে আর উহাতেই সকল জগৎ চিরদিনের মত ডুবিয়া যায়! কিন্তু সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠাতে উপনীত না হইলে কখনও বিশ্বরূপী ভগবানের এই অমানুষী লীলা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং উহাতে উপনীত হওয়া নিদিধ্যাসন বা সমাধি সাপেক্ষ।

অন্ধকার—অজ্ঞান, তমোগুণ; আলোক—জ্ঞান, সত্ত্বগুণ। উভয়ের পূর্ণ আবির্ভাবেই কিন্তু দৃষ্টিহীনতা জন্য নিশ্চেষ্টতার আবির্ভাব। পরন্তু অন্তিমের নিশ্চেষ্টতা নির্ব্বাণের উপাদান আর আদিমে চেষ্টাশূন্যতা অলসতারূপ

সাময়িক সুখের উপকরণ হইলেও ভবিষ্যতে অনন্ত সন্তাপ উৎপন্ন করে।

অধিকাংশ স্থলে আবার তমোগুণপ্রসূত নিশ্চেষ্টতাকে অবিবেকী লোক সত্ত্বগুণের কার্য্য মনে করে এবং সত্ত্বগুণের ব্যপদেশে তমোগুণও জনসমাজে আদৃত হইয়া থাকে। এই রোগের আধিক্য ভারতবর্ষেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই প্রারব্ধের শরণ লইয়া হস্ত পদ সঙ্কুচিত করিয়া বসেন; কিন্তু ইঁহাদের বহু সংখ্যকই অলসতার আপাতরমণীয় চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়াই ঐ পথ অবলম্বন করেন এবং কেহ ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাহাকে বক্ষ্যমান বচন শুনাইয়া দেন—

কর্ত্তব্যজ্ঞানমার্ত্তণ্ডজ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ।
তস্যালসধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ॥

অর্থাৎ কর্ত্তব্যজ্ঞান রূপ মার্ত্তণ্ডের কিরণে যাহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়াছে, (উহা দ্বারা ত্যক্তবিরক্ত হইয়াছে) সেই অলসধুরন্ধরেরই সুখ লাভ হয়, অন্য কাহারও হয় না।!!!

যে ভারতের অপৌরুষেয় বাণী উপদেশ করিতেছে যে—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

কর্ম্ম করিতে করিতে শত বর্ষ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবে—সেই ভারতের কেন যে আজি এরূপ শোচনীয় দশা, এরূপ প্রাণসংহারক বিকার উপস্থিত, এই প্রহেলিকার উত্তর একমাত্র তমোগুণের আধিক্য। তমোগুণ ও সত্ত্বগুণের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সমালোচিত হইল পরন্তু বিবেকানন্দ-সলিলে অবগাহন না করিলে ইহার গূঢ় রহস্য ভেদ করা অতি কঠিন বলিয়াই প্রতীত হয়। বিবেকানন্দই ভারতের একমাত্র অমূল্য রত্ন! ইহাই যোগী ঋষির প্রার্থনীয়। ইহাই যতিবৃন্দের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত। ইহার অনুরাগই ভারতকে অভিনব আলোকে আলোকিত করিবে। প্রেম-কুসুমে ইহার সপর্য্যাই অজ্ঞানতিমির নির্ম্মূল করিবে। কবে ভারতের এমন সুদিন আসিবে, যে দিন সকলেই বিবেকানন্দরসপানে উন্মত্ত হইবে?

কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা।

"মহিলা" কাব্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত।

এইবার আমরা বাঙ্গলা ভাষার একখানি মহাকাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, 'মহিলা' যেমন উচ্চ দরের বস্তু, উহার আলোচনা করিবার আমি তেমনই অনুপযুক্ত।

'মহিলা'র আলোচনার ভার কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী লেখকের হস্তে পড়িলে সকলে সুখী হইতেন, আমি স্বেচ্ছায় সেই গুরুভার গ্রহণ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছি, তাহা এক্ষণে বেশ উপলব্ধি হইতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না —ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত। দুর্দ্দশার কারণ—'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন' এই মহাবাক্যের প্রতি অমনোযোগিতা—স্মরণ ছিল না যে 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্'!

'মহিলা' প্রচার ও তাহার আলোচনা :—

'মহিলার' প্রথম অংশে অবতরণিকা ও মাতা দুটী ভাগ আছে। এই অংশ ১২৭৮ সালের ১১ই আশ্বিন মুঙ্গেরের পীরপাহাড়ে লিখিত। ইহার দ্বিতীয় অংশ জায়া বর্ণনায় পূর্ণ। এই অংশ ১০ই ফাল্গুন ১২৭৮সালে বাগবাজারে প্রস্তুত হয়। সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক ১২৮৭ সালে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। 'মহিলা' প্রচারে সুরেন্দ্রনাথের মহাপ্রাণতা ও সৌন্দর্য্যমত্ততার প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য যে, তাহার কাব্যভাণ্ডারে এমন এক খানি সুন্দর অত্যুজ্জ্বল রত্ন আছে, যাহাকে লইয়া সে জগতের অন্যান্য বহু প্রাচীন ভাষার সহিত অবাধে একাসনে বসিয়া আপনার বৈজয়ন্তী পতাকা উড্ডীয়মান করিতে পারে। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা'ই সেই অত্যুজ্জ্বল রত্ন। আক্ষেপের বিষয়, বাঙ্গালী পাঠক কি সুরেন্দ্রনাথ কি তাঁহার 'মহিলা'কাহাকেও চিনিল না। এইসব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যমত্ততা থাকিলেও বাঙ্গালী পাঠকবর্গের মধ্যে উহার বিশেষ অভাব।

রত্নাকরে রত্ন থাকিলে, জহুরি ডুবারী ভিন্ন কে সে রত্ন আহরণ করিবে? আমরা জানিয়াছি যে, সুরেন্দ্রনাথ কখনও আত্মসম্মানের জন্য রুচিকর উপাদান হস্তে লইয়া বাঙ্গালী পাঠকের দ্বারস্থ হয়েন নাই। আমরা জানি যে, সুরেন্দ্রনাথ একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন না, আমরা জানি যে, সুরেন্দ্রনাথ কমলার প্রিয়পাত্র ছিলেন না। বোধ হয় সেই জন্য তিনি উপেক্ষিত—তাঁহার গ্রন্থাবলীও উপেক্ষিত।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাণীর বরপুত্র, আর সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রেমিক ও মাতৃভক্ত। 'মহিলা'পাঠে মহাপ্রেমিকের পবিত্র প্রেমোচ্ছ্বাসে ও মাতৃভক্তির পূতবারিসিঞ্চনে বিষয়বিকারে বিকৃত শতধাবিদীর্ণ হৃদয় শান্তিরসে নিমগ্ন হয়। মহিলায় যে প্রেমোন্মত্ততা দৃষ্ট হয়, সে প্রেমে প্রেমিক হইলে নরের প্রধান বিশেষণ ঈশজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া মানব আত্মানন্দ উপভোগ করিতে পারে। এ জগতে আসিয়া যিনি যতটা মানবচরিতবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হন, তিনি ততটা স্রষ্টার বিশ্বসৃষ্টি রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন। কারণ—মানবই সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। মানবসমাজ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; পুরুষ ও স্ত্রী। আমাদের আলোচ্য কবি সুরেন্দ্রনাথ সেই কথা কেমন সুন্দর ভাবে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধে বিবৃত করিয়াছেন দেখুন—

ফুটেছে অতুল ফুল উদ্যানে ধরায়,
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার;
বৃন্তদল কলেবর পুরুষের তায়
নারী—বর্ণ, মধু, গন্ধ যার।

কবির চক্ষে নর অপেক্ষা নারীর মূল্য অধিক। কবির অনুজ বলিয়াছেন, শুধু তাঁহার অনুজই বা বলি কেন, 'মহিলা'র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কবি চিরদিন সৌন্দর্য্যের পূজা করিতেন। নারী সেই সৌন্দর্য্যের চাক্ষুষ প্রতিমা। সুতরাং কবি তাঁহাকে চিরদিন ভক্তিচক্ষে দেখিয়াছেন। নারীজাতির সম্বন্ধে সাধারণ্যে যে সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, কবি মহিলা-কাব্যে তাহাই খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি সমগ্র পৃথিবীর নারী জাতিকে তাঁহার কাব্যের নায়িকা কল্পনা করিয়াছেন——

"কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটুস্তুতি না চাই রচিতে
সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার।"

"মহিলা"পাঠে সুরেন্দ্রনাথকে অনেক ভাবে চিনিতে পারা যায়। তিনি যে একজন তত্ত্বরাজ্যের প্রাচীন পান্থ, তিনি যে একজন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, তিনি যে একজন অন্তর্জগতের প্রবীণ কবি, তিনি যে একজন অসাধারণ সমাজ-সংস্কারক, তিনি যে একজন প্রকৃত সমালোচক, তিনি যে একজন মহাপ্রেমিক, তিনি যে একজন প্রকৃত ভক্ত, তাহা "মহিলা" পাঠ করিলে কাহারও আর অবিদিত থাকে না। ১২৮৭ সালে মহিলার প্রথম অংশ প্রকাশিত হইলে তৎ-কালীন "নলিনী" নামক একখানি মাসিক পত্রে মহিলাকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া যে কয়েকটী ছত্র লিখিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "এ কাব্য খানি আপ-নিই আপনার সমালোচনা। উদ্ধৃত করিয়া মনে তৃপ্তি জন্মায় না; যে স্থান খুলি, সেই স্থানই মধুর। আমরা বহুদিন এমন সরল, সতেজ ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাঠ করি নাই! এরূপ রচনাচাতুর্য্য ও ভাবমাধুর্য্য বঙ্গীয় কবিতায় অতিবিরল। * এমন সুন্দর কবিতা বঙ্গভাষায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * সুরেন্দ্র হৃদয়ের কমনীয় ভাবসমূহ বর্ণনা করিতে অদ্বিতীয়। তাঁহার এক একটী পদ-বিন্যাস একএকটি ভাবের উৎস স্বরূপ। রমণীর চরিত্র আদর্শ চরিত্র। সেই আদর্শ চরিত্রের আদর্শ চিত্র দর্শন করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি। আমরা প্রকাশক দেবেন্দ্র বাবুকে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি, যেন আমরা ত্বরায় মহিলার দ্বিতীয় অংশ দেখিতে পাই। উপসংহার কালে প্রার্থনা এই—যে কবি কুসুমকোমল তূলিকায় কল্পনার বিচিত্র বর্ণে জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি আঁকিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্মরণীয় নাম ও কীর্ত্তি যেন প্রতি গৃহে মুক্তকণ্ঠে গীত হয়!"

এই সমালোচনা ব্যতীত মহিলার আর কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমালোচনা কখনও হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। ১২৮৭ সালে মহিলার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ১৩০৩ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের ১৬ বৎসর পরে দ্বিতীয় সং-স্করণ প্রকাশ হয়। আরও অধিক আক্ষেপের বিষয়, সুরেন্দ্রনাথের কবিতা তাঁহার গ্রন্থছাড়া আর কোথাও উদ্ধৃত হিসাবেও দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পা-দিত কবিতাপাঠ নামক স্কুলপাঠ্য কবিতাপুস্তকে মহিলার মাতৃস্তুতির বালকবোধোপযোগী কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বা তাঁহার গ্রন্থাবলী অদ্যাবধি কখনও বক্তৃতার বিষয় হয় নাই। বাঙ্গলায় কবিতা

পুস্তকের ছড়াছড়ি, কাব্যপাঠকের সংখ্যাও অল্প নহে, কবিতা লেখেনও অনেকে, কিন্তু এই সকল কাব্যামোদীর নিকট বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য কিরূপ আদর পাইয়াছে, তাহার পরিচয় ইহাতেই বুঝা যাইতেছে! শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ কি দুর্ভাগ্য বশতঃ যে এতটা উপেক্ষিত হইয়া আছেন, তাহা বুঝিতে পারি না!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথ জগতের সমুদয় নারীজাতিকে তাঁহার কাব্যের নায়িকা করিয়াছেন—

গাব গীত খুলি হৃদিদ্বার
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।

তাই সুরেন্দ্রনাথ অবতরণিকা ভাগে সমষ্টিভাবে নারীজাতির এক মহিমাগীতি গাহিয়াছেন। সে গীত যখন প্রথম গীত হয়, তখন—কবির ভাষায় বলি—"মর্ত্ত্যে স্বর্গসঙ্গীত বাজিল"। সুরেন্দ্রনাথ জানিয়াছিলেন যে,—

ধাতার করুণা মর্ত্ত্যে নারী অবতার,
নরহৃদি বেদনা বারিতে!

তাই তিনি ব্যগ্র হইয়া সেই নারীমহিমা বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"কখনো কি জান নাই স্বাস্থ্যের পতন?
পড়ো নাই পীড়নে অরির?
কখনো কি ভাঙ্গে নাই সম্পদ স্বপন?
ভুঞ্জ নাই দুঃখ প্রবাসীর?
বান্ধব বিহীন দেশে,
শীতাতপবর্ষা ক্লেশে,
ঠেকে যদি না থাক কখন,
জান না কি মধুচক্র মানবীর মন!

ঝঞ্ঝাবাতে দোলে যথা বালুবীচিচয়,
চরে যথা ভীম পশুপাল,
গরজে গরল কণ্ঠে ফণী ভয়ময়,
নর যথা শ্বাপদ করাল;—

সকলি বিকট যথা,
কামিনী কোমলা তথা,
বাঁচে তায় পথিকের প্রাণ!
অবনী! রমণী তব গরিমার স্থান!

* * * *

এই অবতরণিকার প্রত্যেক কবিতায় যে ভাব আছে, তাহা অন্যের পক্ষে একএকখানি কাব্য লিখিবার উপাদান হয়। অবতরণিকার একটী কবিতায় প্রথম স্রষ্টা নারীর কি অপরূপ রূপ চিত্রিত করিয়াছেন দেখুন—

বিকচ পঙ্কজ মুখে শ্রুতি পরশিত,
সলাজ লোচন ঢল ঢল!
চাঁচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল!
কাতর হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে;
ঢল ঢল লাবণ্যের জল
পাটল কপোল কর চরণের তল।

নারীজাতি এ বিশ্ব সংসারে নানারূপে কত খেলাই খেলিতেছেন, এ সংসারের কত মঙ্গল সাধন করিতেছেন, কে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে পারে? সুরেন্দ্রনাথ সেই কথা কেমন গুছাইয়া একটী মাত্র কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

এক দুগ্ধে দধি, তক্র, ঘৃত, নবনীত,
নানা উপাদেয় যথা হয়;—
এক নারী নানারূপে করে বিরচিত
সংসারের সুখ সমুদয়;—
সৃষ্টি পুষ্টি জননীর
স্নেহ চিন্তা ভগিনীর,
কন্যা সেবা, জায়ার বিহার—
অতুলনা দান যার কুমারী কুমার!

অন্যত্র—

যে সকল গুণে, বান্ধে হৃদয়ে হৃদয়,

আছে যায় অখিল সংসার,
নরত্ব মহত্ত্ব-কর রতন নিচয়,
ভাবিনী সে সবের ভাণ্ডার !

অবতরণিকা সম্বন্ধে আর একটী কথা মাত্র বলিব। অবতরণিকার প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষ ছত্রে সুরেন্দ্রনাথ অপূর্ব্বভাবে এক একটী সাধারণ সত্যের সমাবেশ করিয়াছেন। তাহার দুচারিটী উদাহরণ দিলাম—

'সমজাতি শিলা হীরা পুরুষ অঙ্গনা'
'ধাতার নিয়ম সমে সম আকর্ষিত'
'হর গৌরী রূপ বিশ্ব পুরুষ প্রকৃতি'
'অধমে উত্তমে ভেদ যথা দেহ মন'
'নাহি জননীর রাজ্যে যম জুজু ভয়'

মহিলার প্রথম অংশের দ্বিতীয়ভাগ মাতার মহিমা বর্ণনে নিযুক্ত। ইহা জগতের যাবতীয় মাতার উদ্দেশে লিখিত। যাঁহার সৃষ্টি পুষ্টিতে এ জগৎ বর্ত্তমান অবস্থায় রহিয়াছে, মাতা অংশে কবি সেই মাতারই স্তুতি করিয়াছেন। মাতৃভক্তের পবিত্র উচ্ছ্বাস 'মাতা' অংশ পাঠকালে সকলেরই মাতৃভক্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠে। উহা পাঠ করিতে করিতে কে না সুরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে বলিবে—

সুকোমল অঙ্কে নিয়া, অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি পীযূষ ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া, স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননী কর পুনঃ বালক আমায় !
তব অঙ্ক পরিহরি, সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মাগো সংসারের রণে !
তুমি গড়েছিলে যাহা, আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম-স্বর্গ কথা কিছু নাই মনে !
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে !

* * * * *

ত্রাসে, ক্ষোভে, শোকে, দুঃখে, আগে নাম উঠে মুখে,
কিবা একাক্ষরী মন্ত্র মানব-তারণ !

যার শব্দে যমচরে নিকটে আসিতে ডরে ;
এ ভব-অশুভ-ঘন-দক্ষিণ-পবন !
নিলে নাম রসনায়, হৃদয়ের পাপ যায়,
কুমতি পিশাচী করে দ্রুত পলায়ন !
নাম সংকীর্ত্তন যথা ভক্তি, প্রেম, দয়া তথা ;
ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া,—ঈশ পরিজন !
হেন জনে, কার সনে করিব তুলন ! !

'মাতা'য় সুরেন্দ্রনাথের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে তাঁহাকে সমাজনীতি-বিশারদ বলিয়া চিনা যায়। মাতার অনেক অংশে পশুর অপ্রিয় পুরে সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণের জন্য, ধাত্রী রাখিয়া পুত্র পালনের জন্য, স্ত্রীলোকদিগকে পূর্ণ অশিক্ষিতা রাখিবার জন্য সমাজের উপর কবি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন।

সূতিকা গৃহ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,——

এ হেন সূতিকা স্থান.— যথা সৃষ্টি ক্রিয়াবান্
ধাতার বিহার মাতা মূরতি সাকার !
তাহারে অশুচি মানে, পুরের অধম স্থানে,
ভ্রান্ত নরে, স্থাপনা রচনা করে তার !
রবি কর বায়ু হীন, আর্দ্রতল শয্যা দীন,
প্রসূতি সন্ততি দোঁহে নিপতিত তায় !
নিত্য নব নব পীড়া, কালের কৌতুক ক্রীড়া,
হয়ত বা ফুল কলি ছিঁড়ে নিয়ে যায় !
রেখে মাত্র চিরস্মৃতি শোকের কাঁটায় !!!

ধনী লোকেরা পুত্র পালনের নিমিত্ত ধাত্রী রাখেন। অতি শিশুকাল হইতেই সুকুমারমতি শিশুগণ ধাত্রীরূপিণী অজ্ঞাতকুলশীলা, নীচকুলোদ্ভবা, চিরকুক্রিয়ালীনা বেতনভোগিনী বারনারীর অঙ্কে লালিত পালিত হয় ; এমন কি কখন কখন শিশু পুত্রগণ মৃতবৎসা, বিষঘটস্তনা, গোপনে কুপথ্য-গ্রহণতৎপরা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধপানে বর্দ্ধিত হয়। এ প্রথার বিষময় ফল অনেক স্থানে ফলিয়াছে। চিন্তাশীল জন মাত্রেই এ প্রথার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। আক্ষেপের বিষয়, এ ধাত্রী রাখা প্রথার এ যাবৎ উচ্ছেদ সাধন হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ 'মাতা'য় এই প্রথার বহু দোষ দেখাইয়া

বলিতেছেন,—

তোলা জলে করি স্নান, মাটি তুলে বপি ধান,
ঔরস অভাবে করি দত্তক গ্রহণ ;
কাঁচা ফল তুলে নিয়া পাকাই অনল দিয়া,
প্রতিনিধি যোগে যথা রাজ্যের রক্ষণ ;
ব্রহ্মানন্দ না পাইয়া মত্ত মন সুরা পিয়া
পত্নী পরিবর্ত্তে করা গণিকা গমন ;
মুখে না কহিয়া কথা ইঙ্গিতে বুঝান যথা
কৃত্রিম দশন, কেশ ধারণ যেমন ;
এ হতে অধম মানি ধাত্রীর পালন !

সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ একথা মানিতেন না যে, বিদ্যাশিক্ষা দিলে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের অবাধ্য হয় বা চরিত্রহীনা হইয়া পড়ে। তাঁহার মতে বিদ্যাশিক্ষা যদি ঐরূপ নীচগামী প্রবৃত্তির প্রসূতি হয়,—

পুরুষেরা বিদ্যাবিষ কেন তবে খায় ?

নারী যদি অশিক্ষিতা থাকে, তাহা হইলে সমাজের অর্দ্ধভাগ জ্ঞানহীন থাকিয়া কুক্রিয়ালীন থাকিবেই। আরও একটী কথা আমাদের সকলের জানা আছে যে, শৈশবে বালকগণ মাতা ছাড়া অন্যের সঙ্গে অধিক কাল থাকে না, তাই কবি বলিতেছেন,—

হেতু যদি স্ত্রীশিক্ষার, কিছু নাহি পাও আর,
সন্তানের শিক্ষা হৃদে করহ ধারণ ;
আপনি বিষয়ে রত, অবকাশ নাই তত,
শিশুসুত মাতা ছাড়া নয় একক্ষণ।

আরও—

মাতার প্রকৃতি যাহা সুত স্বতঃ পায় তাহা
জননীর দোষ গুণ কিছু না এড়ায়।

সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি অধুনা প্রচলিত অবাধ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। পরন্তু তিনি এরূপ অবাধ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দু চার কথা বেশ বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

নগরে স্ত্রীশিক্ষা হয়
তাতে কিবা ফলোদয় ?
সৌধশিরে দীপ কিন্তু ভিতরে আন্ধার !

*　　　*　　　*

নারী বেশ ভূষা পরা　　　　ভিতরে বিকার ভরা
কবরের পরে চারু প্রাসাদ প্রকার।
অন্বেষিয়া পাই শব ভিতরে যাহার।

অন্যত্র—

দূষ্যগ্রন্থ দেশময়,　　　　পাঠে করে কালক্ষয়,
নারীপাঠ্য গ্রন্থ অল্প কেবা তা পড়ায় ?
কুপথ্য ক্ষুধায় খায়,　　　　ঘোর রোগ বেড়ে যায়,
হেনমতে স্বভাবের বিকার ঘটায়।
শিক্ষা নয়, শিক্ষার অভাব হেতু তায়।

সুরেন্দ্রনাথ পাঠশালার একটী ছবি কেমন দিয়াছেন তাহা দেখুন,—

পাঠশালা বিবরণ,　　　　স্মরিয়া চমকে মন,
ধরাপরে যমসভা স্থাপিত যেমন !
রোদন কম্পন ভয়　　　　তর্জ্জনগর্জ্জনময়,
গুরু মহাশয় যেন সাক্ষাৎ শমন !
ভ্রুকুটি কুটিল নেত্র,　　　　করে বিঘূর্ণিত বেত্র,
স্মরিয়া প্রভাতে রূপ বিকম্পিত প্রাণ।
ভয়ে পোরা হৃদিস্থান,　　　　কোথায় পশিবে জ্ঞান
এ জন্মে না বিদ্যার বিরাগ সমাধান—
সরস্বতী হেরি যেন রাক্ষসী সমান !

মাতৃভক্ত সুরেন্দ্রনাথ হতভাগ্য মাতৃনিন্দুকের জন্য কি কঠিন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আবশ্যক বোধে এ স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম,——

স্মরিয়া মায়ের মায়া,　　　　পুলকে না পুরে কায়া,
আঁখি না রসাক্ত হয় হেন যেই জন ;
তার কাছে না থাকিব,　　　　তারে নাহি বিশ্বাসিব,
কবে মম কণ্ঠনালী করিবে ছেদন।

মুখে মাতৃনিন্দা ফুটে, ঈশচক্র কুঞ্চিয়া উঠে,
করে বজ্র টলে—করে অনল বমন ;
জননীরে কটু ভাষে, উল্লাসি নরক হাসে—
কট কট রবে করে কপাট পাটন—
শান দেয় শস্ত্রচয় যমচরগণ।

এক্ষণে মাতৃভক্ত সুরেন্দ্রনাথের মাতৃপূজার উপকরণসংগ্রহেচ্ছা দেখিয়া ও মাতৃস্তুতির কিছু পাঠ করিয়া মহিলার প্রথম অংশের আলোচনা শেষ করিব।

সুরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

ধরা হীরা হয় হায় সিংহাসন রচি তায়
পারি যদি বসাইতে জননী তোমায় ;
ফুল হয় তারাদল চন্দন সাগর জল
শতকল্প বসি যদি পূজি তব পায় ;
সুধাকর সুধাগারে পারি যদি আনিবারে
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন ;
পারিজাত দল দিয়া নিত্য শয্যা বিরচিয়া
করাইতে পারি যদি তোমারে শয়ন ;
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন।

সুরেন্দ্রনাথের মাতৃস্তুতি বঙ্গভাষায় অমরবাঞ্ছিত সামগ্রী। তাহার গুণ-বর্ণনে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই নিম্নে তাহার প্রথম কবিতাটী মাত্র উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম——

জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ,
জননী এ সকল কারণ ;—
যাঁর প্রেমসিন্ধুপরে, মায়ার তরঙ্গভরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায় !
প্রসীদ প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

মহিলার দ্বিতীয় অংশ 'জায়া' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৬৪টী সপ্তপদী কবিতায় ইহার দীর্ঘ কলেবর পূর্ণ করিয়াও দেহার্দ্ধভাগিনীর প্রেমঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ হইল না ভাবিয়া প্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন——

যে কিছু রহিল ত্রুটি করিতে বর্ণন,
নিজ প্রেমগুণে প্রিয়া করিবে পূরণ।

সুরেন্দ্রনাথ জায়াকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা নিম্নোক্ত দুইটী শ্লোকে প্রতিপন্ন হইবে,—

এসো, এসো প্রিয়তমা মুরতি সাকার
জাগাও ভক্তের হৃদে ভাব নিরাকার ;—
রাগভরে করি তব স্তবন পূজন।
পৌত্তলিক ভাবি মনে,
হাসিবে অবোধগণে ;
সুবোধ বুঝিবে আছে নিগূঢ় কারণ,—
নিরাকারে ধ্যান নভকুসুম চয়ন।
* * *
তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্যা সর্ব্ব-রসাধার,—
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি অবিতর্ক্য অণু পদার্থবিদ্যার ;
শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহ ধাম,
তুমি মূল প্রকৃতি সাংখ্যের তত্ত্বসার,
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

তিনি জানিতেন না যে, 'Women are but the toys to amuse our lighter hours.' তিনি জানিতেন,—

"সংসার স্বরূপা স্বীয়া সংসারের সার,
সংসারে না পাই স্থান তব উপমার।"

তিনি জানিতেন—Man is half a man and his life
Is not whole till he gets a wife.

তাই তিনি বলিয়াছেন,
"বিবাহে অবশ্য আছে স্বভাবের সায়"।

সুরেন্দ্রনাথ জানিতেন, মানুষ সর্ব্বদাই ব্যথায় ব্যথিত, সংসারে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ বিধ্বস্ত, সর্ব্বদাই চঞ্চলমতি। তাহার ব্যথা হরণ করা আবশ্যক, তাহার মতির স্থিরতা চাই, তাহাকে সুপথে পরিচালিত করা আবশ্যক। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পত্নীই উক্ত কার্য্যে এক মাত্র সক্ষম। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

অশ্বে যথা বল্গা, যথা অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি কর্ণ যেমন তরীর,
বুদ্ধিবৃত্তিদলে যথা হিতাহিত জ্ঞান,
সিন্ধুযাত্রী পথহারা
তার যথা ধ্রুব তারা
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান
তোমা ছাড়া পথভ্রান্ত পান্থের সমান।

* * * *

সুরেন্দ্রনাথ প্রজাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—হে প্রজাপতি, এই সুন্দর মানবসমাজ তোমারই গঠিত, তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মানুষ পশুর পদবী প্রাপ্ত হয়। তিনি দম্পতি মিলনের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া জায়ার শেষভাগে এক স্থলে বলিয়াছেন,

অতএব সযতনে নরনারীগণ,
দাম্পত্য প্রণয় লাভে লুব্ধ কর মন।
অকপট প্রেম যদি হয় ঘরে ঘরে
শত্রু মিত্র বা উদাসী,
প্রতিবাসী, ধরাবাসী,
ক্রমে সবে সেই প্রেম সঞ্চারিবে পরে,
প্রবাহিত নদী যথা জন্মিয়া নির্ঝরে!

সুরেন্দ্রনাথের প্রেম সম্বন্ধে যে গভীর ভাব, তাহা বর্ণনাতীত। নিম্নে একটী শ্লোকে প্রেমের মহিমা কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে দেখুন,—

হে প্রেম অদ্বৈত জ্ঞান নলিনতপন!
পতিত মানবকুল তারণ পাবন!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আয়ত্ত তোমার,
কাঞ্চন শৃঙ্খল তুমি,
বিপুল এ বিশ্বভূমি
এক প্রান্তে আছে বাঁধা প্রলম্বিত যার,
অপরান্তে কীলে—পদপ্রান্তে বিধাতার!!

এই জায়া মহিমা গীত গাহিতে গাহিতে সুবিধামত সুরেন্দ্রনাথ সমাজ-নীতিজ্ঞানের সম্যক্‌ পরিচয় দিয়াছেন ও অধুনা প্রচলিত বহু দোষাবহ

সামাজিক প্রথার উপর তীব্র কটাক্ষপাতও করিয়াছেন। সে তীব্রতা কশাঘাতের ন্যায় পরিস্ফুট। কৌলীন্য প্রথা, স্ত্রীগণের অবরোধপ্রথা, বিবাহে ঘটকালী প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রথার সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার একটী তুলিয়া অন্যটি বাদ দিলে অঙ্গহানি করা হয়। রূপ, যৌবন, দাম্পত্যপ্রেম ও পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধে যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। সুরেন্দ্রনাথ জায়ায় প্রবীণ উপদেষ্টার ন্যায় অনেক উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশ সমূহে কোনও উদ্ধতস্বভাব শিক্ষকের শিক্ষা-প্রণালীর ছায়া নাই, তাহা অতি বিনীতভাবে অনুরোধের ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাণের ভিতর তাঁহার যে সব মহাভাব জাগিয়াছিল, মহাকবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা হইয়াছিলেন বা হইবার প্রয়াসী ছিলেন, তাহাই অপরকে হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রেমিক ছিলেন, তাই জগতের লোককে বলিয়াছেন,—

সংসার কলহ দূরে কর পরিহার,
ছেড়ে দাও প্রলোভন বিষয় সুবার,
প্রেমিক হও হে প্রিয় বান্ধব আমার,
প্রেমিক হও হে তুমি,
প্রেমময় হবে ভূমি,
নবীন তৃতীয় নেত্র ফুটিবে তোমার,
হেরিবে পৃথিবী পরি-পূরীর প্রকার।

এই রবি শশী তারা এই স্থল জল,
এই তৃণ তরু লতা এই ফুল ফল,
এই জীব জন্তু হবে আত্মীয় তোমার,
নয়ন ফিরাবে যথা
নবনব শোভা তথা
প্রতিক্ষণে নয়নে হেরিবে অনিবার ;
অকারণে নয়নে ঝরিবে অশ্রুধার।

যে মহাকবিদ্বয়ের কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় দিতে আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা, আমার এমন কি সাধ্য যে, তাঁহাদের কবিতার বা কাব্যের যথাযথ ছবি দিতে পারি? যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা হইতে কেহ যেন

এমন মনে না করেন যে, উদ্ধৃত কয়েক স্থান ব্যতীত কবিদ্বয়ের কাব্যে পড়িবার আর বুঝি উৎকৃষ্ট স্থান নাই। আমার বিশ্বাস, কেবল মাত্র বর্ণনা, কাব্য-শোভা বা অলঙ্কারবৈচিত্র্যের অনুরোধে কবিদ্বয় একটীও নিকৃষ্ট কবিতা লেখেন নাই। যে সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, সে সকলের পূর্ণ সৌন্দর্য্য বা কবিত্ব-কৌশল আমার নিজের ভাষায় যে ঠিক বুঝাইতে পারিয়াছি, তাহাও নহে। যেমন করিয়া বলিলে কাব্যামোদীর নিকট কবিদ্বয়ের আদর হইতে পারে, তেমন করিয়াও বলিতে পারি নাই। বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে পড়িতে আমি নিজে মুগ্ধ হইয়া পড়ি, সুতরাং আমার প্রাণে যতটা ভাব আসে, ভাষার দারিদ্র্যে তাহা লেখায় ফুটাইতে পারি নাই। উপসংহারে আমার এক মাত্র বক্তব্য, কাব্যামোদী পাঠকবৃন্দ যদি এই প্রবন্ধ পাঠের পর উক্ত কবিদ্বয়ের মধুময়ী কবিতাগুলি একবার নিজে নিজে পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।*

সমাপ্ত।

অদ্বৈতবাদ।

৫। জগৎ।

শ্রীআশুতোষ দেব এম, এ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ;

জগৎ সত্য না মিথ্যা? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা।" ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ তাঁহাতে সজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত ভেদ নাই। অদ্বৈতবাদীরা জগতের সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু, তদ্ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা অবস্তু। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে,—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছি—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—

---

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্"—নৃসিংহতাপনী. ৭।

আত্মৈবেদং সর্ব্বং"—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২।

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ"—শ্বেতাশ্বতর, ৩।৯।

অর্থাৎ ব্রহ্মই এই সকল, আত্মাই এই সকল, ব্রহ্মের পর অপর আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে, ব্রহ্মে যদি কোন ভেদই না থাকে, তাহা হইলে এই জগতের প্রতীতি কিসে হয়? তাহার উত্তরে ঋষিরা বলিয়াছেন যে, অধ্যারোপ বা ভ্রম বশতঃ। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইতেছে। সর্পের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এরূপ এক রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মরূপ বস্তুতে, জগৎরূপ অবস্তুর আরোপ বা অধ্যাস হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত চারিটী উদাহরণ হইতে জগতের মিথ্যাত্ব বুঝিবার সুবিধা হইবে।

প্রথম উদাহরণ। "ভূতাবেশবৎ"। এক ব্যক্তির ভূতাবেশ হওয়াতে তাহার কিছুমাত্র লৌকিক জ্ঞান ছিল না। কোনও ব্যক্তি তাহাকে ভূতাবেশ হইতে মুক্ত করিতে না পারাতে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা এক রোজার বা ভূততত্ত্ববিদের (Spiritist) আশ্রয় লইল। এই রোজা তাহাকে ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য, তাহার হস্তে একখণ্ড কাগজ দিয়া বলিল যে. "তুমি অমুকপথ ধরিয়া অমুকস্থানে যাও; সেখানে এক অট্টালিকা ও বহু লোকসমাগম দেখিবে। সেই অট্টালিকা এক রাজার, তাঁহার হস্তে এই পত্রখানি দিও; তাহা হইলে তিনি তোমায় পরম আদরে অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু সেই রাজা তোমায় চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় অতি উপাদেয় আহারাদি প্রদান করিয়া অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করিতে বলিবেন। কিন্তু তুমি সেখানে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না, কেবল মাত্র যেখানে শুইতে বলিবেন, সেই স্থানে শুইয়া থাকিবে। পরে প্রাতঃকালে আমার এই পত্রের উত্তর লইয়া আসিবে।" ঐ রোজার কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি গৃহ হইতে প্রচুর পরিমাণে আহারাদি করিয়া বহির্গত হইল এবং নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে পূর্ব্বকথিত স্থানে উপস্থিত হইল। সে তথায় এক রাজ-অট্টালিকা এবং বহুলোকসমাগম দেখিতে পাইল। রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ কাগজখণ্ড প্রদান করাতে, রাজা তাহাকে অত্যন্ত যত্ন করিলেন এবং তাঁহার আহারের নিমিত্ত অতি মনোরম ও উপাদেয় খাদ্য ও সুকোমল শয্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি রোজার

কথা স্মরণ করিয়া জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না, কেবলমাত্র সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। প্রাতঃকালে তাহার যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল যে, সেই স্থলে অট্টালিকা বা লোকসমাগমের চিহ্নমাত্র নাই, সে এক শ্মশানে নরকঙ্কালের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহার চৈতন্য হইয়াছে, সে তখন ভূতাবেশ হইতে মুক্ত হইয়াছে। সে তখন বুঝিতে পারিল যে, সে এতক্ষণ ভূতাবিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই অবস্থায় সে যাহাকে পরম মনোহর বস্তু ভাবিতেছিল তাহা নরকঙ্কাল, মূত্র ও বিষ্ঠা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী সদ্‌গুরুর কৃপায় মায়াবেশ হইতে মনুষ্য যখন মুক্ত হয়, তখন সে জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে এবং মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারে।

দ্বিতীয় উদাহরণ। "সূত্রক্রীড়াবৎ"। শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রক্রীড়া এখনও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। কোন কোন সাধু ফকির এই প্রকার ক্রীড়া দেখাইয়া থাকেন। একজন দর্শক এসম্বন্ধে কোন সংবাদপত্রে যাহা লিখিয়াছেন, আমাদের কোন স্থানীয় সংবাদপত্রে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই ঘটনাটী আমরাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

In regard to "Mahaindra Jala" or Aerial jugglery Mr. A. Mootootamby Pillay of Jaffna describes an experience, of which I was myself an eye-witness in open daylight, at Poona some 20 years ago. The performer brought a ball of string, took one end of it, tied it to a stake driven into the ground, and threw the ball up into the air. The ball uncoiled itself as it went high and was lost sight of. It stood clear line in the air as far as the eye could reach. Then the juggler's son came forward and taking hold of the string climbed up along it. When he had gone some height, the father cried out, asking him to get down. The boy taking no notice of it, went higher and higher. At this the father pretended to be angry and followed him up with a sword between his teeth. Meanwhile the son proceeded higher and disappeared in the clouds. The father abused him for his disobedience,

and told the people as he climbed that he would go up and cut him to pieces. Finally he too, was out of sight. Shortly after—to the great amazement of the spectators—drops of blood were drizzling from the sky before them and then the boy's hands and legs fell down one by one, and finally his head and trunk. All these pieces showed signs of life for a time. Soon after the father got down besmeared with blood all over his body, pulled down the whole string in a pile, and covered it, the sword and the fragments of the body wlth a rug. The next moment when the father lifted the rug the body was found fully restored to life without any marks whatever. The performer was at last congratulated by the crowd and was handsomely remunerated.

——The Indian Mirror, 16th February, 1905.

এই ঘটনাস্থলে অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, কিন্তু ঐ যাদুকর সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়াছিল। মায়াও মনুষ্যকে এই প্রকারে অসত্যকে সত্য বলিয়া—ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান করাইতেছে। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ মায়াকে "অঘটনঘটনপটীয়সী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তৃতীয় উদাহরণ। "যোগমোহবৎ"। যোগমোহকে আধুনিক পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) Hypnotism বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই অবস্থায় মনুষ্যকে যে কথার আভাস বা suggestion দেওয়া যায়, মনুষ্য সেই প্রকার অনুভব করিয়া থাকে। তাহাকে যদি লবণ খাইতে দিয়া বলা যায় যে, "তুমি চিনি খাইতেছ" তাহা হইলে সে চিনিরই মিষ্ট আস্বাদন অনুভব করিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এই কলিকাতা নগরীতে একজন প্রধান যাদুকর বা Hypnotist আসিয়া অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন। তিনি করিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অসংখ্য দর্শকমণ্ডলীকে বলিলেন যে, তোমাদের ভিতর ১০।১২জন সবলকায় ব্যক্তি এই মঞ্চে আইস। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া ১০।১২ জন বলিষ্ঠ সৈন্য ঐ মঞ্চে আরোহণ করিল। সেই যাদুকর ঐ ব্যক্তিগণকে এক পংক্তিতে

দণ্ডায়মান করাইলেন, তাহাদের চক্ষের দিকে একবার চাহিবামাত্র তাহারা যোগমুগ্ধ (Hypnotised) হইয়া গেল। তখন সেই ব্যক্তি উহাদিগকে বলিলেন যে, "তোমরা প্রস্তুত হও, সম্মুখে জলাশয় রহিয়াছে, তোমাদিগকে সন্তরণ করিতে হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সেই সৈন্যগণ গাত্রবস্ত্র সকল উন্মোচন করিয়া সন্তরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। তৎপরে সেই যাদুকর "সন্তরণ কর" এই আদেশ দিবা মাত্র তাহারা জলে পড়িবার ভঙ্গী করিয়া সেই রঙ্গমঞ্চে পতিত হইয়া জলভ্রমে উহার উপর সন্তরণ করিবার জন্য হস্তপদ নাড়িতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চের কঠিন কাষ্ঠের সংঘর্ষণে তাহাদের দেহ ও অঙ্গাবরণ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের দৃক্‌পাত নাই। তৎপরে সেই যাদুকর যখন তাহাদের যোগমোহ ভঙ্গ করিলেন, তখন তাহারা তাহাদের দশা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং অঙ্গের ক্ষতের জন্য ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। মনুষ্যেরও সেই প্রকার দশা হইয়াছে ; মায়ামোহে তাহারা সকল সময়েই যোগমুগ্ধ বা Hypnotised হইয়া রহিয়াছে। তাহারা অবস্তুকে, অর্থাৎ জগৎকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছে। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন মায়ার ধ্বংস হয়, তখন জীব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে। তখনই মায়ার অঘটনঘটনপটীয়সীত্ব অনুভব করিয়া থাকে।

চতুর্থ উদাহরণ। মায়ার লোকপ্রসিদ্ধ লক্ষণ আলোচনা করিলে আমরা অবগত হই যে, যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না অথচ স্পষ্ট প্রকাশ পায়—এরূপ যে সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, তাহাকেই লোকে মায়া বলে। এই জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কোন এক বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেও তাহার বিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায় না এবং অবশেষে অবিদ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। এই জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অবিদ্যার এবং জগতের ঐন্দ্রজালিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মায়ার ঐন্দ্রজালিকত্ব সম্বন্ধে নিম্নে আর একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

কোনস্থানে দশজন পুরুষ একত্র হইয়া নদীর পর পারে গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যিনিই গণনা করেন, তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর নয় জনকে দেখিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং যে দশম ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিলেন না! তখন

তাঁহারা ভ্রান্তি বশতঃ বলিলেন যে, দশম পুরুষ দেখিতেছি না, অতএব তিনি নাই। অজ্ঞানের এই রূপ শক্তিকে আবরণ শক্তি বলা যায়। পশ্চাৎ নদীজলে দশম পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া শোক ও ক্রন্দনাদি করিতে লাগিলেন। সেই ক্রন্দনাদিকে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়। সেই সময়ে কোন অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া বলিলেন যে, তোমাদের দশম পুরুষ মরে নাই, জীবিত আছে। সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগের স্বর্গলোকাদির জ্ঞানের ন্যায় তদ্বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান হইলে পরে গণনা করিয়া তুমিই দশম পুরুষ এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষরূপে দশম পুরুষকে দেখিয়া রোদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা হর্ষযুক্ত হন। পূর্ব্বোক্ত দশম পুরুষে অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষ জ্ঞান, সম্যক্ দৃষ্টি এবং শোকাপনোদনরূপ যে সাত প্রকার অবস্থা বর্ণিত হইল, তাহা মায়ার দ্বারা মোহিত জীবেও প্রযুজ্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা অবগত হইলাম যে, উপাধিদ্বয় সাহায্যে ব্রহ্মে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা কোন শক্তি আছে। সেই শক্তি দ্বারা জগৎ যথোপযুক্ত নিয়মবদ্ধ হইয়াছে। সেই শক্তিরূপ উপাধি সংযোগে পরব্রহ্ম ঈশ্বর হন এবং পঞ্চকোষরূপ উপাধিবলে ব্রহ্মই জীবরূপে পরিচিত হন। পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন লৌকিক ব্যবহারে এক ব্যক্তি পুত্রকে অপেক্ষা করিয়া পিতা ও তিনিই পৌত্রকে অপেক্ষা করিয়া পিতামহ হন এবং পুত্র ও পৌত্রের অভাবে তিনি পিতা বা পিতামহ কিছুই নহেন, তদ্রূপ এক পরব্রহ্ম চৈতন্য মায়াশক্তি উপাধি সাহায্যে ঈশ্বর এবং পঞ্চকোষ উপাধির দ্বারা জীব এবং উপাধির অভাবে নিরুপাধি কেবল চৈতন্যমাত্র থাকেন।

যেমন সুষুপ্তি অবস্থা ক্রমে স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ আমি বহুশরীরে প্রবিষ্ট হইব, এই সংকল্প দ্বারা ঈশ্বরই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারূপে চিদাভাস প্রতিফলিত করিয়া জগৎ প্রসূত করিয়াছেন। এইজন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি বিষয়ক সংকল্প অবধি সর্ব্ববস্তু অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্য এবং জাগ্রৎ অবস্থা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীব কর্তৃক কল্পিত।

বর্ত্তমান সমস্যা।

১

আজ বঙ্গবাসীর প্রাণে কে এ পবিত্র শক্তির সঞ্চার করিল? কে তাহাকে আজ নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিক্ষা দিল? কে আজ তাহাকে চিরন্তন ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করিয়া স্বাবলম্বনে অগ্রসর করিল?

যে আন্দোলন আজ 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত হইয়া উৎসাহী যুবকবৃন্দের হৃদয়কে নব নব আশায় উত্তেজিত করিতেছে, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া অনেক বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ দিতেছেন, গভর্ণমেণ্ট যে আন্দোলনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আন্দোলনকারিগণকে নিরুৎসাহ করিবার জন্য নানা নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ভিতরের মর্ম্ম যদি কেহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তবে তিনি বুঝিবেন, এই দুর্ব্বল জাতি মহাশক্তির প্রসাদে নিজশক্তি কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। স্থূলদর্শী বাহিরের কার্য্যে নানা ভুল ভ্রান্তি দেখিতেছেন বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী কখনই ইহাতে মূল তথ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবেন না।

ভিক্ষায় চিরাভ্যস্ত কখন তাহার ভিক্ষার অভ্যাস ভুলিতে পারে না। তাই এখনও অনেক স্থলে "বিধিসঙ্গত আন্দোলনের" স্থানে 'স্বদেশী' নামধারী ছদ্মবেশী 'বয়কটে'র প্রাদুর্ভাব। এখনও অনেকে গভর্ণমেণ্টকে ভয় দেখান বা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কাঁদা করাই জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া ভাবিতেছেন। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, ইহা ভিক্ষুকের ভীতি প্রদর্শন মাত্র। আমাদের রাজা যেরূপ বুঝিতেছেন, সেইরূপ কার্য্য করিতেছেন। প্রজাজাতির তাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র। প্রবলের সহিত দুর্ব্বল কখনও কোনরূপে ছলে বলে বা কৌশলে পারিয়া উঠে না।—এই কারণে যতদূর সম্ভব, রাজার কার্য্যে কোনরূপ বাধাপ্রদানের চেষ্টা, বা তাঁহাদের নিকট কোন প্রকার মিনতি, না করিয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের সবল ও উপযুক্ত করিবার চেষ্টাই; সুযুক্তিসঙ্গত।

আমরা এ সম্বন্ধে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে এই জাগ্রৎশক্তি সৎপথে পরিচালনা করিতে গেলে যেরূপ ভাবে চলা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ বিবেকানন্দ স্বামীর কয়েকটী মত প্রকাশ করিতে ক্রমশঃ চেষ্টা করিব।

দেশের যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হয়, তৎসম্বন্ধে স্বামীজি যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বা বৈদেশিক জাতির সহিত শত্রুতা করিয়া আমরা কখনও যে আমাদের উন্নতি করিতে পারি, এ চিন্তা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর ছিল। বরং তিনি শত শত স্থানে বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্যেরা সহায়তা না করিলে আমাদের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। যাঁহারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া খানিকটা স্নায়বীয় উত্তেজনাকেই সার স্বদেশহিতৈষিতা মনে করেন, তাঁহারা তাঁহার পরামর্শগুলিতে তত আকৃষ্ট না হইতে পারেন, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উহাতে অনেক সারসত্যের ইঙ্গিত পাইবেন। পাশ্চাত্যগণের সহায়তালাভ ও সহানুভূতি আকর্ষণের উপায় কি? স্বামীজি বলিতেন, সমান সমান না হইলে কখনও সহানুভূতি হয় না। আমরা চিরকাল শিখিব, কিছু শিখাইব না, এ ক্ষেত্রে pity হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধাসংযুক্ত সহানুভূতি হয় না। আমাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে।

হে অগ্রণীবর্গ, আপনারা পাশ্চাত্যগণকে কিছু শিখাইতে পারেন? নিরুত্তর কেন? কি সম্বল লইয়া আপনারা জাতীয় উন্নতি করিতে অগ্রসর? আপনাদের শিখাইবারও কিছু আছে—আপনাদের সেই প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা এখনও সমগ্র জগৎকে আলোক দিতে পারে। এখনও ভারতবর্ষে অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, যাঁহাদের এককণা জ্ঞান জগৎ সাগ্রহে শ্রবণের জন্য উৎসুক। আপনারা নিজেদের রত্ন নিজেরা চিনুন ও মুক্তহস্তে জগতে বিতরণ করুন। স্বামীজি একস্থলে বলিয়াছেন,—'ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড আমরা ধর্ম্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। এ দুর্দ্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভাসমিতি দ্বারা উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয় ইউরোপ বিজয় আমেরিকা বিজয়, তাহাতেই দেশের কল্যাণ।'

এখন সুধীবর্গ স্বামীজির এই একটি কথা স্থিরভাবে বিচার করুন দেখি। স্বামীজি স্বয়ং এ বিষয়ে পথপ্রদর্শনের পর তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার কয়েকটি গুরুভাই ও শিষ্য তাঁহার পথানুসরণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য দুইচারি জন অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত সাধুও এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ভারতবাসীর প্রতি পাশ্চাত্যদেশীয়ের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে রীতিমত প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা ব্যতীত

উদ্দেশ্যসাধনে সম্পূর্ণরূপে সফল হওয়া অসম্ভব। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, শুধু শাস্ত্রপাঠে ধর্ম্মের মর্ম্ম আয়ত্ত হয় না, সুতরাং সাধনাসহায়ে অগ্রে নিজের উন্নতি সাধন করিতে হইবে—আনুষঙ্গিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে এখন ক্ষেত্র যেরূপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ সহস্র সহস্র প্রচারকের কার্য্য-ক্ষেত্র উন্মুক্ত। আমাদের সজাতীয়গণ যদি ওকালতি ডাক্তারি বা গভর্ণমেণ্টের চাকরিব জন্য লালায়িত না হইয়া কয়েকজন এই ধর্ম্মপ্রচারকব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ অনেক কল্যাণের আশা করিতে পারা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ হইতে এরূপ স্বার্থত্যাগী শত শত যুবক আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু হে যুবকবৃন্দ, তোমরা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিয়া সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন ও তৎকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া সেই সাহেবেরই ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া বিচারভিক্ষা রূপ এ কি হাস্যো-দ্দীপক অভিনয় করিতেছ? স্বামীজির পথানুসরণ কর। দেখিবে, তোমার রাজার জাতি তোমার শিষ্য হইয়া তোমার পদসেবা করিবে। স্বদেশ-হিতৈষী হইবে ভাবিয়াছ? শুন, স্বামীজি স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে কি বলিতেছেনঃ—

"লোকে স্বদেশহিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশহিতৈষিতা মানি। স্বদেশহিতৈষিতার সম্বন্ধে আমারও একটা ধারণা আছে। মহৎ কার্য্য করিতে হইলে তিনটি জিনিষের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, হৃদয়বত্তা—আন্তরি-কতা আবশ্যক। বুদ্ধি,বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহা-শক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি অনাদি কাল হইতে অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞা-নের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতাকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে? তুমি কি এই সকল ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমায় ত্যাগ করি-

য়াছে? এই ভাবনা কি তোমার রক্তের সহিত মিশিয়া তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমার হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইযা তুমি কি তোমার নাম যশ, স্ত্রী পুত্র, বিষয় সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? স্বদেশহিতৈষী হইবার এই প্রথম সোপান।

"মানিলাম, তুমি দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দ্দশা প্রতীকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিযা কোন কার্য্যের পথ বাহির করিয়াছ কি? অজস্র অভিশাপ বর্ষণ না করিয়া তুমি যথার্থ কোন উপকার করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি?

"ইহাতেও হইল না। তুমি কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তুমি যাহা সত্যপথ ঠাওরাইযাছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমার স্ত্রীপুত্র তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমার ধন মান সব যায়, তথাপি কি তুমি উহাতে লাগিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, 'নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী আসুন বা যেথানে ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তেই হউক, তিনিই ধীর—যিনি সত্যপথ হইতে একবিন্দু বিচলিত না হন'। তোমার কি এরূপ দৃঢ়তা আছে?

"যদি এই তিনটী জিনিষ তোমার থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পার। সংবাদপত্রে লিখিবার বা বক্তৃতা দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তোমার মুখ এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি ধারণ করিবে।" ইত্যাদি।

স্বদেশহিতৈষিতার এই উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ ও কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ইহার জন্য কঠোর সাধনার আবশ্যক। অন্যান্য কথা ক্রমশঃ বলিতে চেষ্টা করিব।

স্বামীজির জনৈক সেবক।

আমি ও তুমি।

আমি— সারাদিন বসি গেঁথেছি মালিকা
বাঁধা প্রেম প্রীতি ডোরে,
আশার নেশার ঘোরে
চেয়ে পথ পানে রয়েছি বসিয়া,
তুলিয়া কুসুমরাশি!

তুমি— ত্রিভঙ্গ মুরতি ধরে একবার—
নয়ন মোহন সাজে,
বসি হৃদাসন মাঝে
পরিও মালিকা মিটায়ে বাসনা
দিবস অন্তরে আসি!

আমি— সারাটী যামিনী কেটেছি ভাবিয়া,
ভাসিয়ে নয়ন নীরে;
সংসার সাগরতীরে
পথভুলে বসে আছি দিশেহারা
তব দরশন আশে!

তুমি— নিশাঅবসানে দাঁড়ায়ে সম্মুখে—
দেখাইয়ো পথ আসি,
এ ঘোর তিমির নাশি,
এ শ্রান্ত জীবনে কয়ো দুটো কথা
মৃদুল মধুর ভাষে!

আমি— রাখি নাই কিছু দিয়াছি সকলি—
মন প্রাণ ভাগে ভাগে,
তব প্রেম অনুরাগে
দিয়াছি যে ডালি জীর্ণ তনুখানি
বাসনার করে তুলে!

তুমি— দিয়োগো আমায় করুণার কণা
তুলিয়া স্বকীয় করে,
রেখো স্নিগ্ধ চির তরে
বীণা বিনিন্দিত ঢালি সুধাধারা
জীবন তটিনী কূলে !

আমি— ভাসায়ে দিয়েছি জীবন তরণী—
সময় সাগর নীরে,
চলিতেছে ধীরে ধীরে,
অনন্ত ধারায় অন্ত অভিমুখে
অন্তে তোমা মিশিবারে !

তুমি— সময় থাকিতে হয়ে আগুয়ান্
আমার সে পথি মাঝে,
নিয়ো সে ভবন মাঝে :
করেতে ধরিয়া তুলিয়া আমায়—
দিও স্থান এক ধারে !

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ।

বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সাহায্য করিয়া বাধিত করিয়াছেনঃ—বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জ্জিলিং ৫৫৲, বাবু যদুপতি চট্টোপাধ্যায় শিলিগুড়ি ২০৲, বাবু রঙ্গলাল বসাক কলিকাতা ২০৲।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়ারের মহারাজ কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাহায্যার্থ ৫০০৲ টাকা দান করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আশা করি, অন্যান্য রাজা মহারাজগণ ইহাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। আশ্রমের কার্য্যের ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে।

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই মুর্শিদাবাদ রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রমের বালকদিগকে তাঁত চালাইতে শিখান হইতেছে। এক্ষণে আশ্রমে ৩ খানি তাঁত চলিতেছে,—উহাতে যে কাপড় গামছাদি প্রস্তুত হয়, তাহাতে আশ্রমভুক্ত প্রায় ৩০ জন ব্যক্তির কাপড়ের অভাব পূরণ হয়। আমরা ঐ কাপড় গামছা প্রভৃতি দেখিলাম। সম্প্রতি আর একখানি তাঁত বসাইবার কথা হইতেছে। আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ কলিকাতায় আসিয়া বিভিন্ন প্রকার তাঁতের সন্ধান লইতেছেন। কাশিমবাজারের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আশ্রমের শিল্পবিভাগের সমুদয় খরচপত্র বরাবর বহন করিয়া আসিতেছেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ দেখিয়া শুনিয়া যে প্রকার তাঁত আশ্রমের ব্যবহারোপযোগী মনে করিবেন, তাহা যত মূল্যেরই হউক না কেন, তাহারও খরচ দিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করি. সহৃদয় মহোদয়গণ মহারাজের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

সিরাজগঞ্জের বন্যা ও তদানুষঙ্গিক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি দুইজন সভ্যকে বন্যা ও কলেরা পীড়িতগণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। তাঁহারা সময়ে উপস্থিত হইয়া অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঔষধ পত্র, রেল ভাড়া প্রভৃতিতে ৫০৲ টাকার উপর খরচ হয়। তন্মধ্যে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রগণ ৭৵০, আহিরীটোলার কয়েকটি বন্ধু৫৲ টাকা, শশিভূষণ তালুকদার২৲ টাকা, সিমলার কয়েকটী বন্ধু ২৷০, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ১০৲টাকা রাজবাড়ী স্কুলের ছাত্রগণ ৩৸৵০ ও সমিতি অবশিষ্ট প্রদান করিয়াছেন। আমরা সমিতির সভ্যগণকে তাঁহাদের সদুদ্যমের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

প্রভাস।

(শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক।)

আমি পোরবন্দর বা সুদামপুরী হইতে জুনাগড় পোরবন্দর রেল-যোগে জেতালশ্বর (Jetalswar) জংশনে গাড়ি বদল করিয়া পথিমধ্যে জুনাগড় ষ্টেশনে নামিয়া, গিরনার দর্শনান্তে প্রভাস বা ভেরাভ্যাল (Veraval) ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পোরবন্দর হইতে (Shepherd) শেফার্ড কোম্পানীর ষ্টীমার যোগেও এখানে আসা যায়; কারণ, ভেরাভ্যাল পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। ইহা গুজরাটের একটী প্রধান বন্দর। এখানে স্থলপথে আসিতে হইলে বম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলের ওয়াড্‌-ওয়ান (Wadhwan) জংশনে গাড়ি বদল করিয়া জুনাগড় পোরবন্দর রেলযোগে অথবা সমুদ্রপথে বম্বে, কারাচী বা অপর যে কোন কাটিবারী বন্দর হইতে ষ্টীমার যোগে আসা যায়। পথিমধ্যে জুনাগড় ষ্টেশন হইতেই এখানকার একজন পাণ্ডা আমার সঙ্গ লইয়াছিল। আমি ভেরাভ্যাল ষ্টেশনে নামিয়াই উক্ত পাণ্ডার সহিত একখানি ঘোড়গাড়ি ভাড়া করিয়া প্রভাস যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন হইতে প্রভাস প্রায় ২ ক্রোশ। ষ্টেশন হইতে ভেরাভ্যাল বন্দরের ষ্টীমার ঘাট পর্য্যন্ত এক মাইল একটী সোজা রাস্তা আছে। আমরা এই রাস্তায় প্রায় একপোয়া পথ আসিয়া দেখি যে, বাঁ হাতি আর একটী রাস্তা ভেরাভ্যাল হইতে সমুদ্র উপকূলস্থ প্রান্তরের মধ্য দিয়া বরাবর প্রভাস পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরাও এইস্থানে প্রথমোক্ত রাস্তা ত্যাগ করিয়া ভেরাভ্যাল সহর পশ্চাতে রাখিয়া শেষোক্ত রাস্তায় প্রভাসের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রায় অর্দ্ধ মাইল আসিলে রাস্তার ডানহাতি সমুদ্রের দিকের প্রান্তরে একটী দেবমন্দির দেখা যায়।

মন্দিরটী খুব পুরাতন। এখন এখানে একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠ আছে। ভিতরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রাঙ্গনে একটী অশ্বত্থবৃক্ষ ও উহার নিকটেই একটী কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডা বলিলেন, এইস্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়া-

ছিলেন। মহাভারতের মৌষলপর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মৌষলযুদ্ধে সমুদায় যদুবংশ ধ্বংস হইলে এবং বলরাম দেহ ত্যাগ করিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাকুলচিত্তে এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পূর্ব্বে গান্ধারী তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন এবং তিনি উচ্ছিষ্ট পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্ব্বাসা যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি নারদ দুর্ব্বাসা ও কর্ণের বাক্য প্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গ গমন বিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহভঞ্জন ও ত্রিলোক পালন করিবার নিমিত্ত তাঁহার মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরা নামক ব্যাধ মৃগ বিনাশ বাসনায় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন পূর্ব্বক মৃগ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি শরনিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহাদ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগ গ্রহণ বাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক চতুর্ভুজ পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাঁহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাহাকে দর্শনমাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

এই স্থান হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া একেবারে প্রভাস সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সহরটী সরস্বতী সাগর সঙ্গমে অবস্থিত, ইহার এক দিকে সরস্বতী নদী ও অপর দিকে সমুদ্র; এখানে সরস্বতী নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। সহরটী খুব বড়, অনেক লোকের বসবাস। গৃহ সমুদায় প্রস্তরনির্ম্মিত, বাজার হাট দোকান পসারী বেশ গুলজার, লোকজনও বেশ সভ্য ভব্য। এ স্থান সমুদ্রউপকূলে অবস্থিত বলিয়া ব্যবসা বাণিজ্যও উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। অধুনা এই স্থান জুনাগড়ের অন্তর্ভূত। সহরে যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেক গুলি ধরমশালা আছে; ইহা ভিন্ন যাত্রিগণ সুবিধা বোধ করিলে পাণ্ডাদের বাটীতেও থাকিতে পারেন, পাণ্ডারাও বেশ সজ্জন এবং যাত্রীদের বিশেষ যত্ন করে। আমি পাণ্ডার সহিত সহর দেখিতে দেখিতে সহরমধ্যস্থিত একটী প্রকাণ্ড পুরা-

তন কেল্লা বা গড়ের মধ্য দিয়া ক্রমে সহর প্রান্তে পাণ্ডার বাটিতে উপস্থিত হইলাম এবং ঐ স্থানেই আপনার বাসা ঠিক করিলাম। পাণ্ডা আমাকে দোতলায় একটী পৃথক্ ঘর থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে আমি রাত্রে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

পর দিবস প্রাতে উঠিয়া পাণ্ডার সহিত পূজা ও শ্রাদ্ধোপকরণ দ্রব্যাদি বাজার হইতে খরিদ করিয়া সহরের বাহিরে আসিয়া অদূরেই সরস্বতী সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। এই সঙ্গমে জলনিধি ও সরস্বতীকে নারিকেল প্রভৃতি ভেট ও পূজা দিয়া উক্ত সঙ্গমজলে আচমন ও তর্পণ করিলাম। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি রমণীয়। নিম্নে নীলবর্ণের অপার জলনিধি ঠিক যেন একখানি দর্পণের ন্যায় পড়িয়া আছে, তাহার উপর শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় তরঙ্গমালা ক্রীড়া করিতেছে। উপরে দর্পণের ন্যায় নীলবর্ণের অনন্ত বিস্তৃত আকাশ বা ও তাহার কোলে শ্বেত বর্ণের মেঘ সকল খেলা করিতেছে। সুদূর সম্মুখভাগে, উপরের শ্বেত বর্ণের মেঘ অলঙ্কৃত আকাশ এবং নিম্নের তরঙ্গায়িত সমুদ্র যে কোথায় পরস্পর মিলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া স্থলের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, সম্মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ বালুকাময় শুভ্রবর্ণের প্রান্তর স্থানে স্থানে হরিৎ বর্ণের বৃক্ষ দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রান্তরের মধ্য দিয়া ক্ষীণকলেবরা সরস্বতী নদী একটী রজতরেখার ন্যায় প্রবাহিত হওয়ায় মনে হয়, ঠিক যেন গৌরবর্ণ আর্য্য ব্রাহ্মণের লোমপূর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত বিরাজিত রহিয়াছে। এ দিকে সমুদ্রের ঘোর গর্জ্জন ধ্বনি, অপর দিকে সরস্বতীর অপেক্ষাকৃত মধুর কুলু কুলু ধ্বনি এবং উপরে বা আকাশে বায়ু-প্রবাহের অতি ক্ষীণ শব্দ ; এই তিন ধ্বনি মিলিত হওয়ায় যেন বোধ হয়, প্রকৃতিদেবী স্বর গ্রামের উদারা, মুদারা, তারা এই তিন গ্রাম একত্র মিলাইয়া সঙ্গীত করিতেছেন।

এই সম্মুখবর্ত্তী সমুদ্র মধ্য হইতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজগুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রের উদ্ধার সাধন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন। হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব উননবতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অবন্তিপুরবাসী সান্দীপনির নিকট শিক্ষা সমাপ্তির পর তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্, এক্ষণে আমাদিগকে কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে অনুমতি করুন। সান্দীপনি তাঁহাদিগের প্রভাব বিষয় বিলক্ষণ

অবগত ছিলেন। গুরুদক্ষিণার কথা শুনিবা মাত্র তিনি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, বৎস, আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। প্রভাস তীর্থে লবণ সমুদ্রে তিমি মৎস্যে সেটিকে গ্রাস করিয়াছে। আমি সেই পুত্রটি দক্ষিণা প্রার্থনা করি। মহাত্মা কৃষ্ণ বলরামের মতানুসারে তাহাই স্বীকার করিয়া লবণ সমুদ্রে গমন এবং তাহার জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্র সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভগবান্ কহিলেন, বারিধে! ভগবান্ সান্দীপনির পুত্র কোথায়? সমুদ্র কহিলেন, পঞ্চজন নামক দৈত্য তিমিরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরু-পুত্র লাভ হইল না। তথায় এক শঙ্খ মাত্র লাভ হইল। ঐ শঙ্খ লোকে পাঞ্চজন্য বলিয়া বিখ্যাত। অনন্তর হৃষীকেশ সূর্য্যতনয় যমের নিকট উপ-স্থিত হইলেন। যম তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, দেব! আপ-নার আগমনের প্রয়োজন কি? আমাকে কি করিতে হইবে? তখন কৃষ্ণ কহিলেন, ভদ্র! আমাকে গুরুপুত্রটি প্রদান করিতে হইবে। যম তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন না। ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরে বাসুদেব যমরাজকে পরাজয় করিয়া তথা হইতে চিরনষ্ট গুরুপুত্রের উদ্ধার সাধন করিলেন। তাঁহার প্রভাব বলে চিরপ্রেত গুরুপুত্র পুনরুজ্জীবিত হইল।

এই সমুদ্র উপকূলেই মৌষল যুদ্ধে যদুবংশ বিনষ্ট হয়। মহাভারত মৌষল পর্ব্বে ও ভাগবতে লিখিত আছে যে, একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকা নগরে আগমন করিলে সারণ প্রভৃতি যাদবগণ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, এই বভ্রুর পত্নী কি প্রসব করিবে? মহর্ষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবে-চনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্ব্বৃত্তগণ, এই বাসুদেবতনয় শাম্ব, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষল প্রসব করিবে। মহাত্মা মধুসূদন ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনায় নিজ সামর্থ্য থাকিতেও সেই শাপ নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিলেন না। পরদিবস প্রভাতে শাম্ব এক মুষল প্রসব করিলেন; রাজপুরুষগণ নরপতির আজ্ঞায় সেই মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রের এই স্থানে নিক্ষেপ করিল। ঐ সকল মুষলচূর্ণ সমুদ্রোপ-

কূলে এরকা তৃণের আকার ধারণ করিল। এই সময় দ্বারকায় ভয়ানক দুর্নিমিত্ত সকল হইতে দেখিয়া মহাত্মা মধুসূদন মনে মনে যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায় বৃষ্ণিগণকে প্রভাস তীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। যাদব-গণ প্রভাসে আসিয়া সুরস মৈরেয় পানে মত্ত হওয়ায় ভারত যুদ্ধ ও স্যমন্তক মণির অপহরণ বিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া সাত্যকির সহিত কৃতবর্ম্মার ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদ উপলক্ষে যাদবগণ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে শস্ত্রের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে অস্ত্র শস্ত্র ফুরাইয়া যাইলে সেই মুষলচূর্ণ হইতে উৎপন্ন এরকা দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব বলদেবকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি নির্জ্জন প্রদেশে একটি বৃক্ষমূলে যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সহস্রশীর্ষ সর্প বিনির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। সেই সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইলে তাঁহার দেহ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। তখন ভগবান্ বাসুদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেহত্যাগ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া বিজন বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ঐ স্থানে তিনি জরা নামক ব্যাধ কর্ত্তৃক সেই মুষলেরই অংশবিশেষে নির্ম্মিত শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করেন। আমি ইতিপূর্ব্বে ভেরাভ্যাল সহরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের স্থান উল্লেখ করিয়াছি।

ভূভারহরণের জন্য ভগবান্, কৃষ্ণ বলরাম রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই প্রভাস তীর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এ কারণ যাদবগণ দ্বারকা হইতে পর্ব্বাদিতে স্নানের জন্য এই তীর্থেই আসিতেন। ইহা ভিন্ন মহাভারতে কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধ কালীন বলদেবের; বনবাস কালীন যুধিষ্ঠিরের; ও অপরাপর সময়ে অপরাপর ব্যক্তির তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে এই তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ সোমদেব দক্ষপ্রজাপতির রোহিণীপ্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দ্র অপরাপর স্ত্রী অপেক্ষা রোহিণীতে একান্ত আসক্ত হওয়ায় তাঁহার অপরাপর স্ত্রীগণ, স্বামীর এই অত্যাচারের কথা নিজ পিতা দক্ষকে নিবেদন করিলে, তিনি স্বীয় জামাতা চন্দ্রকে ডাকাইয়া সকল স্ত্রীর প্রতি সমভাবে প্রীতি প্রদর্শন করিতে বলিয়া দেন। কিন্তু চন্দ্র দক্ষের কথা

অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রোহিণীতেই আসক্ত থাকেন। এই কারণ প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে যক্ষ্মা হউক বলিয়া শাপ প্রদান করেন। ভগবান্ চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, ওষধি সকল নিস্তেজ, আস্বাদশূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন লোক সকল নিতান্ত কৃশ ও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। দেবগণ ইহা অবগত হইয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট যাইয়া তাঁহাকে চন্দ্রের শাপ শান্তির জন্য অনুরোধ করিলে, দক্ষ প্রসন্ন হইয়া নিশাকরকে প্রভাস তীর্থে অবগাহন করিয়া মহাদেবের আরাধনা পূর্ব্বক পত্নীগণের প্রতি তুল্য স্নেহ প্রদর্শন করিতে আদেশ করেন। চন্দ্র প্রভাসে আসিয়া সরস্বতী তীরে, তীর্থ সকলকে আবাহন পূর্ব্বক যথাবিধি পার্থিব লিঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ছয় মাস নিরন্তর বৃষভধ্বজকে পূজা করিলে ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্নমনে চন্দ্রকে এই বর দিলেন যে, কৃষ্ণপক্ষে তোমার কলার প্রতিদিন ক্ষয় হইবে; কিন্তু শুক্লপক্ষে সেই কলার নিরন্তর বৃদ্ধি হইবে। মহাদেব এইরূপ বর দান করিলে, চন্দ্র, দেবতা ও ঋষিগণের সহিত, ভগবান্ উমাপতিকে এই স্থানে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রের যশের নিমিত্ত চন্দ্রের নামানুসারে সোমেশ্বর বা সোমনাথ নামক জ্যোতির্লিঙ্গে এইস্থানে অবস্থান করিলেন। ভগবান্ চন্দ্র অমাবস্যায় প্রভাস তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং উক্ত সোমনাথ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। এই তীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন। ইহা চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া লোকমধ্যে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র, ত্বষ্টাপুত্র বৃত্রকে বধ করায় ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁহাকে আশ্রয় করে। তখন তিনি স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক মানস সরোবরের জলমধ্যে পদ্মনালের ভিতর সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করেন। ঐ সময়, চন্দ্রবংশসম্ভূত রাজা নহুষ দেব ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্য পালন করিতেন। তিনি ইন্দ্রপত্নীকে কামনা করিলে, শচী বৃহস্পতির পরামর্শে নহুষকে ঋষিবাহ্য যানে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে বলেন। নহুষ ঋষিবাহ্য যানে চড়িয়া শচীর নিকট আসিবার কালীন, পথে অগস্ত্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হওয়ায় সর্পরূপ প্রাপ্ত হন। একারণ স্বর্গরাজ্য পুনরায় অরাজক হইলে, দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ

শান্তির জন্য এই সরস্বতী তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। যজ্ঞান্তে সরস্বতীতে স্নান করিয়া ইন্দ্র উক্ত ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। এই সকল কারণে প্রভাস তীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এখনও হিন্দুগণ প্রত্যহ স্নান করিবার সময় (কুরুক্ষেত্রগয়াগঙ্গাপ্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থাণ্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ॥) এই প্রভাস তীর্থের নাম উল্লেখ করিয়া স্নান করেন। বিশেষতঃ এখানে মহাদেবের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সোমনাথ আছেন বলিয়া এই স্থানের আরও মাহাত্ম্য।

আমি পাণ্ডার সাহায্যে সরস্বতী সাগর সঙ্গমে তীর্থকার্য্য সমাধা করিয়া সরস্বতী নদীর ধারে ধারে প্রায় এক পোয়া পথ আসিয়া একটী পুরাতন ঘাটে স্নান ও শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিলাম। পাণ্ডা বলিলেন যে, এই স্থানে ভগবান্ চন্দ্র স্নান করিয়া যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত হন। এখানে ঘাটের উপর একটি মঠ বা আখড়াবাটী আছে। উহার মধ্যে কয়েকজন সাধু বাস করেন এবং ঐ স্থানে কয়েকটী দেব দেবীর মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া আমি পাণ্ডার সহিত এই স্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে সরস্বতীর আরও খানিকটা উপরে উক্ত নদীর তটে অপর একটি মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই মন্দিরটীও খুব পুরাতন, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে একটি ঘরে শ্বেতপ্রস্তরের বলদেব মূর্ত্তি যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় বিরাজিত, মূর্ত্তির মুখ দিয়া একটি সর্প খানিকটা বাহির হইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডা বলিলেন যে, মৌষল যুদ্ধের পর এই স্থানে বলরাম দেহত্যাগ করেন। এখান হইতে বাহির হইয়া আমি সরস্বতী কূলে আরও ২।৩ টী মন্দির দর্শন করিবার পর সহরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, একটি গলির মধ্য দিয়া সোমনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এটী সোমনাথের নূতন মন্দির, পুরাতন মন্দির যাহা মহম্মদ গজনবী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, তাহা এখান হইতে প্রায় এক পোয়া দূরে সমুদ্রোপকূলে ভগ্নাবস্থায় এখনও পড়িয়া আছে। পুরাতন মন্দির ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক অপবিত্র হওয়ায় এই নূতন মন্দিরে সোমনাথের প্রতিষ্ঠা হয়। এই মন্দিরে প্রবেশের দুই রাস্তা দিয়া দুইটী দ্বার আছে। মন্দিরটী খুব বড়; প্রবেশ করিয়া প্রথমেই আমি একটী উঠান দেখিতে পাইলাম, ইহার সম্মুখের ঘরে সোমনাথ বিরাজিত। সম্মুখেই পাষাণের নন্দী বা ষাঁড়

রহিয়াছে। ঘরের ভিতর সোমনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। লিঙ্গটী বেশ বড়। ঘরে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পূজা পাঠাদি করিতেছেন। আমিও পাণ্ডার সাহায্যে ভক্তিভাবে ভগবান্ ভবানীপতির এই জ্যোতির্লিঙ্গের পূজা করিয়া ঘরের বাহিরে আসিলাম। বাহিরের দালানে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা শৃঙ্খলের সাহায্যে লম্ববান। যাত্রিগণ মহাদেবের প্রীতির জন্য এই ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। আমি অপর দ্বার দিয়া এই মন্দির হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডার বাটীতে, নিজ বাসায় গমন করিলাম।

এখানে আহারাদি করিয়া ক্ষণেক বিশ্রামের পর বৈকালে সোমনাথের পুরাতন মন্দির দেখিতে গমন করিলাম। সহরের প্রান্তদেশে সমুদ্রের উপকূলেই এই মন্দির অবস্থিত, প্রায় ৫০।৫০ হাত চতুষ্কোণ একতলা সমান উচ্চ ফ্লোরের উপর ইহা নির্ম্মিত, এ কারণ মন্দিরে উঠিবার কয়েকটি সিঁড়ি আছে। মন্দিরটী প্রস্তরে নির্ম্মিত, বহির্গাত্র প্রস্তরের নানা কারুকার্য্য দ্বারা খচিত, ও প্রায় ৪০ হাত উচ্চ হইবে। মন্দিরের স্তম্ভগুলি পূর্ব্বে রত্ন-জড়িত ছিল, এখন আর সে সকল কিছুই নাই। মন্দিরের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দ্বারদেশের থিলানটী প্রায় ৮।১০ হাত উচ্চ; কিন্তু সেই চন্দনকার্ষ্ঠের কারুকার্য্য শোভিত দ্বার এখন আর এখানে নাই। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট উহা এখন আগরার কেল্লার মধ্যে সাধারণের দর্শনার্থ রাখিয়া দিয়াছেন। মন্দির মধ্যে মহাদেবের স্থান এখন খালি পড়িয়া আছে; অপর কোন মূর্ত্তিও এখন এখানে নাই। পার্শ্বে সমুদ্র থাকায় উহার তরঙ্গ সকল মন্দির পর্য্যন্ত আসিতেছে। ১০২৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদ গজনবী ভারত লুণ্ঠন করিতে আসিয়া সোমনাথের ভারতবিখ্যাত যশ ও ধনসম্পত্তির কথা শুনিয়া গুজরাট বা সৌরাষ্ট্রে আসিয়া এই দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া প্রভূত রত্নাদি ধনসম্পত্তি লইয়া যান। উপস্থিত স্থানীয় লোকে এই মন্দির হইতে প্রস্তরাদি খুলিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ভারতের এই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থে, ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া এই অত্যাচারের হস্ত হইতে মন্দিরটী রক্ষা করিয়াছেন। এ কারণ দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত আছে। দর্শকগণ এখানকার পঞ্চায়েতের নিকট হইতে দেখিবার জন্য পাশ আনিলে তবে প্রহরী এই মন্দির তাহাদিগকে দেখিতে দেয়। যাত্রিগণ পাশ আনিবার কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিলে উক্ত প্রহরীকে দুই চার পয়সা দিলে সে নিজেই পাশ আনিয়া দেয়।

কারণ গবেষণা।

(স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।)

অবনীমণ্ডলে এরূপ দূরদর্শী অতি বিরল, যিনি কখনও কারণ গবেষণাতে লীন বা অর্দ্ধবিলীন হইয়া ভাবী সিদ্ধান্তের মার্গ আবিষ্কার না করিয়াছেন। কার্য্যমাত্র অবলোকন করিয়াই পরিতৃপ্ত হওয়া মস্তিষ্কবিহীনের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অমাবস্যার জ্যোৎস্নার ন্যায় অত্যন্ত অসম্ভব। সৌদামিনীর চমক, জলদমালার গর্জ্জন ও গভস্তিমালীর প্রচণ্ড দেখিয়া অবিচারশীল জনের মানসসরোবর তরঙ্গায়িত না হইতে পারে, পরন্তু মনীষীকে অবশ্যই বিচারণা তটিনীতে মগ্ন হইতে হয়।

কারণগবেষণাই মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের আবাসভূমি করে। যাহার উহা নাই, সে কেবল নামেই মনুষ্য। বর্ত্তমান সময়ে যে অভিনব আলোক চতুর্দ্দিকে প্রতিভাত হইতেছে, যাহা বহুদিনের তিমিরপটলীকে সমাজনয়ন হইতে দূরীভূত করিতেছে, উহাও ঐ কারণানুসন্ধিৎসার ফল। যে পুরুষে উহার মাত্রা অধিক, তিনিই প্রকৃত দূরদর্শী শব্দের বাচ্য, তিনিই অভিজ্ঞসমাজের আদরণীয়; তাঁহার প্রসাদেই নূতন তত্ত্বের অবতারণা এবং তাঁহার দ্বারাই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে পারে। যিনি ঐ বিষয়ে উদাসীন ও বীতশ্রদ্ধ, তিনি ভক্তিস্রোতস্বিনীতে কোনরূপে ভাসিয়া আপনাকে কিছুদূর অগ্রসর করিতে পারিলেও পূর্ণবিবেকবত্তাতে অধিকারী বা জনসমাজের নেতা হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। যাঁহারা ভক্তির দোহাই দিয়া জ্ঞানের অনাদর করেন এবং বিচারশৈলে আরোহণ করিতে ভীত ও চকিত হয়েন, তাঁহাদের ভাগ্যে বিধাতা কেবল সাময়িক ভাবাবেশই লিখিয়াছেন, তাঁহারা কোনক্রমেই চিদানন্দ জলধির যাত্রীত্ব পদে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। অতলস্পর্শ ঐ প্রশান্তমহাসাগরে একমাত্র বিবেকী পুরুষই মগ্ন হইতে পারেন এবং একবার মগ্ন হইলে আর কখনও সংসাররূপ পঙ্কিল তীরভূমিতে আগমন করেন না। তখন তাঁহারা চিন্ময় নীরের অভ্যন্তরেই লীলা বিলাস করিতে থাকেন এবং স্বয়ং চিন্ময় হইয়া যান।

কারণানুসন্ধিৎসা ব্রতে সুদীক্ষিত হইলে মানব স্থূলসংসারে আর কখনও আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না। অর্দ্ধাঙ্গিনী ও নন্দনাদি আত্মীয়-বর্গকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া কেবল তাহাদের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করা অপেক্ষা উচ্চতর ব্রতসমূহ তাঁহাকে ভিন্ন পথাবলম্বনে বাধ্য করে। উহাই তাঁহার কর্ণকুহরে বলিয়া দেয় যে, স্বার্থসুখ বিষময়, উহার সেবনে প্রাণহারা হইতে হয় এবং ঐ মহামন্ত্রই তাহার জীবনকে একবারে নূতন করিয়া তুলিয়া তাহাকে অধ্যাত্ম জগতের পথ প্রদর্শন করিয়া দেয়। উহারই প্রভাবে অগ্রে বিবেকানন্দ লাভ হইয়া পশ্চাৎ তাহার হৃদয়াকাশে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতে থাকে। কারণগবেষণার শরণ লইলে পামর দেবত্ব লাভ করে, নাস্তিক আস্তিক অপেক্ষাও উদার হইয়া থাকে।

কে বলিতে পারে, কারণে এ অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ শক্তি কোথা হইতে আইসে? ধরিত্রীর গুরুত্বাকর্ষণ শক্তিও ইহার নিকট পরাভূত হইয়া যায়! যেখানে সমীরণ বা রবিকিরণের গতিবিধি নাই, সেখানেও চপলা অপেক্ষা দ্রুত গতিতে ঐ আকর্ষণ শক্তি মনকে লইয়া ধাবমান হয়! কখনও অতল জলধিতলে কখনও সৌরজগতের উপরিতলদেশে কখনও বা উভয়ের অন্তরালে উহার প্রেরণায় মানসবিহঙ্গ অবিশ্রান্ত ঘুরিতে থাকে—সুখ নাই, শান্তি নাই, বাতাহত শুষ্কপত্রবৎ কোনই ভ্রাম্যমান, কোন স্থানেই স্থিরতা লাভে সমর্থ হয় না! আবার তাহার উপর নিরাশা-পিশাচিনীর করাল মুখব্যাদান ও শত শত বিষম ঘটনাস্রোতের আবর্ত্তন প্রভৃতিতে পড়িয়া জীবদ্দশাতেই মন মৃতপ্রায় হইয়া উঠে অথচ ঐ শক্তির হস্ত হইতে পলাইবার সাধ্য থাকে না। পরন্তু চক্রনেমির ন্যায় ঘটনাসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। চিরদিন কিছুই এক অবস্থাতে কালহরণ করে না। সুখদুঃখাদি সকল দ্বন্দ্বই সাবধিক। মায়ার রাজ্যে লৌকিক ঘটনা মাত্রই পরিণামগ্রস্ত। একমাত্র নিরাময় ব্রহ্মজ্যোতিঃই অপরি-বর্ত্তনীয় ও একভাবাপন্ন। দেখিতে দেখিতে আবার তাহার প্রাণে আশা-নির্ঝরিণী বহিতে থাকে এবং উহাতে অবগাহন করিয়া আবার তাহার মন শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়।

কারণবিচারণার বাল্য অবস্থাতে ঐ প্রকার হইলেও উহার যৌবন ও বার্দ্ধক্যে অতুল আনন্দ বর্ত্তমান। উহার ষোড়শাংশের একাংশ দেবরাজের ভাগ্যেও সংঘটিত হয় না।

কারণানুসন্ধিৎসার শৈশব ভয়াবহ দেখিয়াই অনেকে আতঙ্কিত হইয়া থাকেন এবং উহার উপরে অন্যায় অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, উহা নীরস, ভক্তির অন্তরায় ও বিশ্বাসমহীরুহের নিম্মূলনকারী কুঠারস্বরূপ। বস্তুতঃ উহার ঐ অবস্থার সমালোচনা করিলে মনে অনেক প্রকার আশঙ্কা উদিত হয়, সকল আশা ভরসা নষ্টপ্রায় হইয়া উঠে এবং হৃদয় ক্রমশঃ উহা হইতে দূরে গমন করিতে চাহিয়া থাকে। সম্মুখে দুঃখের বিকট দৃশ্য দর্শন করিয়া মন সহজেই বলিয়া উঠে, হরি হরি আর বিচারে কায নাই, প্রেমে ভেসে যাই। আবার ইহা এক বিষম সমস্যা! যে ফল পরিপক হইলে অমৃতময়, তাহাই আবার অপক্কাবস্থায় মহাতিক্ত! যে কারণানুসন্ধান অচিরে মানবকে ব্রহ্মানন্দ সুধার অধিকারী করিবে, তাহাই আদিম অবস্থাতে নিরাশা, দুঃখ ও সংবস্তুতার ছবি দেখাইয়া তাহাকে স্তম্ভিত এবং বিরক্ত করিয়া থাকে। অদূরদর্শীর মন অবশ্যই ঈদৃশ ঘটনায় দোলায়মান হইতে পারে। বিচারবিমুখ ভক্তপ্রবরের উহা হইতে সুদূরে পরাহত হইয়া থাকেন। কিন্তু মুগরাহত লৌহপিণ্ডের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বিবেকানুরক্ত মনস্বীর মন ঐ ঘটনা দ্বারা বারংবার আহত হইয়াও ভগ্নতার পরিবর্ত্তে দৃঢ়তাই অবলম্বন করে—প্রভূত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ঐ মার্গেই অগ্রসর হইতে থাকে এবং সাময়িক নিরাশা কুজ্ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া পথভ্রষ্ট না হইয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে প্রজ্বলিত হইতে থাকে। যাঁহারা কথায় কথায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন এবং যাঁহাদের কোমলতা দেখিয়া অবলাবৃন্দও পরাজিত হয়, তাঁহাদের জন্য কারণগবেষণার কঠোর মার্গ প্রবর্ত্তিত নহে। তাঁহারা ভক্তিরই শরণাপন্ন হউন, উহা দ্বারাই ভবিষ্যতে জ্ঞানামৃত পানে অধিকারী হইবেন।

কারণগবেষণার উচ্চ শিখরারোহণে অধিকারী একমাত্র ধীমান্ বীরচূড়ামণি। স্ত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তির উহাতে সম্পূর্ণ অনধিকার। উহার প্রথম অবস্থার দুঃখাদি দেখিয়াই হতাশ হওয়া বিমৃশ্যকারীর কার্য্য নহে। সংসারে এমত গরীয়ান্ বস্তু অতি বিরল, যাহাকে লাভ করিতে যাইয়া ক্লেশের আলিঙ্গন না করিতে হয়—যাহার সংযোগের নিমিত্ত বাধা বিপত্তির মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

কারণ বিচারণার অন্তিম সোপানে উপনীত হইলেই সিদ্ধান্তপ্রাসাদের সুবিমল শোভা দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা দর্শকের মনে যুগপৎ এমন শান্তি

ও আনন্দ ধারা প্রবাহিত করে যে, স্মৃতিপটে চিত্রিত পূর্ব্বতন দুঃখরাশি এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়।

হৃদয়াকাশে সিদ্ধান্তচন্দ্রমার পূর্ণ উদয় হইলেই মানুষ অভিনব কান্তি ধারণ করে। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে স্বতঃই গাম্ভীর্য্য ক্ষরিত হইতে থাকে। কোনপ্রকার অবান্তর কারণ নির্ণয়েই জীবের ঈদৃশ অবস্থার উদয় হয়। আবার অগণ্য পুণ্যোদয়ে যখন সে আদি কারণ সিদ্ধান্তে সমর্থ হয়, তখন চিরদিনের মত শিবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়! তখনই সে মায়া কল্লোলিনীর পরপারে চলিয়া যায়। ইহাই সাধন রাজ্যের অন্তিম মর্য্যাদা, ইহাই মানবীয় শক্তির চরম পরাকাষ্ঠা। এই অবস্থাতে উপনীত হইবার জন্যই অধ্যাত্ম বিদ্যার সৃষ্টি। এই অলোকসামান্য পীযুষময়ী অবস্থা লাভে যোগ ভক্তি আদি সহায়ক হইলেও কারণগবেষণাই উহার মুখ্য হেতু। এজন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে উত্তম অধিকারীর জন্য একমাত্র বিচারমার্গই নিয়মিত হইয়াছে।

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাত্তত্ত্বধীর্ণ হি।
যোগোমুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥

ভগবান্ ভাষ্যকারও বিচারকেই ব্রহ্মাবাপ্তির মুখ্যকারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

ভাষাজলধি মন্থন করিয়া এই ব্রহ্মশব্দামৃত পাওয়া গিয়াছে। ইহার উচ্চারণ মধুময়, লিপি মধুময়, অর্থানুভবের কথা অধিক আর কি বলিব! উহার অর্থকল্পনাই মানস উদ্যানে শত শত ধারে অমৃতপ্রস্রবণ প্রবাহিত করে। যিনি এই ব্রহ্মামৃতের পিপাসু এবং প্রপঞ্চজালকে শূলময় অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কারণবিচারণাই মুখ্য অবলম্বনীয়। ইহার আদিম ভূমিকায় দুঃখের বিভীষিকা কিন্তু অন্তিম ভূমিকায় শান্তি ও আনন্দের উৎস।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।)

প্রতিদিন বৈকালে গ্রামস্থ এবং নিকটস্থ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের রমণীগণ রামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিতেন এবং বলিতেন, "কি আশ্চর্য্য! ইহাকে রোজ রোজ দেখিতে ইচ্ছা হয়।" দশকর্ম্মান্বিত রামকুমার স্বস্ত্যয়ন কার্য্য করিতেন, ইহাতে তাঁহার অতি অল্পই আয় হইত কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার কার্য্যের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রামকুমার রোগীকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিতেন, সে বাঁচিবে কিনা, এবং যদি বাঁচিবার লক্ষণ দেখিতেন, তবেই তাহার স্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। রাম-চাঁদ তাঁহার মাতুল মহাশয়কে প্রতিমাসে পনের টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন এবং নবজাত শিশুর জন্য একটী দুগ্ধবতী গাভী দিয়াছিলেন। সুতরাং খুদিরামের সংসারে আর কোনও অভাব ছিল না।

খুদিরামের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, তাঁহার নবজাত পুত্রটী স্বয়ং ভগবান্; এবং ৺গয়াধামে শ্রীগদাধরের স্বপ্ন স্মরণ করিয়া শিশুকে গদাধর বা গদাইচাঁদ ডাকিতেন। গদাই ভূমিষ্ঠ হইবার পর নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। চন্দ্রাদেবী সময়ে সময়ে ঐ সকল ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেন, বুঝি তাঁহার পুত্রকে ভূতে পাইয়াছে, এবং প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হইয়া রোজা ডাকাইতেন।

রামকৃষ্ণ দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। ছয়মাসে পড়িলে তাঁহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণের দিন স্থির হইয়া গেল। গ্রামস্থ প্রবীণ লোকেরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই উপলক্ষে সমগ্র গ্রামের লোকদিগকে সমারোহ করিয়া ভোজনাদি করাইতে অনুরোধ করিলেন। খুদিরাম প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন কিন্তু প্রতিবেশীরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিনি সম্মত হয়েন কিন্তু কেবল মাত্র তাঁহার সঙ্গতিপন্ন ভাগিনেয় রামচাঁদের সাহায্যে স্বগ্রামস্থ সমস্ত লোক, আপনার যাবতীয় আত্মীয়গণ এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান। খুদিরাম পরম দয়ালু ছিলেন, তিনি এই সঙ্গে

বহুসংখ্যক কাঙ্গালীকে বিশেষ যত্নের সহিত সমভাবে ভোজন করাইয়াছিলেন। গ্রামের অনেকে শিশুকে আপনাপন বাটীতে হইয়া গিয়া অন্ন খাওয়াইয়াছিলেন। বালকের নাম রাখা হইল রামকৃষ্ণ কিন্তু খুদিরাম পুত্রকে সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী জ্ঞানে পূর্ব্ব হইতেই গদাধর বা গদাই এবং অন্যান্য সকলেই গদাই বলিয়া ডাকিতে ভাল বাসিতেন।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে একদিবস চন্দ্রাদেবী নিদ্রিত গদাইচাঁদকে মশারির মধ্যে বিছানায় শয়ন করাইয়া স্নানে গমন করেন। স্নানান্তে আপন প্রকোষ্ঠে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পুত্র নাই, তাহার স্থানে পাঁচ সাত বৎসরের এক বালক শয়ন করিয়া আছে। চন্দ্রাদেবী ভয়ে অধীর হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বামীকে ডাকিয়া ব্যাপারটি দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "ছেলেকে ভূতে পেয়েছে, ওঝা এনে দেখাও।" খুদিরাম কিন্তু কোন ঘটনাতে বিচলিত হইতেন না এবং কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস টলিত না; তিনি কহিলেন, "দেখ, চুপ কর, গোল করিও না। আর একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। সেই যে গয়াধামে স্বপ্ন দেখেছিলুম, সেই জন্যই এই রকম হচ্ছে। এসব কাহাকেও বোলো না।" কিন্তু রামকৃষ্ণের মাতা তাহা বিস্মৃত হইয়া কহিলেন, "তুমি ভূতের ওঝা আনিয়ে দেখাও, গতিক ভাল নয়; আমার মন স্থির হচ্চে না।" খুদিরাম পুনরায় বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি জান্‌তে পেরেছি ইনি সাধারণ ছেলে নন। আর এই সকল ঘটনাতেই আমার আরও প্রত্যয় হচ্চে যে, স্বয়ং গদাধরই এসেছেন। যাহা হোক্, তুমি ভেবোনা। ঘরে রঘুবীর আছেন, তিনি রক্ষে করবেন সন্দেহ নেই।" ইতিমধ্যে পুনরায় গদাই নিজরূপ ধারণ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন দেখিয়া ও স্বামীর কথায়, চন্দ্রাদেবী অনেকটা শান্ত হইলে, খুদিরাম নিজকক্ষে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে দিন, মাস, বৎসর অতীত হইতে লাগিল; প্রায়ই কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিত; চন্দ্রাদেবীও কখন বা অত্যন্ত ভীতা হইতেন, আর তাঁহার স্বামী কিম্বা ধনি কামারণী তাঁহাকে বুঝাইত। ধনি প্রায় সর্ব্বদাই চন্দ্রাদেবীর নিকটে থাকিয়া বালককে সাক্ষাৎ গোপাল জ্ঞানে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকিত। গদাইও দিনদিন বড় হইতে লাগিলেন; তাঁহার রঙটা গৌর, গঠন অতি কোমল কিন্তু কৃশ, মুখে সর্ব্বদাই আনন্দ মাখা আর মাথায় বালিকাদের ন্যায় দীর্ঘ কেশ। যে একবার দেখে, সেই ভাল-

বাসে; সমস্ত গ্রামের ছেলেরা গদাইকে ভাল বাসে ও তাঁহার সঙ্গে খেলায় পরমানন্দ পায়। গ্রামের রমণীগণ গদাইচাঁদকে স্বহস্তে খাওয়াইতে ভালবাসেন, অনেকে বাটিতে নূতন কোন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে গদাইকে না খাওয়াইয়া আপনারা তাহা গ্রহণ করিতেন না এবং আপন সন্তানদেরও দিতেন না। যাঁহাদের বাটী একটু দূরে, তাঁহারা সর্ব্বদা আসিয়া বা গদাইকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিতে ও সাধ মিটাইয়া তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে পারিতেন না, এজন্য দিনান্তে একবারও আসিয়া গদাইকে কিছু খাওয়ান জীবনের একটী অত্যাবশ্যক কার্য্য জ্ঞান করিতেন। গদাইও ক্রমে নিজ পল্লীতে পরে সমগ্র গ্রামের লোকের বাটী যাইয়া সকলের সঙ্গে নানা প্রকার ক্রীড়া, গান ও গল্প করিয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পল্লীগ্রামে বালকেরা দল বাঁধিয়া কেহ আপন বস্ত্রপ্রান্তে কেহ বা একটী ছোট ধামিতে মুড়ি খাইতে খাইতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও খেলা করিয়া বেড়ায়। গদাইও সেইরূপ মুড়ি খাইতে খাইতে গ্রামপ্রান্তে মাঠে যাইয়া সমবয়স্কদিগের সঙ্গে নানা প্রকার লীলা করিতেন। গদাই বাটীতে কাহাকেও কিছুই না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতা চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এদিকে গদাই মাঠে যাইয়া রাখাল বালকদের সহিত গোষ্ঠলীলা করিতেছেন; তাহাদের শ্রীদাম সুদাম সাজাইয়া এবং আপনি কৃষ্ণ সাজিয়া গোচারণ করিতেছেন। কখন কখন কোমল তৃণ তুলিয়া ধেনুগণকে খাওয়াইতেছেন; এবং মিঠাই মুড়কি ক্রয় করিয়া রাখাল বালকদিগকে খাওয়াইয়া তৎপরে তাহাদের উচ্ছিষ্ট আপনি গ্রহণ করিতেছেন। পঞ্চম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত গদাই এইরূপ গোষ্ঠবিহার করেন। একদিন এইরূপ ক্রীড়া করিতেছেন,এমন সময়ে একখানি নবীন মেঘের উদয় হয়। গদাই সেই নবজলধরের নিবিড় কৃষ্ণকান্তি অবলোকন করিতে করিতে নিস্পন্দ ও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; অমনি হস্তস্থিত ধামির মুড়িগুলি ভূতলে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পুনরায় বাহ্যজ্ঞান আসিলে বালকগণের সহিত পূর্ব্ববৎ খেলা করিতে লাগিলেন। যেখানে যাত্রা বা রামায়ণ গান হইত, গদাই সর্ব্বাগ্রে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতেন, এবং একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, জীবনে আর তাহা বিস্মৃত হইতেন না। এইজন্য কৃষ্ণলীলার ও রামায়ণের পালাগুলি তাঁহার সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ছিল; এবং মাঠে যাইয়া বালকদিগকে লইয়া গদাই সেই সকল গান ও যাত্রার পুনরভি-

নয় করিতেন, কখন বা সমগ্র যাত্রার অভিনয় করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট ও অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। সঙ্গী বালকগণ গদাইয়ের এইরূপ ভাব দেখিয়া মনে করিত, বুঝি বা গদাইকে ভূতে পাইয়াছে এবং সেইজন্য তাঁহার কর্ণে রামনাম শুনাইয়া তাঁহার চৈতন্যোৎপাদন করিত। গ্রামস্থ অনেকে গদাই কেমন কৃষ্ণলীলা করেন দেখিবার জন্য, দূরে অন্তরাল হইতে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেন।

প্রতিবৎসর গ্রামের জমিদার লাহাদের ধর্ম্মশালায় অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। এই সময়ে গদাই প্রায়ই বাটীতে আসিয়া আহার করিতেন না; অতিথিশালায় উপস্থিত হইয়া সাধুসন্ন্যাসীদের ধর্ম্মচর্চ্চা শ্রবণ করিতেন; এবং তাঁহারা গদাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অতি যত্ন সহকারে তাঁহাকে আপনাদের ভিক্ষান্ন ভোজন করাইয়া অঙ্গে তিলক বিভূত্যাদি লেপন করিয়া দিতেন। গদাই আপনার পরিধের বস্ত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্ন্যাসীদের ন্যায় কৌপীন পরিয়া বসিয়া থাকিতেন। সাধুগণ তৎপরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলে এবং তাঁহার মাতা গদাইয়ের এই ভাব দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলে তাঁহারা বলিতেন, "মা, আমরা তোমার ছেলেকে বড় ভালবাসি। তুমি কোন ভয় করিও না, আমরা গদাইকে লইয়া যাইব না। তবে আমরা এখানে যতদিন থাকিব, তোমার ছেলেকে ছাড়িব না।"

কামারপুকুর হইতে অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে ভূরশোভা বা ভুরস্বুবা নামে এক গ্রাম আছে। তথায় মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বিখ্যাত দাতা ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সহোদর রামজয় খুদিরামের পরমবন্ধু ছিলেন। ইঁহারা প্রচুর সম্পত্তিশালী জমিদার এবং সেই নিমিত্ত সকলে মাণিকচন্দ্রকে মাণিকরাজা বলিত। খুদিরাম প্রায়ই গদাইকে লইয়া তাঁহাদের বাটিতে যাইতেন। গদাইকে তাঁহারা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এমন কি, খুদিরামের আগমন অপেক্ষা না করিয়া স্ত্রীলোক পাঠাইয়া গদাইকে আনাইতেন এবং বহুবিধ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন। এক দিন এইরূপ ভোজনাদি করাইয়া কিছু গহনা পরাইয়া দেন। রামজয় খুদিরামকে বলিতেন, "সখা, তোমার পুত্রটি সামান্য নয়। ইহাকে আমার দেবতা বলিয়া জ্ঞান হয়।"

এক দিবস গ্রামের প্রৌঢ়া রমণীগণ দল বাঁধিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া দেবীদর্শনমানসে অল্পদূরবর্ত্তী আনুড় গ্রামে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ গদাই অচৈতন্য হইয়া পড়েন, শরীর স্পন্দহীন। যে সকল স্ত্রীলোক সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা বালকের এই জড়বৎ ভাব দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হই-লেন এবং গদাইয়ের প্রাণবিয়োগাশঙ্কায় রোদন করিয়া কহিতে লাগি-লেন, "আমরা ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে হারালুম; বাড়ীতে গিয়ে এর মাকে কি বোল্‌ব?" লাহাদের গৃহিণী গঙ্গাবিষ্ণু লাহার মাতা ইহাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি গদাইকে বেশ চিনিতেন ও ভক্তি করিতেন। তিনি "ভয় নাই, গদাই বিশালাক্ষীর দর্শন পেয়েছে, তাই এমন হয়েছে; তোমরা কোন ভয় কোরোনা।" এই বলিয়া গদাইকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাবিষ্ণুর মাতা গদাইকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "গদাই, তোমাকে এক একবার দেবতা বলে মনে হয়। তোমাকে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারিনি কেন বল দেখি?" গদাই হাসিয়া বলিতেন, "তুমি আমাকে ভালবাস, তাই আমাকে দেবতা জ্ঞান হয়।" এই বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় খুদিরাম গদাইকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পাঠ-শালায় প্রেরণ করিলেন। গদাই কিন্তু পাঠাভ্যাস দূরে থাক্, প্রত্যহ নিয়মমত পাঠশালায় যাইতেন না। সমবয়স্কদের লইয়া পূর্ব্বে যেরূপ কৃষ্ণলীলা, যাত্রা, গান, দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠন ও তাহার পূজা এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, পাঠশালায় নিযুক্ত হইয়াও ঠিক সেইভাবে খেলিয়া বেড়াইতেন। মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় যাইয়াও সেইরূপ খেলা করিতেন। গুরুমহাশয় অন্যান্য বালকদিগকে যেমন পীড়ন করিয়া পাঠে মনোযোগ করাইতেন, গদাইয়ের অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার জন্যও সেইরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন মনে করিতেন; কিন্তু গদাই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে এবং গুরুমহাশয়ের সম্মুখীন হইলে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতেন। তিনি গদাইকে অতীব ভালবাসিতেন। লোকমুখে এবং তাঁহার অন্যান্য ছাত্রগণের নিকট গদাইয়ের যাত্রা, গান, কৃষ্ণলীলা এবং তাঁহার পড়াইবার নকলপটুতা শুনিয়া, একদিন গদাই বিদ্যালয়ে আসিলে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাই, তুমি নাকি আমার পড়াবার বেশ নকল কত্তে পার?" গদাই কহিলেন, "পারি।" গুরুমহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা একবার কর দেখি।" অনুমতিমাত্রে

গদাই আপনার সঙ্গীদের যাহার যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া আপনি গুরুমহাশয়ের পালা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অন্যান্য ছাত্রগণ প্রথমে ভাবিয়াছিল, গদাই অন্তরালে গুরুমহাশয়ের নকল করেন বটে, কিন্তু গুরুমহাশয়ের সমক্ষে পারিবেন না। কিন্তু গদাই অকুতোভয়ে নকল আরম্ভ করিয়া দিলে তাঁহার সঙ্গিগণ গুরুমহাশয়ের কোন ভাবান্তর না দেখিয়া গদাইয়ের ইঙ্গিতমত কার্য্য করিতে লাগিল। গুরুমহাশয় ও অপর বালকেরা এই অনুপম নকল দেখিয়া হাসিয়া অস্থির। পরে গুরুমহাশয় বলিলেন, "গদাই, এই বারে একটা যাত্রা হোগ্।" তৎক্ষণাৎ গদাইচাঁদ সঙ্গিগণকে লইয়া যাত্রা যুড়িয়া দিলেন। গুরুমহাশয় গদাইয়ের সুকণ্ঠ, বিশুদ্ধ ভাব ও বাণীমাধুর্য্যে বিমোহিত হইলেন। গুরুমহাশয় যত্ন করিয়াও গদাইকে হিসাব নিকাশ অঙ্ক শিখাইতে পারেন নাই; অঙ্কদির স্থলে গদাই কেবল গুটিকতক দেবদেবীর নাম লিখিতেন। কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া কেন লেখা পড়া করেন না জিজ্ঞাসা করিলে গদাই বলিতেন, "বিদ্যে শিখে ত শ্রাদ্ধ করাতে হবে, আর সেই অন্ন খেতে হবে। তাহলে আমার সব ঈশ্বরভক্তি চলে যাবে।" গদাইয়ের পিতাও এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গদাইয়ের বিদ্যাশিক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন।

লাহারা গ্রামের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপে সমারোহ করিতেন। একবার তাঁহাদের বাটীতে কোন শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানাস্থানের টোল ও চতুষ্পাঠী হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করেন। পণ্ডিতগণ সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া তুমুল শাস্ত্রসংগ্রাম উপস্থিত করিলেন। সেই সংগ্রাম কোলাহলে বহুলোক আকৃষ্ট হইলে, গদাইও তাঁহার সমভিব্যাহারে বালকবৃন্দ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। গদাই কোন প্রকারে সংগ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া সুমধুর কণ্ঠে সামান্য দুইএকটী কথা ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশন অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে যেরূপ হয়, সেইরূপ পণ্ডিতগণ একেবারে দ্বন্দ্বে নিরস্ত হইয়া গদাইয়ের শ্রীমুখপানে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। গদাইয়ের অপরূপ রূপলাবণ্য, সুমধুর হাস্য ও আলুলায়িত কেশজালের মধ্যে স্নিগ্ধমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া অনেকের মনে মানবপ্রকৃতিসিদ্ধ সারল্য পুনরুদয় হইলে, তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব বালককে আরও কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্রকূটের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাইও তাঁহার সামান্য দুই একটী কথায় সকল প্রশ্নের মীমাংসা

করিয়া দিলেন। পণ্ডিতগণ আরও বিস্মিত হইয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া আনন্দে মহা সুখ্যাতি ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

গদাই সাত আট বৎসরের ছেলে, সর্ব্বদাই সমবয়স্ক বালকগণ সমভি-ব্যাহারে এখানে সেখানে নানা রূপ ক্রীড়ায় নিযুক্ত। ক্রীড়াগুলি কিন্তু সাধারণ ছেলেদের মত নহে। মৃত্তিকা লইয়া কখন শিব, শিববাহন বৃষ, ত্রিশূল, শিঙ্গা ইত্যাদি, কখন কালী, জয়া বিজয়া, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি গড়িতেন। সে অনুপম গঠনের সৌন্দর্য্য এতই নির্দ্দোষ যে, গ্রামে যাঁহার বাটী পূজার জন্য প্রতিমা প্রস্তুত হইত, তিনি গদাইকে গৃহে আনাইয়া প্রতিমা নির্দ্দোষ হইয়াছে কিনা মত লইতেন, এবং নির্দ্দোষ না হইলে গদাই স্বহস্তে প্রতিমার দোষ সংশোধন করিয়া দিতেন।

প্রতিদিন খুদিরাম প্রত্যুষে স্নানান্তে সাজি হস্তে রঘুবীর এবং রামে-শ্বর হইতে আনীত রামেশ্বর শিবের পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতেন। একদিন মালার উপযুক্ত অতি সুন্দর পুষ্প সকল চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া রঘুবীরকে দিবার বাসনা হইলে, তিনি অতি যত্নে সেই ফুলের একটী সুন্দর মালা গাঁথিয়া রঘুবীরের পূজায় বসিলেন। খুদিরাম অতি ভক্তিভাবে পূজা করিতেন এবং ধ্যান করিবার সময় নিস্পন্দ ও বাহ্যশূন্য হইয়া অবিরল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। সেই দিন পূজায় বসিবামাত্র এমন গভীর ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন যে, গদাধর কোথা হইতে আসিয়া রঘুবীরের জন্য প্রস্তুত মালাটী আপন গলদেশে ধারণ, নৈবেদ্য ভক্ষণ, এবং রঘুবীর হস্তে গ্রহণ করিয়া আপনি রঘুবীরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন যে, তখনও খুদিরামের ধ্যান ভঙ্গ হইল না। অবশেষে গদাই পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, দেখ না, আমিই তোমার রঘুবীর, মালা পরে কেমন সেজেছি দেখ না," এইরূপ বারম্বার বলিলে খুদিরাম চক্ষু চাহিয়া গদাইকে ঐ ভাবে দেখিয়া পরমানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, এতদিনে আমার রঘু-বীরের পূজা সার্থক হইল।"

উপনয়নের সময় উপস্থিত, বাটীর সকলে নানাবিধ আয়োজন করিতে-ছেন। ধনি কামারনী গদাইয়ের ভূমিষ্ঠ কাল হইতে কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাহার নিতান্ত বাসনা—গদাইয়ের ভিক্ষামাতা হয় এবং উপযুক্ত সময় উপস্থিত ভাবিয়া একদিন গদাইকে অন্তরালে লইয়া আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে ভক্তবৎসল গদাই তৎক্ষণাৎ ধনিকে

ভিক্ষামাতা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উপনয়নের দিন গদাই সকলকে জানাইলেন যে, তিনি ধনিকে ভিক্ষামাতা করিতে প্রতিশ্রুত অতএব ধনি অগ্রে ভিক্ষা না দিলে অন্য কাহারও কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। সকলে শুনিয়া অবাক্। শূদ্রের দান বংশের কেহ কখন গ্রহণ করে নাই। আজ শূদ্রাণী ভিক্ষামাতা কি প্রকারে হইবে? খুদিরামের ইহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি। রামকুমার ছোট ভাইটীকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তিনি গদাইকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "শূদ্রের মেয়ে কি কারো ভিক্ষে মা হয়? বিশেষ, আমাদের বংশে কারো কখন হয় নি। ওরকম কথা বোল্‌তে নেই।" গদাই কোন কথাই শুনিলেন না, বলিলেন, "ঐ ধনিই আমার ভিক্ষে মা হবে।" এদিকে ধনি লাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মদাস লাহাকে সমস্ত কথা জানাইল। ধর্ম্মদাস সত্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীতে আসিয়া সকলকে বুঝাইলেন; সকলেই গদাইয়ের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন কিন্তু খুদিরাম সম্মতি দিলেন না। নিরুপায় দেখিয়া রামকুমার পিতার অনভিমতেই ধনিকে গদাইয়ের ভিক্ষামাতা হইতে সম্মতি দিলেন।

শ্রীনিবাস নামে একজন শাঁকারি একখানি সামান্য দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গদাইকে সে অত্যন্ত ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত এবং মধ্যে মধ্যে মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহাকে স্বহস্তে ভোজন করাইত। এক দিবস সে আপন মনে দোকানে বসিয়া এক ছড়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে, এমন সময় গদাই আসিয়া উপস্থিত। চিনু সাদরে তাঁহাকে নিকটে বসাইল। তাড়াতাড়ি মালা গাঁথিয়া ঐ মালা ও কিছু মিষ্টান্ন কাপড়ে ঢাকিয়া এক হস্তে লইল ও অপর হস্তে গদাইয়ের হস্ত ধারণ করিয়া মাঠের দিকে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইয়া এক নিভৃত স্থানে একটী বৃক্ষমূলে গদাইকে দাঁড় করাইয়া প্রেমকম্পিতহস্তে তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিল তৎপরে গদাইকে মিষ্টান্ন গুলি একে একে খাওয়াইতে খাওয়াইতে দরবিগলিতনয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "গদাই আমি বুড় হয়েছি, বেশী দিন বাঁচ্‌ব না। তুমি এবারে যে কত লীলাখেলা কোর্‌বে, তা দেখ্‌তেও পাব না। সে যাহা হোক্ গদাই, আমার তায় ক্ষোভ নেই; আমায় কৃপা কর, আমার জন্ম সার্থক হোক।" পরমহংসদেব ইদানীং বলিতেন, "চিনুর বলরামের ভাব ছিল।"

প্রায় নয় দশ বৎসর বয়স হইতে ঈশ্বরীয় গান শুনিলে গদাই বাহ্য

জ্ঞান হারাইতেন। কেহ বলিত, গদাইয়ের মূর্চ্ছারোগ; কেহবা বলিত, তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। কিন্তু গদাই বলিতেন, যখন যে ঠাকুরের গান শুনি—সেই ঠাকুরের রূপ দেখে আমার মন সেই রূপেতে মিলিয়া যায়।

খুদিরাম তাঁহার ভাগিনেয় রামচাঁদকে আপনার পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, তিনি প্রায়ই ভাগিনেয়কে দেখিতে যাইতেন। গদাইয়ের একাদশ বৎসর বয়সের সময় খুদিরামের গৃহিণী রোগের সূত্রপাত হয়। কখন কোন রোগ ভোগ করেন নাই, এজন্য প্রথম গৃহিণী রোগের সূত্রপাতে তিনি ভীত হন নাই বা প্রতীকারের কোন চেষ্টা করেন নাই এবং সেই অবস্থাতেই এক দিন সেলামপুরে রামচাঁদের বাড়ী উপস্থিত হয়েন। সেখানে রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; রামচাঁদ সাধ্যমত চিকিৎসাদি করাইতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের কিছু মাত্র উপশম হইলনা। বিজয়া দশমীর দিবস খুদিরাম মুমূর্ষুপ্রায়, শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় রামচাঁদ আসিয়া বলিল, "মাতুল মশাই, আপনি যে সদাই রঘুবীর রঘুবীর বলে থাকেন, এমন সময়ে চুপ করে শুয়ে আছেন কেন?" খুদিরাম বলিলেন, "কেও? রামচাঁদ এলে?" রামচাঁদ বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" খুদিরাম "তবে দেখ, আমাকে বসিয়ে দেও" এই কথা বলিয়াই স্বয়ং উঠিয়া বসিলেন এবং তিনবার রঘুবীর রঘুবীর রঘুবীর বলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। রামচাঁদ ও তাঁহার ভগ্নী উভয়ে মাতুলের চরণে মস্তক রাখিয়া "আমার মাতুলের হৃদয়ে রাম ছিলেন, সেই রাম বেরিয়ে কোথায় গেলেন" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া মহাসমারোহে নদীকূলে অগ্নিসংস্কার করা হইল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার ব্যতীত আর কোন সন্তান নিকটে ছিলেন না। রামচাঁদের প্রচুর সাহায্যে খুদিরামের শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। গদাধর শৈশবাবস্থায় প্রায় সকল লোকের অন্দরে যাইতেন এবং মহিলাগণ যেখানে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, সেইখানে তাঁহাদের মধ্যস্থলে বসিয়া নানা গল্প, ঈশ্বরীয় কথা ও গান করিতেন। রমণীগণও তাঁহাকে পাইলে আপনাদের পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া পরমানন্দে তাঁহাকে গান গাহিয়া শুনাইতেন, কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তাঁহাদের কার্য্যকালে গদাই আসিলে মনে হইত, যেন কার্য্যের সম্পূর্ণ শ্রমলাঘব হইল। অদ্যাপিও সেই সকল রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, সে সময় কি আনন্দেই গিয়াছে, তাহা আর একমুখে বর্ণনা

করা যায় না। এক দিন গদাইয়ের দর্শন না পাইলে সকলেই অতিশয় কাতর হইত। মনে হইত, তাঁর বুঝি বা অসুখ করেছে, তাই আসেন নি; এবং যতক্ষণ না কেহ যাইয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিত, ততক্ষণ তাহারা সুস্থির হইতে পারিতেন না। গদাইয়ের অদর্শনে তাঁহারা কেবল গদাইকেই চিন্তা করিতেন। গদাই মধ্যে মধ্যে স্বয়ং স্ত্রীবেশ পরিধানপূর্ব্বক তাঁহার পরমভক্ত এক সুবর্ণবণিকদের বাটী যাইয়া গান শুনাইয়া আসিতেন। তাঁহার সেই স্ত্রীবেশ, তাঁহার চাল চলন, কথাবার্ত্তা, হাবভাব অবিকল স্ত্রীলোকের মতই হইত, এমন কি, তিনি অবগুণ্ঠন মোচন না করিলে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না।

রামকৃষ্ণের যখন চৌদ্দ পনের বৎসর বয়ঃক্রম, শ্রীনিবাস শাঁকারী, গয়াবিষ্ণু, ধর্ম্মদাস লাহা ইত্যাদি কয়েকজনে একটি যাত্রার দল করেন। সীতানাথ পাইনের বাটীতে এক দিন সেই যাত্রা হইয়াছিল। গয়াবিষ্ণু রামকৃষ্ণকে শিব সাজাইবার ভার লইয়াছেন; এই সংবাদ পাইয়া গ্রামস্থ সমস্ত লোক আসিয়া যাত্রা শুনিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। যাত্রা আরম্ভ হইলে শ্রোতাগণ নিতান্ত উৎসুক হইয়া শিববেশে গদাইয়ের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধেক যাত্রা হইবার পর রামকৃষ্ণ আসরে দেখা দিলেন—সাক্ষাৎ শিব-ভাব, ধীর গম্ভীর চলন, আরক্ত ঢুলু ঢুলু নয়ন, সকলের ভ্রম জন্মিল—গদাই শিব সেজেছেন, না, স্বয়ং শিব ভক্তগণকে নিজ লীলা দেখাইবার জন্য কৈলাস হইতে কামারপুকুরে আগমন করেছেন। সভামাঝে রামকৃষ্ণ শিবভাবে বিভোর, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তাঁহার সুবঙ্কিম নয়নযুগলে প্রেমাশ্রুর বন্যা বহিতে লাগিল! সভাস্থ সকলে সেই অপরূপ ভাবসমাধি অবলোকন করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, যাত্রা বন্ধ হইয়া গেল। বিবিধ উপায়ে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা বিফল হইল; ক্রমে সভাভঙ্গ হইলে সকলে দেখেন, তিনি যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানটী তাঁহার প্রেমাশ্রুধারায় একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। জনতাভঙ্গে সুযোগ পাইয়া ভক্তগণ নৈবেদ্য-পুষ্প-বিল্বদল দিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শিবজ্ঞানে পূজা করিলেন; রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, পুনরায় সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হইল কিন্তু রামকৃষ্ণের কোনও ভাবান্তর হইলনা, সেইরূপ সংজ্ঞাহীন, সহাস্য বদনে দণ্ডায়মান, ও নয়নে অবিরল বারিধারা; তিন দিন দিবানিশি সেইভাবে রহিলেন; স্থানটী কর্দ্দমময় হইয়া গেল।

একদিন ধনি কামারনী আপন আবাসে রন্ধন করিতেছে, এমন সময় গদাই যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ধনি আপন আলয়ে প্রায়ই ধরিয়া আনিয়া আপনার রন্ধনের আস্বাদ করাইয়া ছাড়িত। অদ্য অযাচিতভাবে গদাইকে পাইয়া পরমানন্দে তাহাকে উপবেশন করাইল। চিংড়িমাছের তরকারী অতি উত্তম প্রস্তুত হইয়াছে জানাইয়া কহিল, "যদি খাস্ ত ভুল্‌তে পারবিনি"। গদাইও পরমানন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন। এইরূপ দীন হীন দরিদ্রগণকে লইয়া আরও দুই এক বৎসর নানা লীলাখেলা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সঙ্গে কলিকাতায় আসেন।

ক্রমশঃ।

বর্ত্তমান সমস্যা।

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বামীজি স্বদেশহিতৈষীতে তিনটী লক্ষণের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে চাহিতেন। (১) হৃদয়বত্তা (২) কৃতকর্ম্মতা (Practicality) (৩) দৃঢ়তা। তিনি যে দেশের জন্য যথার্থ প্রাণে প্রাণে কাঁদিতেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা অনেক পাইয়াছি। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়া তিনি সাধারণের দুঃখে কাঁদিতে শিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠালাভের পর যখন আমেরিকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে অতিথিরূপে পাইবার জন্য পরস্পর যেন প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে যে কোন ভারতবাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহার আতিথেয় গৃহস্বামীকে উক্ত ভারতবাসীরও সমান যত্নে পরিচর্য্যা করিতে বলিতেন। গৃহস্বামী জানিতেন, সেই ব্যক্তির যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে স্বামিজি তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহত্যাগ করিবেন। আমেরিকায় দরিদ্র লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে স্বদেশবাসীর দুঃখের কথা উদিত হইত। তাঁহার শত শত পত্রে ও বক্তৃতায় এই ভাব প্রকটিত। দুই চারিটী স্থান হইতে তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিলামঃ—

কারাবাসিগণের প্রতি আমেরিকানগণের সহৃদয় ব্যবহার দেখিয়া

তাঁহার প্রাণে স্বদেশবাসীর কথা জাগিয়া উঠিল—'ইহা দেখিয়া তার পর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পলাইবার রাস্তা নাই,' উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে।'

অন্যত্র 'যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আশা ভরসা নাই; সে গেল। কেন হে বাপু! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন আমরা বড় গরিব; কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান্, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বল্‌তে পার? * *

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখ্‌তে নয়, তামাসা দেখ্‌তে নয়, নাম কর্‌তে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখ্‌তে।'

'এই মূল কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—জনসাধারণের উন্নতি বিধান * মনে রাখিবে দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন।'

'বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর ইচ্ছা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে।'

'হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচারনিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক।'

'জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানি বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত

কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগ-সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটী স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।'

'ইউরোপের বহু নগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম।'

'যদি স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, * কোন উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন।'

দ্বিতীয় বার আমেরিকা যাত্রার সময় জাহাজের 'নেটিভ' খালাসী প্রভৃতির কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া স্বদেশবাসীর উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেনঃ—

'এই সকল বাঙ্গালী খালাসী, কয়লাওয়ালা, খানসামা প্রভৃতির কাজ দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশবুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আস্‌ছে, কেমন সবলশরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক শান্ত। সে নেটীভি পাচাটা ভাব মেথরগুলোরও নেই,—কি পরিবর্ত্তন!'

ভারতের দরিদ্রের প্রশংসায় স্বামীজি শতমুখ ঃ——

"আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনশক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পার্‌বে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধর্‌বে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ করে দিন রাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!!"

অন্যত্রঃ—

'ঐ যারা চাষা ভূষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কায করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে, প্রাকৃতিক নিয়মে, দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ সভ্যতাপ্রাধান্যে ওলট পালট হয়ে যাচ্চে। হে ভারতের শ্রমজীবি, তোমার নীরব অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলাকসান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিষ, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ফরাসি, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরাজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য ; আর তুমি ?—কে ভাবে একথা * * যাদের রুধির পাতে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি, তাদের গুণগান কে করে ? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর সকলের পূজ্য কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারিতা যে আমাদের গরীবের ঘর দুয়ারে দিনরাত মুখ বুজে কার্য্য করে থাকে, তাতে কি বীরত্ব নাই ? বড় কায হাতে এলে অনেকেই বীর হয় ! ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কার্য্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য। সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী, তোমাদের প্রণাম করি।' বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না।

দেশের প্রতি ভালবাসা অর্থে স্বামিজী শুধু একটা ফাঁকা Sentiment মাত্র বুঝিতেন না, স্বদেশপ্রীতি অর্থে ভৌগোলিক সীমাবিশিষ্ট, পর্ব্বতশৈলসমন্বিত সুজলা সুফলা স্থানবিশেষের প্রতি একটা Romantic ধরণের প্রীতি বুঝিতেন না, রক্তমাংসবিশিষ্ট প্রাণসম্পন্ন দুঃখী দরিদ্র নরনারীর জন্য প্রাণ কাঁদাই দেশের জন্য প্রাণ কাঁদা। তেলা মাথায় তেল দেওয়া বা আপনাদিগকে অপর জাতির নিকট অধিক মর্য্যাদাসম্পন্ন করিবার জন্য দরিদ্রদলনকে স্বদেশপ্রীতি বলে না। হে যুবকগণ, যদি স্বদেশের জন্য যথার্থ প্রাণ কাঁদাইতে চাও, তবে সৌখীন মোজা জুতা ছাড়িয়া একবার ভারতের গ্রামে গ্রামে পদব্রজে—রেলযোগে নয়—ভ্রমণ করিয়া লোকের অবস্থা, দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এস। গ্রাম্য লোকের

দৈনিক জীবন, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের আচার ব্যবহার সব দেখিয়া এস। যদি কিছুদিন এইরূপ ভ্রমণ করিতে পার, দেখিবে, গৃহে আসিয়া অন্নের থালে তোমার হাত উঠিবে না—ক্ষুধায় শীর্ণকায়, রোগশীর্ণ, দরিদ্র, চির-দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অনাথ অনাথার ছবি তোমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে ভাসিবে। তোমার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইবে। বই পড়িয়া দেশের অবস্থা বুঝিতে যাইও না। নিজের চক্ষে সব দেখিতে হইবে। যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রথম কার্য্য দীর্ঘ ভ্রমণ—দ্বারে দ্বারে যাইয়া লোকের বিষয় জানা। এই কথায় অনেক বলিতে পারেন, ইহা কাযের কথা নহে। মেরু-দণ্ডহীন, অলসজনেরই এইরূপ বলা শোভা পায়। যে মহান্ ব্রতে দীক্ষিত হইতে তুমি অভিলাষী, তাহার জন্য তুমি একবিন্দু ক্লেশ স্বীকারে কুণ্ঠিত হও কেন ?

সকল সভ্যদেশেই শিক্ষার আনুষঙ্গিক রূপে এই ভ্রমণের প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদেরও মধ্যে এই ভ্রমণ ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে যে তীর্থভ্রমণ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার সহায়তা লইয়া এই ভ্রমণকে প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মরূপে পরিগণিত করা যাইতে পারে। সাধারণের ইহাও বিশ্বাস যে, কোন তীর্থে পদব্রজে যাইলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, রেল প্রভৃতিতে যাইলে তদ্রূপ হয় না। অনেকে আবার স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনোদ্দেশে এদেশ ওদেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের কেদার বদরীনারায়ণ পর্য্যন্ত পদব্রজে যাতায়াত করিলে আমাদের আজিকালকার অনেক কাল্পনিক রোগ সারিতে পারে। পাশ্চাত্যদেশসমূহে অনেক পরিব্রাজক সমিতি আছে। এদেশেও শিক্ষায় আনুষঙ্গিক স্বরূপ এইরূপ সমিতি সকল স্থাপন হইলে ভাল হয়। যদি প্রণালী-বদ্ধ ভাবে এইরূপ সমিতি সকলের কাজ হয়, তবে দেশের অনেক অপরিচিত তথ্য, দেশের অনেক দুর্দ্দশার কথা আমরা জানিতে পারি এবং উপায় আবিষ্কারেরও অনেকটা সাহায্য হয়।

আগামী বারে দেশের জন্য স্বামীজি কি কি উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বামীজির জনৈক সেবক।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

শিষ্য। স্বামীজি! খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্ম্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি?

স্বামীজি। অল্প বিস্তর আছে বই কি।

শিষ্য। মাছ মাংস খাওয়া উচিত এবং দরকারী কি?

স্বামীজি। খুব খাবি বাবা! এতে যে পাপ, সে আমার। তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখ্‌না—মুখে মলিনতার ছায়া—বুকে সাহস ও উদ্যমশূন্যতা—পেটটা বড়—হাত পায়ে বল নাই—ভীরু ও কাপুরুষ।

শিষ্য। মাছ মাংস খেলে কি বল হয়? তবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্মে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বল্‌ছে কেন?

স্বামীজি। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম মরে যাবার সময় হিন্দুধর্ম্ম উহার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর আপনার কোরে নিয়েছিল। ঐ ধর্ম্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে বিখ্যাত। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না কোরে বলপূর্ব্বক রাজশাসনের দ্বারা ঐ মত চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছেন। পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছেন—আর টাকার জন্য নিজের ভেয়ের সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছেন, এমন অনেক "বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ" দেখেছি।

শিষ্য। বৈদিক ও মনুক্ত ধর্ম্মে ত মৎস্য মাংস খাবার বিধান রয়েছে।

স্বামীজি। অহিংসার কথাও আছে। অধিকারিবিশেষে হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসাধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থা আছে। শ্রুতিও বলেছেন—মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি, মনুও বলেছেন—নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

শিষ্য। এখন ত দেখ্‌ছি একটু ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক হলত আগে মাছ

মাংস ছেড়ে দিলে। অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপের চেয়েও যেন মাছ মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ। এ ভাবটা কোত্থেকে এলো?

স্বামীজি। কোত্থেকে এলো, জেনে তোর দরকার কি? তবে ঐ মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করেছে, তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? দেখ্‌না—তোদের পূর্ব্ববঙ্গের লোক খুব মাছ মাংস খায়—কচ্ছপ খায়। তাই তারা পশ্চিমবাঙ্গালার লোকের চেয়ে সুস্থশরীর। তোদের পূর্ব্ববাঙ্গালার বড় মানুষও রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে শিখেনি। তাই আমাদের মত অম্বলের ব্যারামে ভোগে না। শুনেছি পূর্ব্ববাঙ্গালায় অম্বলের ব্যারাম কারে বলে, পাঁড়াগেয়ে লোক বুঝ্‌তেই পারে না।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। আমাদের দেশে অম্বলের ব্যারাম বলে কোন ব্যারাম নাই। এদেশে এসেই ওর নাম শুনেছি। আমরা দুবেলাই মাছ ভাত খাই।

স্বামীজি। তা খুব খাবি। ঘাস্ পাতা খেয়ে যত পেট্‌রোগা বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও সব সত্ত্বগুণের চিহ্ন নয়। মহা তমোগুণের ছায়া—মৃত্যুর ছায়া। সত্ত্বগুণের চিহ্ন হবে—মুখের উজ্জ্বলতা—হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ—Tremendous activity আর তমোগুণের হচ্ছে আলস্য—জড়তা—মোহ—নিদ্রা এই সব।

শিষ্য। মাছ মাংসে ত রজোগুণ বাড়ায়।

স্বামীজি। আমি তাই চাই। এখন রজোগুণের বড্ড দরকার হয়েছে। তোদের দেশে যে সব লোক সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্—তাদের ভেতর ১৫ আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মিলে তো ঢের। এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা—দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। এদের খাইয়ে দাইয়ে তুল্‌তে হবে, জাগাতে হবে—কার্য্যতৎপর কত্তে হবে। নতুবা জড় হয়ে যাবে—গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যাবে। মাছ মাংস খুব খাবি, বাবা, খুব খাবি।

শিষ্য। অত্যন্ত সত্ত্বগুণের স্ফূর্ত্তিতে মৎস্য মাংসে স্পৃহা থাকে কি?

স্বামীজি। না, তা থাকে না। যখন ঐ সত্ত্বগুণ খুব বিকাশ হয়, তখন

মাছ মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ প্রকাশের এই সব লক্ষণ জান্‌বি পরের জন্য সর্ব্বস্বপণ—কামিনীকাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি—নিরভিমানিত্ব—অহংবুদ্ধিশূন্যত্ব। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal food এর ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখ্‌বি ওসব গুণের স্ফূর্ত্তি নাই অথচ অহিংসার দলে, সেখানে জান্‌বি হয় ভণ্ডামী না হয় লোকদেখানো ধর্ম্ম। তোর্ যখন ঐ অবস্থা হবে তখন তুই ওসব্ ছেড়ে দিস্।

শিষ্য। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ত আছে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" ইত্যাদি।

স্বামীজি। হাঁ আছে। তা তোদের শঙ্করাচার্য্য "আহার" অর্থে "ইন্দ্রিয় বিষয়" বল্‌ছেন্। আর শ্রীরামানুজ স্বামী 'আহার' অর্থে খাদ্য ধরেছেন্। আমার মত হচ্ছে, এ উভয় মতের সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। কেবল দিনরাত খাদ্যখাদ্যের বাচ্‌বিচার করেই জীবনটা যাবে—না ইন্দ্রিয় সংযমন কত্তে হবে? ইন্দ্রিয় সংযমনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য; আর ইন্দ্রিয় সংযমনে ভাল মন্দ খাদ্যাখাদ্যেও অল্প বিস্তর সহায়তা করে। খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ শাস্ত্রে উক্ত আছে। (১) জাতিদুষ্ট—যেমন পেঁজ, লশুন্ ইত্যাদি। (২) নিমিত্তদুষ্ট—যেমন ময়রার দোকানের খাবার জিনিষে মাছি পড়্‌ছেন—রাস্তার ধুলো পড়্‌ছেন ইত্যাদি। (৩) আশ্রয়দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের স্পৃষ্ট অন্নাদি। প্রথম জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট খাদ্যের প্রতি খুব নজর্ রাখ্‌তে হয়। কিন্তু এদেশে ঐদিকে একেবারেই নজর উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটী যাহা যোগী ভিন্ন অন্য কেহ ভাল করে বুঝ্‌তে পারে না, ঐটী নিয়েই দেশে লাঠালাঠি চল্‌ছে—কেবল 'ছুঁওনা' 'ছুঁওনা' করে যত ছুৎমার্গীর দলে দেশ ঝালাপালা হচ্ছে। তাও ভালমন্দ লোক বিচার নেই—গলার একটা সুতো থাক্‌লেই তার হাতে অন্ন খেতে পারা যায়! ঠাকুর যার তার হাতে খেতে পার্‌তেন না। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে তিনি কারো ছোঁয়া খেতে পারেন নি। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জান্‌তে পেরেছি—সে লোকটার কোন বিশেষ দোষ আছে। তোদের ধর্ম্মটা এখন হচ্ছে ভাতের হাঁড়ীর মধ্যে। মহান্ সত্য ছেড়ে

কেবল খোষা নিয়ে মারামারি চলছে।

শিষ্য। আচ্ছা, আপনি কি বলতে চান, আমরা তবে সকলের ছোঁয়া খাব?

স্বামীজি। তা কেন বলবো? তুই ত ভট্‌চায্‌ বামুন। তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবিনি? তোরা রাঢ়ীশ্রেণী, বারেন্দ্র বামুনের অন্ন খেতে আপত্তি হবে কেন? বারেন্দ্র বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠি তেলিঙ্গি ও কনোজী বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? দেখ্‌ছিস্‌, বাঙ্গলার বার আনা কায়েত বামুন ত হোটেলে ভাত মারছেন। তাঁরাই আবার মুখ পুঁছে এসে সমাজের নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই আইন করছেন্‌। বলি ঐ সব কপটীদের আইনমত কি সমাজের চলতে হবে? ওদের সমাজ থেকে বের করে দিতে হবে। সেই সনাতন ঋষিদের শাসন চালাতে হবে—তবেই দেশের কল্যাণ হবে।

শিষ্য। তবে কি অধুনাতন সমাজে ঋষিশাসন চল্‌ছে না?

স্বামীজি। কোথায় চলছে! আমি ত ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ্‌লুম। কোথাও ঋষিশাসনের প্রচলন দেখতে পাচ্ছি না। কেবল লোকাচার, দেশাচার আর স্ত্রী-আচার—এতেই সমাজ শাসিত হচ্ছে। শাস্ত্র মাস্ত্র কি কেউ পড়ে—না পোড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?

শিষ্য। তবে এখন আমাদের কি কত্তে হবে?

স্বামীজি। সেই ঋষিগণের মত চালাতে হবে; সেই মনু যাজ্ঞবল্ক্য মন্ত্রে দেশ দীক্ষিত কত্তে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে দিতে হবে। এই দেখ্‌না, ভারতের কোথাও চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাত ভাগ করে চারটী জাত কত্তে হবে। সব বামুন এক করে একটী ব্রাহ্মণ জাত গড়্‌তে হবে। এইরূপ করে সব জাত বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুবা সুধু তোমায় ছুঁবোনা, ওকে জেতে নিব না বল্লে কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখন নয়!

———

আমেরিকায় বেদান্ত।

স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতির কার্য্য ছয়মাস ধরিয়া করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট ছয় মাস নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। বিগত গ্রীষ্মকালে তিনি আলাস্কা হইতে মেক্‌সিকো পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই তিনি দেখিয়াছেন, লোকের বেদান্তের প্রতি অনুরাগ দিন দিন বাড়িতেছে। লেক্ লুইসে তাঁহাকে প্রায় ৫০ জন লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল। আলাস্কাগামী নৌকার যাত্রিগণের অনুরোধে একটী এবং টরোণ্টো হইতে আগত হ্রদ-পোতের যাত্রিগণের জন্য একটী বক্তৃতা তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল। এক দিন মেক্‌সিকোর রাস্তায় বেড়াইতেছেন, একজন স্প্যানিশ ভদ্রলোক তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং নিজের পকেট হইতে তাঁহার (স্বামী অভেদানন্দের) অনেকগুলি বক্তৃতা বাহির করিয়া দেখাইলেন। এই ভদ্র লোক তাঁহাকে অনেকগুলি বেদান্তানুরাগীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা স্বামীজিকে ঐ স্থানে দীর্ঘকাল থাকিয়া একটী বেদান্ত প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। অন্যান্য কার্য্য বশতঃ উহা সম্ভব না হওয়াতে তাঁহারা আগামী শীতকালে তাঁহাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মেক্সিকোয় বেদান্তের প্রভাব খুব ছড়াইরা পড়িয়াছে। বার্সিলোনার (স্পেন) জনৈক পণ্ডিত বিবেকা-নন্দ স্বামীর রাজযোগ স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে নভেম্বর মাসে এই কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছেনঃ—(১) জগতের পরিত্রাতাগণ (২) কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা (৩) বুদ্ধ ও তাঁহার শিক্ষা (৪) জাপানের শিণ্টো ধর্ম্ম।

ব্রুকলিন ইন্‌ষ্টিটিউট নামক সমিতিতে স্বামী অভেদানন্দ 'ভারত' সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি মঙ্গলবারে একটি করিয়া বক্তৃতা হইবে। নভেম্বরের বক্তৃতার তালিকাঃ—

(১) অধুনাতন সমাজ প্রচলিত দর্শন।
(২) ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মের অবস্থা।
(৩) ভারতের সামাজিক ব্যবস্থা—জাতিভেদ।

শঙ্কর প্রসঙ্গ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]　　　　　　[পূর্বপ্রকাশিতের পর।

রামেশ্বর হইতে আমি মালাবারে আসি, সুতরাং রামেশ্বর হইতে মালাবার আসিবার পথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু বঙ্গদেশ হইতে মালাবারে যাইতে হইলে যেটী সোজা পথ, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহাও এস্থলে উল্লিখিত হইল। কলিকাতা হইতে মালাবার যাইতে হইলে প্রথমে মান্দ্রাজ যাওয়াই সুবিধা। ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ১৩৶৵০ মাত্র। তাহার পর মান্দ্রাজ হইতে উতকামন্দ অভিমুখী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পোড়ানুর নামক জংসনে নামিতে হয়। তথা হইতে পুনরায় সোরনুর অভিমুখী গাড়ীতে উঠিতে হয়। এই গাড়ী পোড়ানুর হইতে সোরনুর হইয়া বরাবর বৃটিশ মালাবারের অন্তর্গত কালিকট, কানানোর প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করে। সোরনুর হইতেই একরূপ মালাবার আরম্ভ, সুতরাং এইস্থান হইতে মালাবারের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাইতে হয়। যাঁহারা শঙ্করের জন্মভূমি দেখিতে যাইবেন, তাঁহারা সোরনুরে নামিয়া কোচিন অভিমুখী গাড়ীতে আরোহণ করিবেন। শঙ্করের জন্মস্থান এই লাইনে সোরনুর হইতে ৯টী ষ্টেশন পরবর্ত্তী অঙ্গমালী ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল দূরে আলোয়াই বা চূর্ণা নদীর তীরে কালাতি নামক একটী পল্লীগ্রামে। মান্দ্রাজ হইতে সোরনুর পর্য্যন্ত ৩য় শ্রেণী মেল গাড়ীর ভাড়া ৪॥৶৹ এবং প্যাসেঞ্জারের ৩৸৹ আনা মাত্র। সোরনুর হইতে অঙ্গমালীর ভাড়া উভয় গাড়ীতেই ॥৵৹ আনা, সুতরাং কলিকাতা হইতে মেল গাড়ীর ৩য় শ্রেণীর ভাড়া অঙ্গমালী পর্য্যন্ত ১৮৸৹ আনা এবং প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ভাড়া ১৮৶৹ আনা মাত্র।

অঙ্গমালী ষ্টেশনটী অতি ক্ষুদ্র—একটী ফ্ল্যাগ্ ষ্টেশন বলিলেই হয়। সুতরাং একেবারে অঙ্গমালী না যাইয়া অঙ্গমালীর ৩টি ষ্টেশন পূর্ব্বে ত্রিচুরনামক স্থানে নামাই সুবিধা। এইস্থানে আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে পারে, হিন্দু হোটেল আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণের অন্ন ও বাসগৃহ মিলে। নচেৎ অঙ্গমালীতে নামিয়া নিরুপায় হইতে হয়। অঙ্গমালী হইতে কালাতির পথ আছে সত্য, কিন্তু পথপ্রদর্শক মিলে না। ত্রিচূরে পথপ্রদর্শক সহজে মিলিতে পারে। এদেশের ভাষা মালয়ালম জানিলে অঙ্গমালী ষ্টেশনেও কখন কখন পথ-

প্রদর্শক পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ত্রিচুরে ইংরাজীভাষাবিৎ পথপ্রদর্শক পাওয়া যায়। অঙ্গমালী ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে আসিয়া যথায় পথিক ট্রিভাঙ্কোরের রাজধানী ট্রিভাণ্ড্রাম অভিমুখী একটী রাজপথে উপনীত হন, কেবল তথায় কয়েক খানি দোকান ও বাজার দেখিতে পাইবেন, নচেৎ পথে বড় লোক জন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দোকানদারেরা আবার ইংরাজী জানে না। এখানে ইংরাজীজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে খ্রীষ্টশিষ্য সেণ্টটমাস্ সম্প্রদায়ভুক্ত সিরিয়ান খৃষ্টানদের কয়েকটী পাদরী। তাঁহারাও ষ্টেশনের বহুদূরে গ্রাম মধ্যে থাকেন। অঙ্গমালী হইতে কালাতীর পথে কয়েকটী গ্রামে ২।১ ঘর জমীদার আছেন, তাঁহারাও ইংরাজী জানেন। নচেৎ সাধারণতঃ এখানে ইংরাজীজ্ঞ ব্যক্তি নাই।

পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে একটী চিত্র অঙ্কিত করিলাম। যে পথে যে দিকে অঙ্গমালী হইতে কালাতী যাওয়া যায়, তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইল। প্রদর্শিত পথে একটী ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া অঙ্গমালী হইতে ৬ মাইল দূরে যে একটী স্রোতস্বতী দেখিতে পাইবেন, তাহারই তীরে কালাতী অবস্থিত। ইহার নাম আলোয়াই নদী। এখানে রেল লাইনটী উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত,

ষ্টেশনটী পশ্চিমমুখী। ইহার উত্তর ভাগ দিয়া পূর্ব্ব মুখে একটী পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পুনরায় উত্তরদক্ষিণমুখী একটী পথে পড়িতে হয়। এই পথ দিয়া কিয়দ্দূর উত্তর মুখে যাইয়া পুনরায় পূর্ব্বমুখে যাইতে হয়। কিছু দূরে যাইয়া আবার দক্ষিণ মুখে যাইতে হয়, ঠিক এই মোড়ের মাথায় একটী চুণকাম করা সিরিয়ান ক্রিশ্চিয়ানদিগের গির্জ্জা আছে। ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কিছুদূর

দক্ষিণদিকে আসিয়া এই পথটী আবার পূর্ব্ব মুখে চলিয়া গিয়াছে। এই পথটী অনতিদূরে কালিকট হইতে ট্রিভাণ্ড্রাম যাইবার রাজপথে মিশিয়াছে, উহা অতি প্রশস্ত ও সুন্দর পথ। এই পথ দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে কিছুদূর গিয়া প্রথমতঃ একটী ক্ষুদ্র নদী তৎপরে আলোয়াই নদী অতিক্রম করিয়া ট্রিভাণ্ড্রামে চলিয়া গিয়াছে। কালাতী এ পথের এক ধারে আলোয়াই নদীর পারে অবস্থিত। ষ্টেশনের পথ হইতে এই পথে পড়িয়াও প্রায় ৪ মাইল যাইতে হয়। মধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া প্রায় ৩ মাইল ৩॥ মাইল যাইলে তবে আলোয়াই তীরে আসা যায়।

ঠিক আলোয়াই নদীর তীরে আসিবার পূর্ব্বে পথিক একটী উত্তরমুখী সংকীর্ণ পাকা পথ দেখিতে পাইবেন। এই পথটী কালাতীর পশ্চিমপ্রান্ত দিয়া মালাইতুর নামক একটী দূরবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত গিযাছে। সুতরাং কালাতীর ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে এই পথ দিযাও যাওয়া যায়। অপরিচিত পথিকের পক্ষে এই পথটীও কালাতীর একটী নিদর্শন বিশেষ।

৯ই মার্চ্চ ১৯০৫ খৃঃ অব্দে বেলা প্রায় ১১ টার সময় আমি সোরনুর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বরাত্রে রেলের কষ্টে কাতর ছিলাম। সুতরাং আহারাদির জন্য বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। একটী বালক কুলীকে ডাকিলাম, তাহাকে আমার জিনিষ পত্র গুলি দিয়া এখানে কোন ব্রাহ্মণের হোটেল আছে কি না হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম। নিকটে একটী যুবক কুলী ছিল, সে আমায় বিদেশী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক আমার জিনিষগুলি নিজ স্কন্ধে লইয়া আমার কথার উত্তরে অতি আগ্রহ সহকারে বলিল যে, এখানে ব্রাহ্মণের হোটেল আছে, ভাত পাওয়া যাইবে ইত্যাদি। এখানে রেলের কুলীরা প্রায় এই দেশবাসী মুসলমান। সে হোটেলে আমার মোট লইয়া যাইতে ও পুনরায় তথা হইতে ষ্টেশনে আসিতে।০ আনা চাহিল। আমি বহু কষ্টে ২।১ জনকে মধ্যস্থ স্থির করিয়া ৵০ আনায় রফা করিলাম। কুলিটী আমাকে ষ্টেশনের পশ্চাতে অনতিদূরে একটী দ্বিতল কুটীরে লইয়া চলিল। দেখিলাম, এখানকার জমি কাঁকর মিশ্রিত লালমাটি। হোটেলে পঁহুছিয়া দেখিলাম, উহা যেন পল্লীগ্রামের একটী বাড়ী বিশেষ। বাটির চারিদিকে বাগান। দেখিলাম—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নারিকেল সুপারী আঁবগাছ কলাগাছ প্রভৃতির মধ্যে ফুলগাছও রহিয়াছে ও মধ্যে একটী কূপ। বাড়ীটীর

সর্ব্বত্রই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আলোক ও বায়ু সঞ্চালনের কোন ব্যাঘাত না থাকায় বেশ খট্‌খটে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এটী মালাবার দেশের অন্তর্গত সুতরাং গাড়ীতে দুই একটী মালাবারী ব্যতীত এই প্রথম মালাবারী দেখিলাম। মালাবারে অনেক প্রকার ব্রাহ্মণ আছেন, এই হোটেলের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণী। ইঁহারা কাচা কোঁচা দিয়া কাপড় পরেন বটে, কিন্তু কোঁচা গোঁজেন না বা কাপড় গুটাইয়া হাঁটুর উপর রাখেন না, কটিদেশে কাপড়ের উপর একখানি গামছা কোনাকুনি করিয়া গেরো দিয়া কাপড়টীকে সংযত রাখেন। গলায় পৈতা আছে। মাথার সম্মুখভাগে এক গোছাচুল এবং ঘাড় ও জুল্‌ফি প্রভৃতি কামান। রং ইঁহাদের সাধারণতঃ আমাদেরই মত। ইহাঁরা জুতা বা জামা প্রভৃতি কিছু ব্যবহার করেন না। ইঁহারা রেলের নিকটে থাকেন ও হোটেল দ্বারা উপার্জ্জন করেন বলিয়া হিন্দুস্থানী অল্প শিখিয়াছেন মাত্র। ইংরাজী এখনও শিখেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়াছেন ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন, তাঁহারা অবশ্য জামা জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করেন ও ইঁহাদিগকে অশিক্ষিতও মনে করেন।

ইঁহাদের স্ত্রীলোকগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন না। তাঁহারা পুরুষের সম্মুখে বহির্গত হইতে কিছুমাত্র লজ্জা করেন না। যুবতীগণ রঙ্গিন একখানি সাড়ী ও কাঁচলীর মত একটু একটু হাতা বিশিষ্ট জামা পরেন, এবং সাড়ীখানির অঞ্চলভাগটী জামার উপর বেশ সুসংলগ্ন করিয়া পরিয়া কোমরে একটু জড়াইয়া গুঁজিয়া দেন। মাথায় ইঁহাদের কাপড় থাকেনা। কটিদেশ বক্ষঃস্থল প্রভৃতি সুসংলগ্নভাবে বস্ত্রাবৃত হইয়াও স্বাস্থ্যলভ যৌবনসৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। বহির্দ্দেশে গমন কালে মস্তকে ইঁহারা অন্য একখানি বস্ত্র দেন। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাগণ বস্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সলজ্জভাবে পরিধান করেন, ইঁহারা অঙ্গে ততটা সুসংলগ্ন করিয়া পরিধান করেন না। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই খুব কর্ম্মিষ্ঠা, যাত্রীর জন্য অন্ন পাক ও পরিবেশন ও গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি ইঁহারাই করিয়া থাকেন। পুরুষগণও কখন কখন সহায়তা করিয়া থাকেন। পরন্তু পুরুষগণাপেক্ষা ইঁহারাই যেন বেশী কাজ করেন ও ব্যস্ত, দেখিলে বোধ হয় যেন, ইঁহারা চরকির মত ঘুরিতেছেন, আলস্য ইঁহাদিগের মূর্ত্তিতে যেন একেবারেই নাই। বিলাস যেন ইঁহারা জানেন না। গৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গন প্রভৃতি এতই পরিষ্কার যে, অস্মদ্দেশীয়গণ প্রথম দৃষ্টিতে আশ্চর্য্যান্বিত

না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। নানাবিধ দ্রব্যাদির দ্বারাও গৃহাদি ইহাঁরা পূর্ণ করেন না। ইহাঁদের গৃহ দেখিলে বোধ হয় ইহাঁরা আজকালকার পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যনীতিতে সম্যক্ অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত। আমাদের এই রোগ-প্রপীড়িত দেশবাসীর পক্ষে ইহাঁদের বাসপদ্ধতি শিক্ষার এবং অনুকরণের বিষয়।

ইহাঁদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল, শারীরিক বলও মধ্যম। ইঁহাদের আচার ব্যবহার ও স্বভাব চরিত্র দেখিয়া অল্প সময়ে যাহা স্বতঃই বোধ হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিলে বোধ হয় অস্বাভাবিক কাল্পনিকতার পরিচয় হইবে না। এক কথায় বোধ হইল, যেন ইঁহাদের কর্ম্মস্বভাব ও গৃহকর্ম্মে ব্যস্ততাই ইঁহাদের সরলতা, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্রতার হেতু। ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অপবিত্রস্বভাবাপন্ন বা নির্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয় নাই। অধীত উপদেশের দৃষ্টান্ত যেন জাতিবিশেষে প্রত্যক্ষ করিলাম। সচ্চরিত্র হইতে হইবে বলিয়া সতত সতর্ক হইয়া যতটা ফল পাওয়া যায়, সতত কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন কেবল যে তত্তৎ কর্ম্মের শুভফলপ্রসূ, তাহা নহে, উহা অনাগত দুষ্কর্ম্ম প্রবৃত্তিরও নাশক।

একটু বিশ্রাম করিয়া তৈলমর্দ্দনান্তর কূপজলে স্নান করিলাম। এখানে সকলে নারিকেল তৈল ব্যবহার করেন। অন্য কোন তৈল ইহাঁরা ব্যবহার করেন না। এখানকার নারিকেল তৈল খুব পরিষ্কার ও শুভ্রবর্ণ। এখানে এ সময় গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভ, কিন্তু বেলা ১২টা পর্য্যন্ত গ্রীষ্মজনিত কোনরূপ কষ্ট বোধ হইল না। সকালের শীতল বায়ু তখন পর্য্যন্তও মৃদু মৃদু বহিতেছিল, বোধ হইল যেন বসন্ত কাল। কূপজল অল্প শীতল, সুতরাং স্নানে বেশ স্নিগ্ধ বোধ করিলাম। ইহাঁদের বাটিতে পায়খানা দেখিলাম না, বোধ হইল বাগানের দূরদেশে বা পতিত বন্যভূমিতে ইহাঁরা শৌচ প্রস্রাবাদি নির্ব্বাহ করেন। আমাদের মধ্যে অনেক গুলি যাত্রীই নিকটবর্ত্তী একটি শুষ্ক নদীগর্ভে নিজ নিজ প্রয়োজন সমাধা করিলেন! দেখিলাম, এই ট্রেণ হইতে প্রায় ১৫।১৬ জন যাত্রী এখানে ভোজন করিতে আসিয়াছিল। এই সোরন্নর গ্রামে ষ্টেশনের নিকট বোধ হইল প্রায় ৭।৫ ঘর ব্রাহ্মণ এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এখানে কলাপাতায় ভাত খাওয়া চলন আছে। দুইটী ঘরে ৮।১০ খানা করিয়া কলাপাতা পাতিয়া আমাদিগকে ভোজনার্থ

আহ্বান করিল। দেখিলাম একঘরে শূদ্র ও একঘরে শ্রেষ্ঠ জাতির স্থান হইয়াছে। আমাকে শ্রেষ্ঠ ঘরের একপার্শ্বে বসিতে বলিল। এবার আর বাটির পুরুষগণ নিকটে নাই, হিন্দী ভাষা চলিল না। ইসারা ইঙ্গিতে কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। ইহাঁরা অনেক সংস্কৃত কথা ব্যবহার করেন জানিতাম, সুতরাং ইসারা করিয়া একটি সংস্কৃত নাম উচ্চারণ করিলেই বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। ভাত কথার পরিবর্ত্তে অন্ন কথার দ্বারা ইসারায় আর চাই, কি চাহিনা বুঝাইলাম। ইহারা অনেক সময় মানা সত্তেও জেদ করিয়া ভাত দিতে প্রবৃত্ত হয়। সে স্থলে পুষ্কল শব্দ দ্বারা মনোভাব বুঝাইলাম। দেখিলাম, ইহাঁরা কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, ইহাঁরা অনেক সংস্কৃত শব্দের অর্থ বুঝেন।

যাউক। এক্ষণে ইহাঁরা আমায় যাহা খাইতে দিলেন, তাহা উল্লেখ-যোগ্য। ভাত যেমন আমাদের প্রধান খাদ্য, এখানেও তদ্রূপ। ডাল ইহাঁরা ব্যবহার করেন। যাহা আমাদিগকে দিলেন, তাহা মুসুর ডাল বলিয়া বোধ হইল। লঙ্কা ও তেঁতুল হরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করায় ইহার আস্বাদ আমাদের অপরিচিত হইলেও বিশ্রী বোধ হইল না। ব্যঞ্জন সর্ব্ব-শুদ্ধ দুইটী পাইলাম,—একটী নোনতা ও ঝাল, অপরটী অম্ল ও ঝাল। ব্যঞ্জনের প্রধান উপকরণ দেশী ও বিলাতি কুমড়া, কচু, লাউ, কাঁচকলা, করলা, উচ্ছে, বেগুন, নারিকেল কোরা প্রভৃতি। ডাল তরকারি ইহাঁরা নারিকেল তৈলে রন্ধন করেন বলিয়া প্রথমেই একটু নারিকেল তৈলের গন্ধ লাগিল, কিন্তু তৎপরে তজ্জন্য আর অসুবিধা বোধ হইল না। ডাল তর-কারী ব্যতীত ইহাঁরা নারিকেল তৈলে ভাজা দুইখানি পাঁপরও দিলেন। পাঁপরগুলি খুব সাদা পাতলা ও মুচমুচে। এতদ্দেশে আমরা যেরূপ পাঁপর সাধারণতঃ খাইয়া থাকি, তাহাপেক্ষা যে ইহা খুবই উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক অতঃপর আহার সমাধা করিয়া, তাঁহাদের অনু-রোধে নিজের উচ্ছিষ্ট পাতা নিজেই উঠাইয়া, মুখ প্রক্ষালন করিয়া গৃহস্বামীর হস্তে ৵০ আনা দিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। কোচিন অভিমুখী গাড়িটী ইতিমধ্যেই ষ্টেশনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, আমি একেবারেই তাহাতে আরোহণ করিয়া বসিলাম। বেলা তখন প্রায় একটা ; মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র তখন কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। রেলওয়ে টাইম ১ টা, ২ মিনিটে গাড়ি ছাড়িল। আমার গৃহে একটী নবনিযুক্ত টেলিগ্রাফ ইনস্পেক্টার ছিলেন।

ইনি মাদ্রাজী, ইঁহার সহিত ইংরাজিতে কথা কহিতে কহিতে চলিলাম। গাড়িটী কিয়দ্দূর পশ্চিম মুখে যাইয়াই দক্ষিণ মুখে ফিরিল। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, কোথাও বা উভয় পাহাড়ের মধ্যে উচ্চভূমি, কোথাও বা বেশ সমতল ভূমি নানাবিধ বৃক্ষলতাদিতে পূর্ণ। এখানকার গাছ পালা বেশ সতেজ ও মাটী লাল প্রস্তর খণ্ড মিশ্রিত; দেখিলে বোধ হয় যেন দেশটা খুব উর্ব্বরা। জমী অসমতল বলিয়া রেল লাইনটি কোথাও সরল নহে। লাইনটি এঁকিতে বেঁকিতে কোথাও উচ্চভূমির উপরে কোথাও ভূভাগ দ্বিখণ্ড করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে গ্রাম বা বসতি নয়নগোচর হইতে লাগিল। গ্রামগুলি প্রায়ই সমতল ভূমির উপরে অথবা পাহাড়ের পাদ-দেশে। এখানে আঁব, কাঁটাল, বেল, কলা, সুপারি, চিনের বাদাম ও নারি-কেল গাছ খুব প্রচুর। বাটীর চতুষ্পার্শ্বে এদেশে প্রায়ই বাগান থাকে এবং এই বাগানে সুপারি গাছই বেশী। আঁব কাঁটাল গাছ বাটীর নিকটে ইহারা বড় রাখে না। নিম্ন জমীতে ধান চাষ দেখিলাম, এবৎসর এ দেশে জলাভাব, শুনিলাম, চায আবাদ ভাল হইতেছে না। প্রায় সমস্ত জমীই শুষ্ক। পাহাড়গুলি সমস্তই মলয় পর্ব্বত নামে আখ্যাত হয়। কয়েকটি পাহাড় খুব নানা রঙ্গের নাতিবৃহৎ বৃক্ষে পূর্ণ। কোনটি বৃক্ষশূন্য কাল বা সবুজ। গরু মেষ মহিষ খুব প্রচুর বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে রেলের বাঁকা চোরা পথ আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে নানাবিধ দৃশ্য মধ্যে আনিয়া ফেলিতে-ছিল। এইরূপে ৪টি ষ্টেশন পার হইয়া আসিলাম, ষ্টেশন গুলি ছোট হইলেও ফল ফুলুরি ও খাবার খুব প্রচুর। অতঃপর আমি ত্রিচুর ষ্টেশনে আসি-লাম। এইখানেই আমার নামিবার সংকল্প ছিল, সুতরাং নামিলাম।

দেখি সমস্তই মালাবারী, একটিও মাদ্রাজী বা হিন্দুস্থানী দেখিলাম না। এখন যেন মাদ্রাজীকেও কতকটা পরিচিত মধ্যে গণ্য করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। ষ্টেশনটি ছোট পাথরের নির্ম্মিত। সর্ব্বশুদ্ধ ৪টি বা ৫টি ঘর আছে। ৩য় শ্রেণীর জন্য একটী এবং ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য একটী যাতায়াতের বিস্তৃত পথ ও বিশ্রামস্থান আছে। দূরে ইঞ্জিনের জল লইবার ব্যবস্থা। সোরানুর কোচিন লাইনটি কোচিন রাজার কৃত, উহা মাদ্রাজ রেলের তত্ত্বাবধানে পরিচা-লিত ও ৩। ৪ বৎসর মাত্র খুলিয়াছে; এখনও লাইনটী একহারা। প্রায় রেলওয়ে বেলা ২॥০ টার সময় এখানে পৌঁছিলাম। সূর্য্য তখন পশ্চিম ভাগে অবস্থিত, ষ্টেশনটীও পশ্চিমমুখী বলিয়া অস্তগামী রৌদ্রের তাপে স্থানটী অপ্রীতিকর

করিয়া তুলিয়াছে। কোথায় যাইব কি করিব, এই ভাবনায় আমি তখন একটু ব্যাকুল হইয়া, দুই একটী ভদ্রলোকের উপদেশের অপেক্ষা করিতেছিলাম। একটু পরেই গাড়িটী কোচিন অভিমুখে ছাড়িয়া দিল। ক্রমে সমস্ত যাত্রীই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল, আমি বোধ হইল যেন পড়িয়া রহিলাম। অতঃপর ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট যাইলাম ও নিজ দেশের পরিচয় দিয়া একটী উকিলের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি যত্ন সহকারে আর একটি ভদ্রলোকের নিকট আমায় লইয়া যাইয়া তাঁহাকে আমার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা করিতে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তিনিও একটি উকিল। তিনি অতি যত্নসহকারে একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে আমায় সেই উকিলটির নিকটে কাছারীতে লইয়া যাইতে বলিয়া দিলেন। ভাড়া তিনিই করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম।

গাড়িটি ষ্টেশন ছাড়িয়া ক্রমে উচ্চে উঠিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণপরে সমতল ক্ষেত্রে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সহরটি বেশ পরিষ্কার, পথ প্রশস্ত; বসত বাটিগুলি সমস্তই প্রায় বাগানের মধ্যস্থলে। বাগান প্রায় প্রাচীর দিয়া ঘেরা, প্রবেশের জন্য পথের উপর একটী ফটক। দোকান পাট অল্প। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটি মন্দিরবেষ্টিত দূর্ব্বাবৃত প্রকাণ্ড ময়দানের পার্শ্ব দিয়া কাছারী বাটীতে পঁহুছিলাম। এখানকার কাছারী বাটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটি ময়দানের মধ্যে অবস্থিত। একতলা, ৩টী ছোট ছোট পৃথক্ বাটীতে ৪।৫টী বড় বড় ঘর, ও চারিদিকে খিলান করা বারাণ্ডা ব্যতীত আর কোন অট্টালিকা নয়নগোচর হইল না। মধ্যে প্রবেশ করিয়া উকীল মহাশয়কে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি ইতিপূর্ব্বেই বাটী চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অনেক অন্বেষণেও তাঁহাকে না পাইয়া কয়েকটি ভদ্রলোকের নিকট হইতে তাঁহার বাটির ঠিকানা জানিয়া লইয়া গাড়োয়ানকে তথায় যাইতে বলিলাম।

গাড়োয়ানটি এবার ভাড়ার জন্য দর দস্তর করিতে লাগিল, অনেক বলা কহায় আরও ।• আনায় সম্মত হইয়া আমায় উকীলটির বাটী লইয়া চলিল। উকীলটির বাটি উক্ত বৃহৎ মন্দির বেষ্টিত ময়দানের পশ্চিম দিকে একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর। গাড়োয়ান বাড়ী জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে উকীল মহাশয়ের বাটী ঠিক করিয়া দিল ও তাঁহাকে আহ্বান করিতে

লাগিল। আমি ইতিমধ্যে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাটীর দ্বারদেশে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু পরে একটী বয়ঃস্থা বিধবা আসিল ও আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাঁহার ভাষা আমি কিছুই বুঝিলাম না, এবং আমার ভাষাও তিনি কিছুই বুঝিলেন না। অবশেষে উকীলটীকে ডাকিয়া দিলেন। বোধ হইল যেন তিনি উকীল মহাশয়ের জননী। উকীল বাবু বাহিরে আসিলেন ও আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। গাড়োয়ানটী তাহার কথায় আমার কিছু পরিচয় দিল, আমি ইংরাজীতে কথা কহিতেছিলাম, দেখিলাম তিনি ইংরাজী জানেন না। সুতরাং আমার নিকট একখানি পরিচয়পত্র ছিল, আমি সেইখানি তাঁহাকে দিলাম। তিনি পত্রখানি পড়িয়া গাড়োয়ানকে আমায় একটী ব্রাহ্মণের হোটেলে লইয়া যাইতে বলিলেন। সুতরাং আমিও বিদায় লইলাম। ভাবিয়াছিলাম তাঁহার বাটীতে স্থান পাইব, কিন্তু হোটেলের কথা শুনিয়া একটু অসুবিধার চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমার এই উকীল বাবুর পরিচয় লাভের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয় নাই। ত্রিচুর আসিবার পূর্ব্বে ত্রিচুরের কোন ভদ্রলোকের নামে এক আধ খানি পত্র সংগ্রহের চেষ্টা আমার যথেষ্ট ছিল। মাদ্রাজে যে মালাবারি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়, যাঁহার সঙ্গে রামেশ্বর পর্য্যন্ত একত্র যাইয়াছিলাম, তাঁহার বাটী ত্রিচুর হইতে একটু দূরে, তিনি আমায় কয়েকটী সম্ভ্রান্ত লোকের নাম ধাম বলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু কোন পত্রাদি কাহারো উপর দিতে পারেন নাই। যাহা হউক ইঁহার সাহায্যে ত্রিচুরের দুইটি ভদ্রলোকের নাম সংগ্রহ করিয়া লই। একটী উকীল ও একটী হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। উকীলটীর নাম কর্ণাকর মেনন্, এবং হেড্‌মাষ্টারটীর নাম পি কৃষ্ণমেনন্ বি, এ। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, উক্ত ভদ্রলোক দুই জনার মধ্যে কাহারো নিকট আশ্রয় লইব, কিন্তু রামেশ্বর হইতে ত্রিচুর আসিতে ইরোড নামক স্থানে গাড়ীতে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় উক্ত চিন্তা পরিত্যাগ করি। ইনি সদ্য ওকালতী করিতে যাইতেছিলেন। কথায় কথায় আমার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া আমার সুবিধার জন্য ইনি ত্রিচুরের আর একটী উকিলের নামে গাড়ীতে বসিয়াই একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। পত্রখানি লিখিলেন তামিল ভাষায়। সুতরাং পত্রে কি লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর জানিতে পারি নাই।

যাহা হউক উকীল বাবুর গৃহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্দির বেষ্টিত ময়দানের পশ্চিম পার্শ্বে পথের ধারে সেই গাড়ী চড়িয়া আসিলাম। গাড়োয়ান এবার আর ভাড়ার জন্ম চুক্তি করিল না, তবে সে যে নিতান্ত আনন্দ সহকারে আমায় হোটেলে আনিয়া আমার এই উপকার করিতেছিল তাহাও নহে, বোধ হইল উক্ত উকীলের কথায় একটী নিরাশ্রয় বিদেশীর কষ্ট মনে করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাহা হোটেল বলিয়া নির্দ্দেশ করিল, তাহা দেখিয়া প্রথমতঃ আমায় কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক উপস্থিতের বিধান কর্ত্তব্য ভাবিয়া হোটেলস্বামীকে ডাকিয়া তাঁহার মূল্যের হার জানিতে চাহিলাম। তিনি একটু হিন্দী ও ইংরাজী বুঝিতেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, ময়লা এক খানি কাপড় পরা মাত্র। পোষাকে সভ্যতা কিছুই নাই। হোটেল বাড়ীটী দ্বিতল কোটা, উপরে একটী ঘর ও বারাণ্ডা। নীচে হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ী সেই বারাণ্ডারই এক প্রান্তে। বারাণ্ডায় কাঠের রেলিং আছে, আলকাতরা দিয়া রং করা। নীচে একটী বারাণ্ডা, উপরের ঘরের নীচে একটী মাত্র ঘর, এবং সেই ঘরের পরে ভিতরের দিকে তাঁহাদের রান্নাঘর। নীচের ঘরে যাত্রীদিগকে খাওয়ান হয় ও রাত্রিকালে তাঁহারা শয়ন করেন। ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক এই হোটেলটী চালাইতেছেন, স্ত্রীই সাধারণতঃ রন্ধন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের সন্তানদের মধ্যে একটা শিশু মাত্র। অতঃপর আমি আমায় কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্রাহ্মণ বিদেশী পাইয়া তাঁহার সঙ্কোচ্ছায় আমায় জ্ঞাপন করিলেন, আমিও তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহার উপরের ঘরটা অধিকার করিলাম।

এখানে একবেলা অন্নের জন্য সাধারণতঃ ৫।৬ পয়সা যথেষ্ট, কিন্তু আমার নিকট তিনি ৶৹আনা চাহিলেন, ও ঘর ভাড়ার জন্য আরও৶৹আনা চাহিলেন। যাহা হউক গাড়োয়ানটীকে ॥৹ আনা দিয়া বিদায় করিয়া উপরের ঘরে ক্রমে বিছানা বিছাইয়া পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম ও সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত ময়দান ও তন্মধ্যস্থ মন্দিরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। আমি যে কয়দিন ছিলাম, তন্মধ্যে হোটেলস্বামীর উপরের ঘরে আর কোন যাত্রী আসে নাই, সুতরাং একাকীই ঘরটী অধিকার করিতে লাগিলাম। কিয়ৎপরে, অপরাহ্নে ২ টী ব্রাহ্মণযুবক আসিল। তাহারা আমাকে বাঙ্গালী শুনিয়া দেখিবার জন্ম হোটেলস্বামীর সঙ্গে উপরে আসিল। হোটেলস্বামী তাহাদিগকে বল-

বালক বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আমি তাহাদিগকে ইংরাজীতে সম্বোধন করিলাম। তাহারাও ইংরাজীতে উত্তর দিল দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ইহারা দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে লেখা পড়া শিখিবার জন্য এই ত্রিচুর সহরে রহিয়াছে। তাহারা দুই বেলা খাইবার জন্য এই হোটেলে আইসে ও তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট একটী ধর্ম্মশালায় থাকে। ইহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১০৲ মাহিনায় সরকারের চাকরী করে ও ভাই দুইটীকে মানুষ করিতেছে। এই হোটেলে খাদ্যের জন্য প্রত্যেকে ৪৲ টাকা করিয়া দিয়া থাকে। ইহাদের একজন ১ম শ্রেণী ও একজন ৩য় শ্রেণীতে পড়ে। ক্রমে আমি ইহাদের সঙ্গে একটু মেশামেশি করিতে লাগিলাম। ইহারা বালক হইলেও ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহারা ইহাদের দেশের কথা অতিরঞ্জিত করিতে ততদূর সমর্থ হইবে না। অনেকে বিদেশীর কাছে স্বদেশের কথা ফলাইয়া বাড়াইয়া বলে, ইহারা বালক সুতরাং সে সব চাতুর্য্যে ইহারা ততদূর অভ্যস্ত নাও হইতে পারে এরূপ চিন্তাও আমার মনে আসিল। এ দেশী ব্রাহ্মণের বিষয় যাহা ইহারা বলিল, তাহাতে এদেশে প্রধানতঃ দুই প্রকার ব্রাহ্মণ আছে। ১ম নম্বুরি ও ২য় পরদেশী। নম্বুরি এইদেশের আদিম ব্রাহ্মণ, পরদেশিগণ বহুপরে মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে ক্রমে আসিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে নম্বুরী ও পরদেশিগণের আচার ব্যবহার এবং বেশ সম্পূর্ণ পৃথক্। বালকদিগের এরূপ বিভাগ খুবই স্বাভাবিক বর্ণনা বলিয়া বোধ হইল। নম্বুরীদিগের কুলেই শঙ্করের জন্ম হয় সুতরাং নম্বুরীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহাদের মতামতও জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে যাহা জানিলাম ও পরে প্রত্যক্ষ যাহা করিলাম, তাহাতে বালকদিগের কথায় অনাস্থা করিবার বিশেষ হেতু বড় দেখি না।

নাসিক ও ত্র্যম্বক।

(শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক।)

মহারাষ্ট্র দেশে গোদাবরী নদীতীরে অবস্থিত নাসিক বা পঞ্চবটী পুরাকাল হইতেই হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ত্রেতাযুগে ভগবান্ বিষ্ণু দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃসত্য পালন

জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কালীন, এই স্থানে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানের অদূরেই গোদাবরী বা গৌতমী গঙ্গার উৎপত্তি স্থান ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত এবং দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বক নামক মহাদেব অবস্থিত। নাসিকে দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হইয়া থাকে ; এ কারণ অনেক সাধু সন্ন্যাসী ঐ সময় এই স্থানে সমবেত হন।

রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র বনবাস কালীন প্রথম চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করেন। সে সময় ভরত অযোধ্যাবাসী প্রজা সমভিব্যাহারে এই চিত্রকূটে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং পিতা দশরথের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, পিতৃরাজ্যপালন করিতে অনেক অনুরোধ করেন। শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বুঝাইয়া এবং স্বীয় পাদুকা ভরতকে দিয়া, তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রেরণ করেন ; এবং চিত্রকূট অযোধ্যার নিকটে অবস্থিত, অতএব আত্মীয়গণ প্রায়ই এই স্থানে আসিতে পারে ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি চিত্রকূটস্থিত অত্রিমুনির সহিত পরামর্শ করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করেন। পথে বিরাধ নামক রাক্ষস বধ করিয়া ও শরভঙ্গ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন এবং সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট দণ্ডকারণ্যে থাকিবার আজ্ঞা লইয়া শ্রীরামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণমুনির কথামত দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত অগস্ত্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। অগস্ত্য মুনির কথামত শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণ প্রান্তে জনস্থানের নিকটবর্ত্তী গোদাবরী নদী তটে অবস্থিত পঞ্চবটী বনে বাস করিবার জন্য গমন করেন। পঞ্চবটী বনের নিকট পিতৃসখা গৃধ্রাজ জটায়ুর সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় এবং জটায়ু সীতার রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিশ্রুত হয়। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র নানাবিধ হিংস্র জন্তু ও হরিণাদি জন্তু পূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! মহর্ষি অগস্ত্য যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, আমরা সেই সর্ব্বদা পুষ্পসমন্বিত পঞ্চবটী কাননে আগমন করিয়াছি ; অতএব কোন্ প্রদেশে আমাদের আশ্রম হইতে পারে, তাহা নির্ণয় কর"। পরে শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বগুণান্বিত একটি প্রদেশ মনোনীত করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই প্রদেশ সমতল, পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও অতীব শোভাযুক্ত, তুমি এই স্থলে যথাযোগ্য রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ কর। অনতিদূরে ঐ যে সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল সুগন্ধ

পদ্মসমূহে শোভিত রমণীয়া নদী দেখা যাইতেছে; যাহার উভয় তট পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষ সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, যাহার অনতিদূরে ও অনতিনিকটে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে এবং যাহা হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণা এবং চক্রবাকসমূহে শোভিতা রহিয়াছে, সেই ঐ রমণীয়া নদী গোদাবরী, কেননা বিশুদ্ধচিত্ত অগস্ত্যমুনি ঐ রূপই বর্ণন করিয়াছেন। শাল, তাল, তমাল, পনস, খর্জ্জুর, তিমিস, নীবার, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, তিনিশ, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী ও পাটল এই সমস্ত গুল্ম পরিবৃত লতাসমন্বিত পুষ্পিত বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, ময়ূর শব্দে নিনাদিত বহু-কন্দরযুক্ত উচ্চ ও রমণীয় অনেক সুদৃশ্য পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতে স্থানে স্থানে গজ সকল সুবর্ণ রজত ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রেখা দ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! এইস্থান রমণীয় পুণ্য-জনক এবং বিচিত্র মৃগ ও পক্ষিসমূহে সেবিত অতএব আমরা এই জটায়ু পক্ষীর সহিত এই স্থানেই বাস করিব। শত্রুহন্তা বীর লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি রঘুনন্দন রামের নিমিত্ত সুদৃশ্য অতি উত্তম এক পর্ণকুটীর রচনা করিলেন। রঘুনন্দন রাম সেই সুনির্ম্মিত, শুভদর্শন পর্ণকুটীর দর্শন করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া তথায় বাস করিলেন। এখনও দর্শকগণ এই পঞ্চবটীতে আসিয়া রামায়ণ বর্ণিত এই স্থানের শোভা সকল দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। পঞ্চবটীতে অবস্থান কালীন লক্ষ্মণ দশাননভগিনী শূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। এ কারণ এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। এইস্থানে অবস্থান কালীন শ্রীরামচন্দ্র জনস্থানের অধিপতি দশাননের ভ্রাতা খর নামক রাক্ষস ও ত্রিশিরা, দূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য বধ করেন। এইস্থান হইতেই লঙ্কাধিপ রাবণ মায়া-মৃগ-রূপ-ধারী মারীচ রাক্ষসের সাহায্যে সীতা দেবীকে হরণ করে। সীতা হরণ করিয়া লইয়া যাইবার কালীন রাবণ এই স্থানের নিকটেই জটায়ু কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে মৃতকল্প করিয়া সীতাদেবীকে লঙ্কায় লইয়া যায়। সীতা হরণের পর শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটীর আশ্রম ত্যাগ করিয়া সীতান্বেষণার্থে দক্ষিণ দেশে গমন করেন।

নাসিক বা পঞ্চবটীর ২২ মাইল দূরে ত্র্যম্বক নামক পল্লীতে গোদাবরীর

উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত ও ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব অবস্থিত। এই ত্র্যম্বক সম্বন্ধে শিবপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে মহর্ষি গৌতম দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপর্ব্বতে পতিব্রতা পত্নী অহল্যার সহিত দশ সহস্র বৎসর ধরিয়া তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যা কালে শত বর্ষ ধরিয়া অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছিল। এ কারণ জলের অভাবে মহর্ষি গৌতম বরুণদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য ছয় মাস তাঁহার আরাধনা করেন। বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া মহর্ষি গৌতমকে গর্ত্ত খনন করিতে বলিলেন। মহর্ষি গৌতম গর্ত্ত খনন করিলে বরুণদেব ঐ কুণ্ড জলে পূর্ণ করিলেন এবং ঐ জল অক্ষয় থাকিবে ও উহা কুশাবর্ত্ত নামক তীর্থ হইবে বলিয়া বরুণদেব প্রস্থান করিলেন। অপরাপর মুনি ঋষিগণ জলের সুবিধার জন্য এই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মহর্ষি গৌতমের শিষ্যগণের সহিত এবং পরে অহল্যার সহিত অপরাপর মুনিপত্নী-দের এই কুশাবর্ত্ত কুণ্ডে জল লইবার জন্য বিবাদ হয়। অপরাপর মুনিগণ পত্নীদিগের উত্তেজনায় মহর্ষি গৌতমের অনিষ্ট করিবার বাসনায় বিঘ্নরাজ গণপতির পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। বিঘ্নরাজ মহর্ষিগণের প্রার্থনামত একদিন মহর্ষি গৌতমের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে শীর্ণকায় গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া শস্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্য-বসরে মহর্ষি গৌতম তথায় দৈবাৎ উপস্থিত হইয়া ঐ গাভীকে শস্য ভক্ষণ করিতে দেখিয়া, তৃণগুচ্ছের দ্বারায় তাহাকে তাড়াইতে গেলেন। দৈবী-মায়ায় তৃণগুচ্ছ স্পর্শ মাত্র ঐ গাভী তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া অপরাপর ঋষিগণ বলিয়া উঠিলেন, গোঘাতক এই দুরাত্মা গৌতমের মুখ দর্শন করিতে নাই অতএব তুই এই স্থান হইতে এখনই দূর হ; এবং গো-বধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্। তখন মহর্ষি গৌতম ঐ ঋষিগণকে কিরূপ প্রায়-শ্চিত্ত করিব জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন তুমি এই ব্রহ্মগিরি একশত বার প্রদক্ষিণ কর এবং গঙ্গা আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে স্নান ও শিবলিঙ্গের পূজা করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা দিলে মহর্ষি গৌতম ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি ধ্যান পূর্ব্বক শিবপূজা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। মহর্ষি গৌতম মহাদেবের নিকট গঙ্গা প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ শঙ্কর গৌতমকে গঙ্গা প্রদান করিলেন এবং সপরিবারে ঋষিকে পবিত্র কর বলিয়া গঙ্গাকে আজ্ঞা দিলেন। তখন গঙ্গা বলিলেন, আমি সপরিবারে ঋষিকে পবিত্র করিব বটে, কিন্তু পরে শঙ্করে

বিলীন হইব। ইহা শুনিয়া মহর্ষি গৌতম গঙ্গাকে ঐ স্থানে বরাবর থাকিবার জন্ত বিশেষ প্রার্থনা করিলে গঙ্গা বলিলেন, যদি এইস্থানে ভগবান্ শঙ্কর বিরাজ করেন, তাহা হইলেই আমি থাকিব। কিন্তু অপরাপর ছলকারী ঋষিগণকে আমি পবিত্র করিব না, এবং তাহাদিগের মুখ দেখিব না। ভগবান্ শঙ্কর গঙ্গার এই বাক্য শুনিয়া এই স্থানে ত্র্যম্বকেশ্বর নামে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপে অবস্থান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। ইতিমধ্যে দেবগণ ও তীর্থসকল উপস্থিত হইয়া গঙ্গাকে এইস্থানে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, আমরা একাদশ বর্ষ ধরিয়া লোকের পাপক্ষালনে মলিন হইয়া থাকি। সেই মালিন্য নিবারণের জন্য প্রত্যেক দ্বাদশ বর্ষে বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গত হইলে আমরা সকলে আপনার নিকট স্নানার্থ আসিব। অতএব লোকের অনুগ্রহ জন্ত ও আমাদিগের হিতের জন্য আপনার ও ভগবান্ শঙ্করের এইস্থানে থাকিতে হইবে। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত এই গোদাবরী বা গৌতমী গঙ্গা তীরে প্রত্যেক দ্বাদশ বর্ষে কুম্ভমেলায় সাধু সন্ন্যাসিগণ স্নানার্থ আগমন করেন। দেবগণ তীর্থসকল ও গৌতম এইরূপ প্রার্থনা করিলে সরিদ্বরা গঙ্গা স্বয়ং ব্রহ্মগিরি হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার প্রবাহ ব্রহ্মগিরি হইতে উডুম্বর বৃক্ষের নিকট ভূতলে পতিত হইল। তথায় মহর্ষি গৌতম সমাগত দেবগণ সহিত হর্ষান্বিত হইয়া স্নান করিলেন। পরে গৌতমক্ষেত্রবাসী অপরাপর দুর্ব্বৃত্ত ঋষিগণ তথায় স্নান করিতে আসিলে, গঙ্গাদেবী সহসা অন্তর্হিত হইলেন। পরে মহর্ষি গৌতমের প্রার্থনায় পুনরায় কুশাবর্ত্ত কুণ্ডে আবির্ভূত হইয়া তথা হইতে অদৃশ্যভাবে ভূমির নিম্নদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ত্র্যম্বকেশ্বর লিঙ্গে পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন এবং ত্র্যম্বকেশ্বর হইতে অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় নাসিকের ৮।১০ মাইল উপর হইতে নদী আকারে প্রবাহিত হইলেন। এখনও গোদাবরী বা গৌতমী গঙ্গার এইরূপ উৎপত্তির ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি বম্বে হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলযোগে নাসিক রোড ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নাসিক সহর ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে সহর যাইবার জন্ত ট্রাম গাড়ি আছে এবং অপরাপর সোয়ারিও পাওয়া যায়। এইস্থানের ষ্টেশনে নামিয়াই আমি জনৈক পাণ্ডার সহিত একখানি টঙ্গা গাড়ী ভাড়া করিয়া নাসিক

সহরে, উক্ত পাণ্ডার বাটীতে গিয়া পৌছিলাম। পাণ্ডা মহাশয় আমাকে থাকিবার জন্য একটী পৃথক্ ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, আমি সেই ঘরে আপনার দ্রব্যাদি রাখিয়া, তখন সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে দেখিয়া সন্ধ্যা করিবার জন্য পাণ্ডার সহিত গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইলাম। অগভীর ও খরস্রোতা গোদাবরী তটে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত ঘাট ও মন্দির শোভা দেখিতে অতি রমণীয়।

বস্তুতঃ কাশীর গঙ্গাতীব, মথুরার যমুনাতট বা উজ্জয়িনীর সিপ্রা নদীর পুলিনশোভা ব্যতীত এরূপ মনোহর দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই। গোদাবরীর জলও বেশ স্বচ্ছ; পাড় হইতে ৩।৪ সিঁড়ি নামিলেই জল পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকগণ জল আহরণার্থ ও তৈজস পাত্রাদি ধৌত করিবার জন্য নদীতীরে গমন করিতেছে এবং মহারাষ্ট্রীয ব্রাহ্মণগণ ঘাটের পাষাণ নির্ম্মিত সিঁড়িতে বসিয়া সন্ধ্যোপোসনা ও স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। পবিত্রসলিলা গোদাবরীর তীরে পাষাণ নির্ম্মিত অসংখ্য অট্টালিকা সমন্বিত নাসিক নগরী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া আছে। সন্ধ্যার সময় অসংখ্য মন্দির হইতে শঙ্খ ঘণ্টাদির আরতিশব্দ, গোদাবরী সলিলের কল্লোলধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া এক মধুর শ্রুতিমনোহর ধ্বনি উৎপাদন করিতেছে। আমিও গোদাবরীতটে অনেকক্ষণ বসিয়া এই সকল আনন্দ উপভোগ করিয়া এবং সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া পাণ্ডার সহিত কএকটী মন্দির দেখিয়া বাসায় উপস্থিত হইলাম।

পরদিন প্রাতে পাণ্ডার সহিত গোদাবরীতে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইলাম। গোদাবরী, যমুনা বা সিপ্রানদী অপেক্ষায়ও পরিসরে অল্প। এখানে গোদাবরীর পর পারে যাইবার জন্য একটী পাথরের অনেকগুলি খিলান বিশিষ্ট সেতু আছে। আমরা এই সেতুযোগে গোদাবরী পার হইয়া পরপারে উপস্থিত হইলাম এবং নদীতীর দিয়া গোদাবরীর স্রোতোভিমুখে অল্পদূর যাইয়াই একটী শাক তরকারী বিক্রয়ের বাজার দেখিতে পাইলাম। এই বাজার ভিন্ন পরপারে নাসিক সহরের মধ্যেও অনেক গুলি বাজার আছে। আমি এই বাজার হইতে শ্রাদ্ধোপকরণ দ্রব্য কিছু খরিদ করিয়া পুনরায় নদীতট দিয়া আরো কএকটী মঠ ছত্র ও ধর্ম্মশালা অতিক্রম পূর্ব্বক একটী ছোট ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই ঘাটেই শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা, নিকটেই একজন

নাপিত বসিয়া আছে। আমি প্রথমে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিয়া পাণ্ডার সাহায্যে নারিকেল পুষ্প ও দুগ্ধের দ্বারায় গোদাবরীর পূজা দিয়া স্নান করিলাম। স্নানান্তে শ্রাদ্ধাদি সমুদয় কার্য্য করিতে হইল। শ্রাদ্ধান্তে পুনরায় তর্পণ ও স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বৈকালে পাণ্ডার সহিত বাসা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে গোদাবরী-তট হইতে কিছুদূরে অবস্থিত একটী দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত ও বেশ বড়; মন্দির মধ্যে দেবীর পাষাণনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজিত। এই দেবীমন্দিরটী অনেকটা কাশীর সঙ্কটা দেবীর মন্দিরের ন্যায়; এবং এই দেবীই নাসিকের প্রধান দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রত্যহ স্থানীয় অনেক লোক এবং যাত্রী পূজা করিতে আইসেন। আমিও পাণ্ডার সাহায্যে পূজাদি করিয়া এখান হইতে বাহির হইয়া গোদাবরীর তটে উপস্থিত হইলাম। এবং সকাল বেলার ন্যায় এই প্রস্তরনির্ম্মিত সাঁকো দিয়া গোদাবরী পার হইয়া পরপারে ঠিক সাঁকোর সম্মুখে অবস্থিত একটী প্রাচীন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত, চতুর্দ্দিকে উচ্চ গড়ের ন্যায় প্রাচীর বেষ্টিত, মন্দিরে প্রবেশের দুই দিকে দুইটী দ্বার আছে। মন্দিরের ভিতর চতুর্দ্দিকে সাধুদের থাকিবার জন্য গৃহ ও মধ্যস্থলে প্রাঙ্গন। এই প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যস্থলে দেবমন্দির। মন্দিরের মধ্যে ৩।৪টী দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। চতুর্দ্দিকে সাধুদের থাকিবার যে গৃহশ্রেণী আছে, সিঁড়ি দিয়া তাহার ছাদে উঠিলে গোদাবরীপুলিনের মনোহর শোভা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। গোদাবরীর এ পারেও নাসিক সহরের অংশবিশেষ অবস্থিত, একারণ এপারেও অনেক লোকজনের বসবাস আছে। বিশেষতঃ এই পারেই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীদের অধিকাংশ মঠই অবস্থিত।

আমরা এই মন্দির হইতে বাহির হইয়া নাসিক সহরের এই অংশের মধ্য দিয়া কিছুদূর যাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই মন্দিরটী বেশ বড়, মন্দির মধ্যে প্রাঙ্গনের মধ্যস্থিত ঘরে রাম সীতার মূর্ত্তি বিরাজিত এবং প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত লোকজনের ও অভ্যাগত সাধুদিগের থাকিবার জন্য অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। আমরা এই মন্দির দেখিয়া এখান হইতে নিকটে লক্ষ্মণমন্দিরে

গমন করিলাম। এ মন্দিরটীও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত। মন্দিরের মধ্যে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। এই লক্ষ্মণমন্দির ও পূর্ব্বোক্ত রামমন্দির এই দুইটী মন্দিরই কোন ধনী ব্যক্তি নিজ পুণ্য কীর্ত্তির স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি মন্দির আধুনিক, ইহা কোন প্রাচীন নিদর্শন নহে। লক্ষ্মণমন্দির হইতে বাহির হইয়া আমরা অল্পদূর গিয়াই সহরের এই অংশের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলাম। পরে কিছুদূর বৃক্ষাদিশোভিত প্রান্তরের মধ্যে গমন করিয়া সীতাগুহায় উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে একটী পাকা দালান আছে, ইহার এক পার্শ্বস্থ একটী দ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গের ভিতর দিয়া একটী গুহায় পৌঁছিলাম। গুহার অভ্যন্তর অন্ধকারময়, কোন দিক্ দিয়া বাতাস আসিবার উপায় নাই। একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহার সাহায্যে সীতাদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম, শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী অবস্থান কালীন, রাবণভগিনী শূর্পনখা রামকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করায় রাম অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উক্ত রাক্ষসী কুপিত হইয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে সীতা ভয়ে এই গুহামধ্যে লুক্কায়িত হন। অনন্তর রামের ইঙ্গিতে মহাবীর লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসা কর্ণ ছেদন করেন। তদবধি এই স্থান নাসিক তীর্থ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। আবার যখন শ্রীরামচন্দ্র রাবণভ্রাতা খর ও জনস্থাননিবাসী রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করেন, তখনও সীতাদেবী রাক্ষসভয়ে এই গুহায় লুকাইয়াছিলেন। গুহার বাহিরে আসিয়া আমরা এই স্থানের সম্মুখে ও নিকটে আরও ২।৩টী সাধুদের আস্থানা দর্শন করিলাম। এইস্থান হইতে এক ক্রোশ প্রান্তর ও কাননের মধ্য দিয়া এবং প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গোদাবরীর তট দিয়া গমন করিলেই শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণশালায় যাওয়া যায়। আমরা সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া আর পর্ণশালা দর্শনে না গিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে পর্ণশালা দেখিবার জন্য পাণ্ডার সহিত বাসা হইতে বাহির হইয়া গোদাবরীতটে উপস্থিত হইলাম এবং পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সেই পাকা সেতু পার না হইয়া, গোদাবরীর দক্ষিণ তট দিয়া গোদাবরীর স্রোতোভিমুখে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইয়াই সহরসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক

গোদাবরীতটে অবস্থিত কএকটী সাধু সন্ন্যাসীদের মঠ পার হইয়া, প্রায় দেড় মাইল যাইয়া, গোদাবরী পার হইলাম। এখানে গোদাবরী পার হইবার জন্য পোল নাই; তবে এখানে গোদাবরীর জল অতি অল্প, এক হাত কিম্বা দেড় হাতের অধিক গভীর নহে। আমরা পরপারে আবার গোদাবরীর ধারে ধারে ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্রোতোভিমুখে প্রায় এক মাইল যাইয়া পর্ণশালায় উপস্থিত হইলাম। আমরা প্রথমে পর্ণশালার নিকট অরুণা ও গোদাবরীর সঙ্গমে স্নান করিতে গমন করিলাম। এই স্থানটি পর্ব্বতসঙ্কুল, বামপার্শ্বস্থ পর্ব্বত মালার মধ্য দিয়া ক্ষীণকায়া অরুণা নদী আসিয়া গোদাবরীতে মিলিত হইয়াছে। এই বামপার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালার কিছুদূরে অনেক বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই গোদাবরী সঙ্গম সম্পূর্ণ নির্জ্জন। আমি পাণ্ডার সাহায্যে সঙ্গমস্থলে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলাম। স্নানান্তে আমরা পর্ণশালায় উপস্থিত হইলাম। পর্ণশালার একটী কুটীর মধ্যে রাম সীতার অতি সুন্দর মূর্ত্তি অবস্থিত। অধুনা এই পর্ণশালা সাধুদের আস্থানা হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি সাধু বাস করেন। এই স্থানের দৃশ্য অতি রমণীয়, এখন এখানে পঞ্চবটী বিদ্যমান আছে। এখানে শ্রীরাম-চন্দ্র বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। আমরা ভক্তিপূর্ব্বক এই স্থান প্রদ-ক্ষিণ ও মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এখান হইতে গোদাবরী সন্নিহিত পঞ্চবটী-কাননের মধ্য দিয়া গমন কালীন আরও ২।৩টী সাধুদের মঠ দর্শন করিলাম। পথে ময়ূরসকল বিশ্বস্তচিত্তে বসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম। সুন্দর সুন্দর হরিণের দল আমাদিগকে দেখিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। উক্ত মঠগুলির মধ্যেও রামসীতার মূর্ত্তি আছে। এখানকার অধিকাংশ মঠই শ্রীরামানুজী বৈষ্ণবদের। আমরা এই সকল দেখিয়া পুনরায় গোদাবরী পার হইয়া পূর্ব্বোক্ত পথে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বৈকালে সহর দেখিতে বাসা হইতে বাহির হইলাম। সহরে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ্ আফিস্, মিউনিসিপাল আফিস্, কাছারী, আদালত প্রভৃতি সরকারি কার্য্যালয়, ইস্কুল, কয়েকটী বাজার ও নানা দ্রব্যের অসংখ্য বিপণি দেখিলাম। এখানে প্রায় ৪০ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে প্রায় ১২ হাজার ব্রাহ্মণ। এখানকার লোক সকলেই মহারাষ্ট্রীয় জাতি। বাজার হাট, পথ ঘাট সকলই লোকে পরিপূর্ণ। সহরে প্রশস্ত রাস্তার সংখ্যা

অল্পই, অধিকাংশ গলি রাস্তা। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকগণ প্রায় অনেকেই প্রাতে নিজ নিজ বাটির সম্মুখস্থ রাস্তা গোময় দ্বারায় লেপন করিয়া, সদর দ্বারের সম্মুখে আলপনা দ্বারা পদ্ম প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে, ইহাতে রাস্তাগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। নাসিক সহর বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। সহরটি আকার, আয়তন এবং লোকসংখ্যায় এই প্রেসিডেন্সির মধ্যে বম্বে ও পুনা সহরের নিম্নেই স্থান লাভ করিয়াছে; কিন্তু আমার বোধ হইল,ইহা পুনা সহরের সমকক্ষ। এখানকার লোকজন বেশ সভ্য ভব্য, শিক্ষিত, উদ্যমশীল এবং স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্। নাসিক নগর অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান, একারণ সহরপ্রান্তে অনেক ইংরাজ বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। সহরের কয়েক মাইল দূরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী সেনানিবাস বা ছাউনি আছে। নাসিক হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। প্রবাদ এইরূপ, এখান হইতে বহুদূরে ঝিড়ি কাল্লতে মারীচবধ হইয়াছিল। ঐ স্থানে ধাবমান হরিণের পদচিহ্ন প্রস্তরোপরি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গোদাবরীর স্রোতের বিপরীত দিকে ৭।৮ মাইল যাইলে গঙ্গাপুর নামক স্থানে কতকগুলি দেবমন্দির ও একটী মনোহর জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকের ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বৌদ্ধদিগের পাণ্ডুলিনা নামক সপ্তদশ গুহা। নগরের ৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাপুরের নিকট বৌদ্ধদিগের চামারলিনা নামক গুহা, ইহাকেই স্থানীয় লোকে পাণ্ডব গুহা বলিয়া থাকে। যাত্রিগণ অনেকেই নাসিক হইতে এই স্থান দেখিতে আগমন করেন; কিন্তু যাঁহারা ত্র্যম্বক যান, তাঁহারা ত্র্যম্বক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন বাঁধা পথ ছাড়িয়া কিছু ঘুরিয়া এই গঙ্গাপুর ও পাণ্ডবগুহা দেখিয়া নাসিক ফিরিয়া আসেন। পাণ্ডবগুহা পর্ব্বতগাত্রে খোদিত, ভিতরে কএকটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। পাণ্ডারা বলেন, পাণ্ডবগণ বনবাসকালীন এই স্থানে বাস করিযাছিলেন এবং ঐ মূর্ত্তিগুলিও পাণ্ডবদের মূর্ত্তি। গঙ্গাপুরের জলপ্রপাত ছোট, তবে দেখিতে বেশ সুন্দর। এখানকার মন্দির গুলিও বেশ সুন্দর। এই স্থানের দৃশ্য অতি রমণীয়, গৌতমী গঙ্গা ত্র্যম্বক সহরে ভূমধ্যে বিলীন হইয়া পুনরায় এই স্থানের নিকট হইতে নদী আকারে প্রবাহিত হইয়াছে, এ কারণ এ স্থানের নাম গঙ্গাপুর বা গঙ্গাদ্বার। গোদাবরীর উৎকৃষ্টতম এই তীর্থে হরিদ্বারের ন্যায় দ্বাদশ বর্ষান্তে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে, সে সময় বিস্তর সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রীর সমাগম হয়। নাসিক

বা পঞ্চবটীর নিকটে পুরাকালে শরভঙ্গ মুনির, সুতীক্ষ্ণ মুনির ও মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম ছিল, কিন্তু এখন আর ঐ সকল আশ্রমের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। নাসিকে আগত সাধু ও যাত্রীদের জন্য কএকটী ছত্র ও ধরমশালা আছে; এবং এখানে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সাধুসন্যাসীদের মঠ বা আখড়া আছে।

পরদিন প্রাতে আমি ত্র্যম্বক যাইবার জন্য সোয়ারির চেষ্টায় বাসা হইতে বাহির হইয়া গোদাবরী তটে উপস্থিত হইলাম। গোদাবরীর তটে, একস্থানে ত্র্যম্বক যাইবার ২।৩ খানি টঙ্গা ও ৬।৭ খানি গোরুর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। সে সময় কএকজন যাত্রী গোরুর গাড়ি ভাড়া করিতেছিল। গোরুর গাড়িতে বিলম্ব হইবে বলিয়া আমি টঙ্গায় যাইবার সহযাত্রী দেখিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন টঙ্গার সহযাত্রী পাইলাম না, এবং একলা একখানি টঙ্গার ভাড়া দিয়া ত্র্যম্বক যাওয়াও আমার পক্ষে কষ্টকর, এ কারণ আমি অগত্যা একখানি সেয়ারের গরুর গাড়িতে অপরাপর যাত্রীর সহিত চারি আনা ভাড়া ঠিক করিয়া ত্র্যম্বক যাত্রা করিলাম। ত্র্যম্বক যাইতে যাতায়াতের একখানি টঙ্গার ভাড়া ৫।৬ টাকা লাগে, কেবল মাত্র যাইবার জন্য ৩।৪ টাকা। টঙ্গা করিয়া ত্র্যম্বক যাইলে সেই দিনই ত্র্যম্বক দেখিয়া নাসিক ফিরিয়া আসা যায়। কিন্তু গোরুর গাড়িতে একদিন অধিক সময় লাগে। আমরা গোরুর গাড়ি করিয়া নাসিক সহরের মধ্য দিয়া খানিক দূর আসিয়া ত্র্যম্বক যাইবার রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে ত্র্যম্বক ২২ মাইল, বেশ পাকা রাস্তা, রাস্তাটী বৃক্ষাদিপূর্ণ কাননের মধ্য দিয়া এবং স্থানে স্থানে ঐ পর্ব্বতের কোল দিয়া ত্র্যম্বক পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা গোরুর গাড়ি যোগে এই রাস্তা দিয়া কিছুদূর গমন করিয়াই সহর অতিক্রম করিলাম এবং আর-কিছু দূর যাইয়া দেখি, রাস্তাটী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আমরা ডানহাতি রাস্তায় ক্রমে কাননের মধ্য দিয়া, পথে সেতুযোগে দুইটী ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া দুই পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত সকল দেখিতে দেখিতে বৈকালে ৩ টার সময় ত্র্যম্বক গিয়া পৌঁছিলাম। ত্র্যম্বকে পৌঁছিবামাত্র এই স্থানের কয়েকজন পাণ্ডা আমাদিগের নিকট যাত্রিসংগ্রহার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি উহাদের মধ্যে একজনকে পাণ্ডা ঠিক করিয়া তাহার বাটীতে গমন করিলাম।

আমি পাণ্ডার গৃহে নিজ দ্রব্যাদি রাখিয়া পাণ্ডার সহিত প্রথমেই

কুশাবর্ত্ত কুণ্ডে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে গমন করিলাম। কুশাবর্ত্ত কুণ্ডটী ত্র্যম্বক সহরের মধ্যস্থানে, জনপূর্ণ পল্লীর মধ্যেই অবস্থিত। কুণ্ডটী ৩০হাত সমচতুষ্কোণ, চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সিঁড়ি দিয়া বাঁধান। আমি পাণ্ডার সাহায্যে প্রথমে নারিকেল ও পুষ্পাদি দিয়া কুশাবর্ত্ত কুণ্ডের পূজা করিয়া স্নান করিলাম। পরে সিঁড়িতে বসিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবার পর আবার স্নান করিলাম। কুণ্ডে স্নান করিবার কালীন বোধ হইল যেন এই জলে একটু প্রবাহ বা স্রোত আছে। কিন্তু এই স্রোত বা প্রবাহ কুণ্ডের বাহিরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। পাণ্ডারা বলেন, ইহা গোদাবরী বা গৌতমী গঙ্গার প্রবাহ। গোদাবরী মহর্ষি গৌতমের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় বিলুপ্ত হন। এই কুণ্ডে গঙ্গার আবির্ভাবের পূর্ব্বে জলাধিপতি বরুণদেব মহর্ষি গৌতমের খোদিত এই কুণ্ড অনাবৃষ্টি কালীন জলে পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের পার্শ্বেই আর একটী ক্ষুদ্র চতুর্দ্দিকে লোহার রেলিং দিয়া বেষ্টিত কুণ্ড আছে। কুশাবর্ত্ত কুণ্ডের সহিত এই কুণ্ডের যোগ আছে। একারণ কুশাবর্ত্ত কুণ্ডে পতিত পুষ্পাদি প্রবাহ বেগে এই কুণ্ডে আসিয়া জমা হয় এবং এই স্থান হইতে ঐ সকল তুলিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কুণ্ডের এক দিকে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবের মন্দির। ইহার ভিতর মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত ; এবং প্রস্তরনির্ম্মিত নন্দী ও অপরাপর দেব দেবীর মূর্ত্তিও আছে। পার্শ্বে আর একটি মন্দির, ইহার মধ্যে মহর্ষি গৌতমের মূর্ত্তি ও অপর দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। কুশাবর্ত্ত কুণ্ডের অপর দুই পার্শ্বের দালানেও অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে।

কুশাবর্ত্তের কার্য্য শেষ করিয়া, আমি পাণ্ডার সহিত ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব দেখিতে গমন করিলাম। নাসিক সহর হইতে ত্র্যম্বক পর্য্যন্ত যে রাস্তা আসিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া ত্র্যম্বক সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অল্পদূর আসিলেই ঐ রাস্তার উপর ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত দেখা যায়। মন্দিরটী খুব প্রশস্ত ও উচ্চ, ইহার ২।৩ দিকে ২।৩টী দ্বার বা ফটক আছে। প্রধান ফটকের উপর নহবতখানা। প্রধান ফটক পার হইয়া খানিকটা বাগান, ইহার মধ্যে কএকটী ঘর। এই বাগান পার হইয়া দ্বিতীয় দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে একটী পাথরে বাঁধান প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের চারিদিকে অনেকগুলি ঘর। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে ত্র্যম্বকেশ্বরের প্রস্তর নির্ম্মিত

প্রকাণ্ড মন্দির। প্রাঙ্গনের স্থানে স্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত অনেক শিবলিঙ্গ, গণেশ, পার্ব্বতী ও নন্দী পড়িয়া আছে। ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের নিজ মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে, প্রাঙ্গন মধ্যে দুইটী ছোট ছোট মন্দির আছে। একটীতে গণেশ মূর্ত্তি ও অপরটীতে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রাঙ্গন হইতে কএকটী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আমি ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের দ্বার পার হইয়া নাট-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই নাটমন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত ও খুব প্রশস্ত, মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত নন্দীর মূর্ত্তি এবং অপরাপর ২।৩টী মূর্ত্তিও আছে। এই নাটমন্দিরের মধ্য দিয়া ত্র্যম্বকেশ্বরের খাস মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম।

খাস মন্দিরটী অপেক্ষাকৃত ছোট এবং নাটমন্দির হইতে অনেক নিচু; এ কারণ কএকটী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আমি মন্দিরমধ্যে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। আমি ঘরের মেঝের সংলগ্ন একটী প্রস্তর নির্ম্মিত গৌরীপট্ট ভিন্ন, উহার মধ্যে সচরাচর যে রূপ লিঙ্গ উচ্চ ভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহা না দেখিয়া বরং তদ্বিপরীত অর্থাৎ ঐ গৌরীপট্টের মধ্যে গর্ত্ত দেখিয়া, পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহা কিরূপ। পাণ্ডা আমার হাত ঐ জলপূর্ণ গৌরীপট্টের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, তিন দিকে তিনটী সুপারীর ন্যায় ক্ষুদ্র লিঙ্গ স্পর্শ করাইলেন। এই গৌরীপট্টের মধ্যস্থ গর্ত্তের জলেও যেন একটী ক্ষীণ প্রবাহ বা স্রোত রহিয়াছে অনুভব করিলাম। পাণ্ডা বলিলেন, উহাই গৌতমী গঙ্গার প্রবাহ। পূর্ব্বে গঙ্গা মহর্ষি গৌতমের তপস্যায় ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, প্রথমে গৌতমের আশ্রমে আসিয়া ঐ স্থানেই বিলুপ্ত হন। পরে কুশাবর্ত্তে ও ত্র্যম্বকেশ্বরে আবির্ভূত হইয়া আবার ঐ সকল স্থানেই পুনরায় বিলুপ্ত হন। এই কারণ এখনও এই কয় স্থানে গঙ্গার আবির্ভাব যাত্রিগণ অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই মন্দিরের ভিত্তিতে কুলুঙ্গির ভিতর গণেশ পার্ব্বতী প্রভৃতির মূর্ত্তিও খোদিত আছে। রাত্রে এই গৌরী-পট্টের উপর সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত জটাজটধারী বিভিন্ন আকারের মহাদেবের কোন না কোন মুখ বসাইয়া অতি চমৎকার বেশ বা শৃঙ্গার হইয়া থাকে। রাত্রে আরতিরও বেশ ধুমধাম হয়। যাহা হউক আমি মহা-

দেবের পূজাদি করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আর একবার মহাদেবের আরতি দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম।

পরদিন প্রাতে আমি গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতে গমন করিলাম। নাসিক হইতে যে রাস্তা ত্র্যম্বকে আসিয়াছে, ঐ রাস্তার সম্মুখ দিকেই যে পর্ব্বতটী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার নিম্নভাগ বৃক্ষাদিপূর্ণ হরিদ্বর্ণ ও উপরিভাগ ঠিক খাড়া ভাবে অবস্থিত বৃক্ষাদিশূন্য লালবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার উপরিভাগ দূর হইতে দেখিতে ঠিক যেন মহাদেবের মস্তকস্থ পিঙ্গলবর্ণের জটার ন্যায়, ঐ পর্ব্বতকে ব্রহ্মগিরি কহে। আর ঐ রাস্তার ডানদিকে যে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ পাহাড়ের উপর চণ্ডিকা দেবীর মন্দির আছে। আমি বাসা হইতে পাণ্ডার সহিত বাহির হইয়া সহরের মধ্য দিয়া এক পোয়া রাস্তা গিয়া সহরপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি প্রকাণ্ড চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সিঁড়ি দিয়া বাঁধান জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের পরই ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত। পর্ব্বতে উঠিবার সিড়ি আছে। সিঁড়িতে উঠিবার কালীন স্থানে স্থানে সিঁড়ির পার্শ্বে অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি বসান আছে দেখা যায়। পর্ব্বতের অনেক দূর পর্য্যন্ত বৃক্ষলতাদির দ্বারায় শোভিত। আমরা প্রায় দেড় পোয়া পথ উঠিয়া মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি পাকা দালানে গৌতমের মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ, একটি যজ্ঞ ডুম্বুরের বৃক্ষের নিম্নে গৌতমের আর একটি মূর্ত্তি ও একটি চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের যে দিকে উক্ত দালান আছে, ঐ পার্শ্বের ভিত্তিতে একটি প্রস্তরের পশুমুখ দিয়া ঝরনার বা গোদাবরীর জল আসিয়া কুণ্ডে পড়িতেছে এবং ঐ কুণ্ড হইতে জল বাহির হইয়া যাইতেছে। আমরা এই স্থানে স্নান ও পূজাদি করিলাম।

আমরা এখান হইতে আর অল্পদূর পাহাড় উঠিয়াই দেখি, সম্মুখে লালবর্ণের বৃক্ষতৃণাদিশূন্য পাহাড়টী ঠিক খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অতএব সম্মুখে আর উঠিবার রাস্তা না থাকায় রাস্তাটি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া দুইদিকে কিছু দূর গিয়াছে। আমরা বাঁহাতি রাস্তা[illegible] খানি আসিয়া দেখি যে, এই রাস্তা শেষ হইয়াছে ও ঐ স্থানে গো[illegible]বরী একটি সূতার ন্যায় ধারে মহাদেবের মস্তকস্থ জটার ন্যায় ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতের উপর হইতে ঐ স্থানে লাল বর্ণের খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া আসিয়া একটি শিবলিঙ্গে পতিত

হইয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত জিহ্বার ন্যায় পাত লাগান থাকায় ধারাটি পর্ব্বতগাত্র হইতে একটু পৃথক্ ভাবে পতিত হইতেছে, ইহা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্বেই গঙ্গামাতার প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি। নিকটেই পর্ব্বতগাত্রে একটি গুহা এবং ঐ গুহার মধ্যে ২টি কুণ্ড আছে। গোতমী গঙ্গার পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণ ধারায় এই কুণ্ড দুইটী পূর্ণ থাকায় এই স্থানে যাত্রিগণ স্নান করেন। ইহার মধ্যে একটী কুণ্ড পুরুষদের ও অপরটী স্ত্রীলোকদের স্নান করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। এখানে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া থাকেন। আমি গোতমী গঙ্গার পূজা ও এই কুণ্ডে স্নান করিয়া এই স্থানে অবস্থিত ব্রাহ্মণকে কিছু দিয়া এখান হইতে ফিরিয়া, ডানদিকের রাস্তায় পর্ব্বতগাত্রে গমন করিলাম। রাস্তার এই অংশটী অপেক্ষাকৃত অনেক লম্বা। এই রাস্তায় প্রথমে একটী গুহায় কএকটী দেবদেবীর মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। এখানে একজন মহাত্মার আস্থানা ছিল। দ্বিতীয় গুহাটীতে গণেশ ও দেবীর মূর্ত্তি আছে এবং এই স্থানেই এই রাস্তাও শেষ হইয়াছে। আর এই পাহাড়ে উঠিবার বা অপর কোন দিকে যাইবার রাস্তা নাই। পাহাড়ের উপর হইতে ত্র্যম্বক সহরের শোভা দেখিতে বেশ সুন্দর। আমরা এই সকল দেখিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

পুনরায় সহর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের সম্মুখ দিকে যে গলি আছে, উক্ত গলি দিয়া অপর পর্ব্বতের তলদেশে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে পর্ব্বতে উঠিবার সিঁড়ি আছে। এই পর্ব্বতটী ব্রহ্মগিরি অপেক্ষা অনেক ছোট। সিঁড়ি দিয়া পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। পর্ব্বত শিখরের অদূরেই পার্ব্বতী বা চণ্ডীর ছোট মন্দির অবস্থিত। মন্দির মধ্যে পার্ব্বতী দেবীর বেশ সুন্দরমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। আমরা এই স্থান দেখিয়া পাহাড় হইতে পূর্ব্বোক্ত পথে নামিয়া আসিলাম। ত্র্যম্বক সহরটী ছোট, এখানে অনেক খোলার ঘর দেখিতে পাইলাম, তবে প্রস্তরনির্ম্মিত পাকা বাটীও যথেষ্ট আছে। এখানে বাজার হাট, সকল দ্রব্যের দোকান এবং ধরমশালা ও ছত্র আছে। ইহা ভিন্ন অনেক পাণ্ডাদের বাটী এবং কএকটি মন্দিরও আছে। ত্র্যম্বকেশ্বর বা ত্র্যম্বক মহাদেবের নামানুসারে এই সহরের নামও ত্র্যম্বক হইয়াছে।

বর্ত্তমান সমস্যা।

৩।

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিতে যাইয়া লোকে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সে নিজে যতটুকু পারে চেষ্টা করে এবং অপরকে নানা উপায়ে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের সহায় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এটী সত্য কথা, অপরের সাহায্য ব্যতীত আমরা সংসারে একপাও অগ্রসর হইতে পারি না, কিন্তু অপরের সাহায্য পাইতে হইলেও নিজের চেষ্টা আবশ্যক। God helps those who help themselves ইহা অতি সত্য কথা। আদানপ্রদানও জগতের নিয়ম। নিশ্চিত জানা উচিত, আমার নিকট হইতে কোন আকারে কিছু না পাইলে কেহ আমাকে সাহায্য করিবে না। এই কথায় কেহ আশঙ্কা করিবেন না যে, নিষ্কামধর্ম্ম জগতে নাই। আমাদের ত আর অপরের নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম দানের উপর কোন দাবী দাওয়া চলে না! তার পর প্রতিগ্রহকারীর নৈতিক অবনতিও অনিবার্য্য।

এক একটী জাতিও এক একটী ব্যক্তির স্বরূপ। প্রত্যেক জাতিরও বিশেষ বিশেষ স্বার্থ আছে। এই স্বার্থসিদ্ধির উপায়ও এইরূপ দ্বিবিধ। আত্মচেষ্টা ও পরের নিকট কায আদায়ের চেষ্টা। বিজিত ও স্বাধীন উভয় জাতির আবার এই চেষ্টার বিভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক ও আবশ্যক।

বর্ত্তমান সমস্যার যথাযথ সমাধান করিতে হইলে দেখিতে হইবে, আমাদের এই উভয়বিধ চেষ্টা কি প্রণালীতে পরিচালনা করিতে হইবে।

প্রথম আত্মচেষ্টার কথা,—এই বিষয়ের আলোচনার প্রারম্ভে প্রথমে আমাদের মনে কতকগুলি গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয়। ১ম, আমরা জাতিনামের উপযুক্ত কিনা! ২য়তঃ, আমাদের জাতীয়তার সীমা কতটুকু। তাহার কার্য্যক্ষেত্র কি বাঙ্গালীতেই সীমাবদ্ধ অথবা ভারতের সকল অধিবাসী মিলিয়া আমরা একজাতি? শুধু কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণকে লইয়া আমরা একজাতি অথবা ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেই এই বিশাল জাতির অন্তর্গত? আমাদের ধর্ম্মগত, সমাজগত ও রাজনৈতিক

সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের কি কোন সাধারণ ভিত্তি আছে? অথবা প্রত্যেকটী পৃথক্ পৃথক্?

এই সকল প্রশ্ন আপাতদৃষ্টিতে এত জটিল বলিয়া বোধ হয় যে, ইহার কোনরূপ মীমাংসা যে কখনও হওয়া সম্ভব, তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানি, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, কি কখনও এক হইবে? হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ কি কখন এক হইবে? এত ভেদ, এত পার্থক্য কি দূর হইবে? ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্ক বিকল হয়, আর চিন্তা করিতে পারা যায় না।

কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিলে সহজেই প্রতীত হয়, এই সকল প্রভেদ আপাতদৃষ্টিতে যতই গুরুতর বলিয়া অনুভূত হউক, প্রকৃতরূপে চেষ্টা হইলে এই আপাতভিন্নতার মধ্যে একত্ব সংস্থাপিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। আমরা ভিন্নতার দিকে ঝোঁক দিতে এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে, একত্বের চেষ্টা আমাদের অসম্ভব বলিয়াই ধারণা হয়। কিন্তু যাঁহারা বেদান্তের একত্ববাদের মর্ম্ম একটুকুও বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই জাতীয় ভাব প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান যদি প্রত্যেক ভারতবাসীর মূলমন্ত্র হয়, তবে এ জাতীয় সংগঠন কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। এই সঙ্গে আরও এক কথা আমাদিগকে বেদান্তের দৃষ্টি হইতে বুঝিতে হইবে। জাতীয়ত্বই চরম সোপান নহে, জাতীয়ত্ব হইতে আমাদিগকে সার্ব্বজনীন ভাবে পদার্পণ করিতে হইবে, তৎপরে তির্য্যগ্‌জাতিতেও আত্মত্ব-বোধ, পরিণামে বিশ্বাত্মায় একত্ব।

বেদান্তের মহোচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণতির উপায় করিতে হইবে। ক্রমোন্নতিন্যায়ে আমরা নিম্নতর অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণের চেষ্টা করিব, কিন্তু সর্ব্বদা জানিয়া রাখিব এ অবস্থাটা চরম নহে। এরূপ ভাবে চলিলে আমরা অনেক সময় দিশাহারা না হইয়া পথ খুঁজিয়া পাইতে পারি।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বুঝিলে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর জাতীয় উন্নতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝা যাইবে। বুঝিতে হইবে, স্বামীজি কোনরূপ সাময়িক আন্দোলনমাত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। জাতীয় উন্নতিবিধান একদিন

দুইদিনের কার্য্য নহে, উহাতে শত শত শতাব্দী ব্যাপী চেষ্টার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ স্বামীজি বলিতেন, দেশের উন্নতিসাধনের জন্য বিশেষরূপে সময় দিতে পারেন, এইরূপ উৎসাহসম্পন্ন কতকগুলি লোকের প্রয়োজন। যদিও দেশের লোকের সকলেরই দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই উচিত, কিন্তু অধিকাংশ লোকই নিজের এবং নিজ পরিবারের উন্নতির চিন্তাতেই ব্যস্ত। এই সকল কার্য্য করিয়া সে দেশের জন্য ভাবিবার ও কার্য্য করিবার অল্পই সময় পায়। এই জন্য কতকটা reserve force এর আবশ্যক—তাঁহাদের আর কোন কায থাকিবেনা—আর কোন ভাবনা থাকিবে না—তাহারা পারিবারিক দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিবেন না—সমস্ত দেশবাসী তাঁহাদের আত্মীয়—তাহাদিগকে এই সকলের ভাবনা ভাবিতে হইবে। এক কথায় তাহাদিগকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হইবে। আমাদের দেশের এখন যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে এইরূপ এক স্বদেশিব্রত সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় না হইলে দেশের উন্নতি যে সুদূরপরাহত হইবে, এ বিষয়ে বোধ হয় বিশেষ আপত্তি হইবে না।

অবশ্য এইরূপ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সংগঠনের অনেক প্রতিবন্ধক আছে। সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, সন্ন্যাসী হইলে তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য অরণ্যে যোগসাধনা। লোকে যতই বলুক, দেশের জন্য খাটা যেন একটা সাংসারিক কায, উহাতে যেন মুক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক, যেন সন্ন্যাস আর স্বদেশহিতৈষিতা দুইটা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। সন্ন্যাসীই যখন হইলাম, তখন আবার আমার পক্ষে দেশ কি? বসে বসে জপ তপ কর, নিজের পরকালের চেষ্টা কর। দুনিয়া দুদিনের, এখানে যখন ভাগ্যক্রমে সন্ন্যাসীই হইলে, তখন আবার ওসব কেন?

পাঠকগণ, এখানে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় বলিতে আনন্দমঠের সন্তানসম্প্রদায়ের চিত্র যেন মনে না আনেন। কোন সাময়িক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বা বিদ্রোহের জন্য এ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় আমরা কামনা করিতেছি না—স্বামীজিরও সে উদ্দেশ্য ছিল না। ইঁহাদের মূলমন্ত্র হইবে—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নিজে চরম উন্নতিপথে অগ্রসর হইব—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে জগতের সকলের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে যাহাদের সঙ্গে দিনরাত থাকিতে হয়, স্বদেশবাসী—তাহাদের

উন্নতির জন্য প্রথম চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। এই ভাবে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা করিলে সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা।

এখন ইঁহাদের কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে স্বামীজির মত আলোচনা করিব। প্রথমতঃ, অবশ্য ইঁহাদের নিজেদের শিক্ষা আবশ্যক এবং এই শিক্ষা ফলপ্রসূ হইতে গেলে উপযুক্ত গুরুরও আবশ্যক।

ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে প্রচারব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সদ্ভাব ও জ্ঞানের বিস্তার ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে। পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, বিভিন্নভাষাভাষী ও বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে সদ্ভাব আনয়ন করিতে হইলে বেদান্তই একমাত্র অবলম্বন। বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদ এ কথাগুলিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু নামে কিছু আসে যায় না। যে নামেই হউক, যাহাতে সকলের আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের উদ্দীপনা হয়, সেই চেষ্টা রীতিমত করিতে হইবে। তোমার মধ্যে সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত—তুমি ইচ্ছা করিলে সব করিতে পার। তুমি হিন্দুই হও, মুসলমানই হও, খ্রীষ্টানই হও, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরের সন্তান। তবে তুমি কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া নিজের মহিমা—নিজের অব্যক্তশক্তি ভুলিয়া আছ? এ ভাব ত তোমায় সাজে না—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।'

এই প্রচার বিশেষভাবে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের ভিতর করিতে হইবে। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা নানাপ্রকারে উপদেশ পাইতেছেন—কিন্তু সাধারণ লোককে কেহ উৎসাহ দেয় না, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই। এ অবস্থায় তাহাদের শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়াই প্রথম কর্ত্তব্য। অর্থাৎ প্রথম কর্ত্তব্য—mass education.

এই আত্মবিদ্যার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণকে লৌকিক বিদ্যা শিখাইতে হইবে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের নিজের গ্রামটুকু ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু জানা নাই—তাহাদিগকে জানাইতে হইবে, কোথায় কি হইতেছে। দুনিয়ায় কত পরিবর্ত্তন, কত বিপ্লব হইতেছে, জগতের ইতিহাসে কত কত ঘটনা ঘটিয়া তবে সমাজের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, অন্যান্য দেশের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম রীতিনীতি কিরূপ, এই সকল প্রথম মুখে মুখে শিখাইতে হইবে। স্কুল ইত্যাদি ক্রমশঃ হইবে।

সাধারণ লোকের ভিতর শিক্ষার বিস্তার না করিতে পারিলে সমবেত চেষ্টায় কোনরূপ জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের লোকের সকলে সহ-মতি না হইলে কোন মহৎকার্য্য সাধন অসম্ভব। অনেক সময়েই দেখা যায়, কোন জাতীয় সমস্যা উপস্থিত হইলে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদের জন্য মহৎ উদ্দেশ্য হারাই। সাধারণ অশিক্ষিত লোকে একজন বক্তার উত্তেজনায় যেটী প্রথমে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা পরিত্যাগ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। ইহার একমাত্র কারণ শিক্ষার অভাব।

আবার শিক্ষা আমাদের স্কুলবালকেরা যেরূপ পাইতেছে, তাহাতে তাহাদের এইটুকু দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা সর্ব্ববিষয়ে শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের বিশেষ কিছু দোষ দেওয়া যায় না। তাহাদিগকে কি শিখান হইতেছে? যে সকল পুস্তক তাহাদিগকে পড়ান হয়, তাহাতে তাহা-দের আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধার সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিপরীত ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। আমরা ইহার প্রতী-কারের জন্য কি করিতেছি? আজ কাল জাতীয় শিক্ষার জন্য লোকের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ইহা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু এবিষয়টী যেরূপ গুরুতর, তাহাতে সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহাতে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, অপর জাতির নিকট আমাদিগকে অনেক জিনিষ শিখিতে হইবে। শিখিয়া সেই গুলিকে নিজেদের দেশের উপযোগী করিয়া লোককে শিখাইতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে যত অধিক মৌলিকতা প্রবেশ করে, অর্থাৎ যত নিজেদের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সকলের উপর, মনে রাখিতে হইবে, সকল কার্য্যই ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে সুস্থিরে করিতে হইবে।

এখন কথা এই, আমরা এখন করিব কি? আমাদের বোধ হয়, নেতারা যেরূপভাবে বরাবর কায করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির সবিশেষ প্রশংসা করা যায় না। তাঁহারা দেশের জন্য বাস্তবিক পাগল হইয়া থাকিতে পারেন, তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা ঠিক পথ ধরিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথমতঃ কংগ্রেস ব্যাপারটা কি, বুঝা যাক্। কংগ্রেসে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হয়—ইহারই নাম বিধিসঙ্গত আন্দো-

লন (constitutional agitation)। এই আন্দোলনের বাস্তবিক কোন ফল হইয়াছে কি না, ইহা ঘোর সন্দেহের বিষয়। এখন অনেকেই ইহার সফলতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এখনও যে অনেকে মেমোরিয়াল হস্তে রাজসমীপে গমন করিয়া বিতাড়িত হইতেছেন! তাঁহাদের কি চৈতন্য কিছুতেই হইবে না? কতকগুলি আকাশকুসুমের লোভে দেশের টাকাটা বৃথা অপব্যয় না করিয়া দেশের কোন প্রত্যক্ষ হিতকর কার্য্যে——যাহাতে দরিদ্র লোকের যথার্থ উপকার হয়, তাহার চেষ্টা করুন দেখি।

আর এক কথা—এখন স্বদেশী স্বদেশী বলিয়া চীৎকার খুব হইতেছে —কিন্তু স্বদেশী ভাব দেখিতেছি না। বক্তৃতা করিয়া, সভা করিয়া কখন এদেশে কোনও ভাবের প্রচার হয় নাই। দেশের জন্য অনুরাগে, অপরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ নয়—সকলে স্বদেশিব্রত গ্রহণ করুন, লোকের পায়ে ধরিয়া লোককে বলুন—ভাই—

'ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিওনা—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্যই বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সেই বিরাট্ মহামায়ের ছায়া মাত্র;—ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর—সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামীজির জনৈক সেবক।

সমাধি।

পেলব যৌবন ঢাকি গৈরিক বসনে
—সংশয়ের লেশ, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা নাই মনে-
চলিছে আনত মুখে নবীন সন্ন্যাসী.
ধীর, শান্ত, সৌম্য ভাব নয়নে প্রকাশি
অদূরে তটিনীতীরে, শৈবাল আবৃত,
বিশাল অশ্বত্থ মূলে রয়েছে পতিত
পাষাণের স্তূপ, তাহে বসিলা উদাসী,
নীলাম্বর পানে চাহি মানস সরসী
উ[illegible]ত ; চাহে যেন নীলিমা বিস্তারে
মিশিয়া যাইতে, যাহে বিশ্বের ও পারে
উঠিতেছে যে সঙ্গীত, যে মঙ্গল গান,
শুনা যায় সুমধুর তার কলতান।
মুগ্ধনেত্রে, চাহি পুনঃ মুদিল নয়ন,
নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতন।
নাহি বহে শ্বাস আর ; হৃদয় স্পন্দন
নাহি আর, মন তার সমাধি মগন।
কে বলিবে কিবা তার হৃদয় মাঝারে
বেদ মন্ত্র ধ্বনি উঠে, ছন্দের ঝঙ্কারে
মুখরিত অন্তরের গভীর প্রদেশ !
কে বলিবে কিবা সেই মধুর আবেশ !

শ্রীমনোমোহন [illegible]